

ভিন্‌দেশী রূপকথা



[গ্রিম্‌স্‌ ফেয়ারি টেল্‌স্‌]

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর
সংকলিত



কিশোর ভারতী
এ ১৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-বারো

BHINDESHI RUPKATHA
[Grimms' Fairy Tales in Bengali]
Dhirendra Lal Dhar.
Price Rupees Eight/Nine only

প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৬



সাধারণ বাঁধাই মূল্য : আট টাকা মাত্র

কাপড়ে বাঁধাই : মূল্য নয় টাকা মাত্র

ছবি এঁকেছেন :

শ্রীহরেন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীবরদাপ্রসন্ন দাস ও শ্রীঅশোক ধর

শ্রীনিশিকান্ত হাটই কর্তৃক তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২৬ বিধান সরণী, কলিকাতা-ছয় থেকে মুদ্রিত ও কিশোর ভারতীর পক্ষে লেখক কর্তৃক ৯ ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রীট, কলিকাতা-নয় থেকে প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান :

ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-নয়

সূচী ঃ











ভূমিকা

'গ্রিম্‌স্‌ ফেয়ারি টেল্‌স্‌' বিশ্ববিখ্যাত গল্পের বই।

গত একশো বছর ধরে পৃথিবীর সব দেশেই এই বইখানির লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রী হয়েছে। নানাভাষায় অনুবাদও হয়েছে। ছোটদের জন্য এমন মজাদার বই আর নেই।

গ্রিম্‌স্‌ ফেয়ারি টের্ল্‌স্‌-এর গল্পগুলি জার্মান-দেশের গল্প। আসল বইখানিও জার্মান ভাষায় লেখা। গ্রিমেরা দু'ভাই পাঁচ বছর ধরে পরিশ্রম করে এই গল্পগুলি সংকলন করেন। 'দি কিণ্ডার অ্যাণ্ড হাউস্‌ মার্সেন' নামে বইখানির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮১২ সালে। গল্পগুলি সংগ্রহ করতে গ্রিম-ভাইদের যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছিল।

গ্রিমেরা দু'ভাই: জ্যাকব লুডউইগ কার্ল গ্রিম ও উইল্‌হেল্‌ম্‌ কার্ল গ্রিম।

জ্যাকব জন্মেছিলেন হানাউ-নগরে ১৭৮৫ সালে। উইল্‌হেল্‌ম্‌ ছিলেন তাঁর চেয়ে এক বছরের ছোট। দু'ভাইয়ে মনের মিল ছিল খুব। দু'ভাই একসঙ্গে পড়াশুনা করতেন।

বাবা ছিলেন উকিল। ভাইবোন ছ'জন। বাবা পড়াশুনায় খুব কড়া ছিলেন, আর সব দিকে ছিলেন খোস-মেজাজী। মৃত্যুকালে এই দুই ছেলেকে তিনি আইন পড়ার জন্য অনুরোধ করে যান। দু'ভাই বাপের সেই আদেশ পালন করেছিলেন।

একই সঙ্গে দু'জনে মারবুর্গ সহরে আইন-শিক্ষা শেষ করে গটিনজেন-এ অধ্যাপনা সুরু করেন। কিছুদিন দু'জনে ক্যাসেল-এ গ্রন্থাগারিকের কাজ করেন। তারপর চলে আসেন বার্লিনে এবং সেইখানেই স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন।

জ্যাকব ও উইল্‌হেল্‌ম্ দু'জনেই ছিলেন বিশেষ পণ্ডিত। জার্মানির পুরাণ, ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু মূল্যবান গবেষণা করে দু'জনে দেশ-জোড়া খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তবে জার্মান-সাহিত্যে বড় ভাইয়ের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল ছোট ভাইয়ের চেয়ে বেশী।

পড়াশুনাতেই দু'ভাইয়ের জীবন কাটে। দু'জনে অন্ততঃ বারোটি ভাষা শিখেছিলেন। স্কটল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, নরোয়ে ও ডেনমার্কের পুরাণ-কাহিনী তাঁরা জার্মানভাষায় অনুবাদ করেন। তাছাড়া জার্মানির প্রাচীন আইন-কথা ও বীরত্বকাহিনীও তাঁরা লিপিবদ্ধ করেন। পরে ভাষাতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব নিয়ে তাঁরা গবেষণা সুরু করেন। এখনকার দিনে অনেক পণ্ডিত বলেন—জ্যাকব গ্রিম জার্মানভাষায় পুরাতত্ত্বের জনক।

জ্যাকব মানুষটি ছিলেন খর্বকায়, কিন্তু সুপুরুষ, চোখেমুখে বুদ্ধির দীপ্তি ছিল। ধূমপান করতেন না। নিমন্ত্রণ-বাড়ী ছাড়া মদ খেতেন না। তিনি বিয়ে করেন নি। সমাজে মেলামেশা করাও পছন্দ করতেন না। সময় কাটতো পড়াশুনায়। সদাই গম্ভীর।

মেজোভাই উইল্‌হেল্‌ম্ এক বছরের ছোট। কিন্তু মাথায় ছিলেন বড় ভাইয়ের চেয়ে লম্বা। দেখতে ছিলেন বড় ভাইয়ের চেয়ে সুপুরুষ। সব সময়েই হাসিখুসি। বন্ধুদের নিয়ে গল্প ও গানে সময় কাটাতে ভালবাসতেন। তাঁর গল্প বলার একটা চমৎকার ভঙ্গি ছিল। গ্রাম্য উপকথাগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে উইল্‌হেল্‌ম্‌ই লিখেছিলেন।

দু'ভাই ইতিহাস নিয়ে খুব পড়াশুনা করতেন। পুরানো ইতিহাসের নানা তথ্য যোগাড় করার জন্য তাঁরা দেশের নানা জায়গায় ঘুরতেন। ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা গ্রামের মানুষের মুখে এমন সব গল্প শুনতে লাগলেন যে সব গল্প মুখে-মুখেই চলে আসছে, কোনদিন লেখা হয়নি। সে সব গল্পের সঙ্গে সত্যিকারের মানুষের কাহিনীর কোন মিল নেই। তবু তাঁরা সেই সব গল্প সংগ্রহ করতে সুরু করলেন। পুরাতত্ত্ববিদেরা যেমন মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে পুরানো একটা শীলমোহর কি প্রাচীন বাসনের একটা ভাঙা টুকরো পেলে তুলে রাখে, তা থেকে পরে কোন নতুন তথ্য জানা যাবে ভেবে, তেমনি এইসব গ্রাম্য চলিত গল্প থেকে জাতির ঐতিহ্য প্রমাণ হবে ভেবে দুই ভাই সেই সব গল্প লিখে রাখতেন।

কিন্তু সে সব গল্প লিখে নেওয়াও সহজ নয়। গাঁয়ের মানুষ ভদ্রলোকদের কাছে সহজে মুখ খুলতে চায় না। দু'ভাইও নাছোড়বান্দা। একদিন এক বুড়ো রাখালকে ধরলেন, এক বোতল মদ পেয়ে সে মুখ খুললো। সারা বিকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি বলে গেল অনেকগুলি গ্রাম্য রূপকথা।

আরেকদিন এক বুড়ীকে ধরলেন, বুড়ী বললো—তোমরা তো জোয়ান ছেলে, তোমরা ছোটদের ছেলেমানুষী গল্প শুনবে? শুনে তো হাসবে।

দু'ভাই তখন এক বন্ধুকে ধরলেন, তার কয়েকটি ছেলেমেয়েকে পাঠালেন বুড়ীর কাছে গল্প শুনতে। বুড়ী ছোটদের কাছে গল্প বলতে সুরু করলো, বাইরে পর্দার আড়ালে বসে দু'ভাই তা লিখে নিতে লাগলেন।

তারপর দু'ভাই ধরলেন এক বুড়ী দরজীর-বৌকে। গ্রাম্য উপকথা সে জানতো অনেক, আর বলার ধরণটাও ছিল অতি সহজ ও সেকেলে।

একাদিক্রমে পাঁচ বছর ধরে দু'ভাই গল্প সংগ্রহ করলেন। গল্পের সংখ্যা হলো মোট ৮৬টি। গল্পগুলি পরে কোন কাজে

লাগবে ভেবে তাঁরা তুলে রাখলেন। তারপর নিজেদের কাজে মন দিলেন।

উপকথা সংগ্রহের কালে এক রসায়নিকের মেয়ে অনেক সাহায্য করেন। উইল্‌হেল্‌ম্‌ পরে তাঁকেই বিয়ে করেন। তাঁদের বাড়ীতেই জ্যাকব থাকতেন। উইল্‌হেল্‌মের তিনটি ছেলেমেয়ে বাপ-মায়ের চেয়ে জ্যাঠামশাইকে চিনতো বেশি।

টাকা রোজগারের দিকে ছু'ভাইয়ের কোন চেষ্টাই ছিল না। সেইজন্য আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। কোন রকমে দিন চলতো।

একবার বাড়ীতে এলেন এক বন্ধু—আচিম ভন আর্নিম। উপকথার খাতাখানির দিকে তাঁর নজর পড়লো। খাতাখানি থেকে তিনি কয়েক পৃষ্ঠা পড়লেন, বললেন—অপূর্ব। এ তো বই হয়ে বেরুনো উচিত। আমি সে ব্যবস্থা করছি।

বার্লিনে এক প্রকাশকের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করে ফেললেন। ১৮১২ সালে বড়দিনের আগে বই বেরিয়ে গেল—ছোটদের গল্প—'টেল্‌স ফর চিলড্রেন এণ্ড দি হার্থ'। এক সঙ্গে ছুটি সংস্করণ বেরলো—সস্তা দামের সংস্করণ ও রাজসংস্করণ। খুব বিক্রী হলো। অল্প দিনেই বই শেষ।

এবার পর পর আরো ছুটি খণ্ড যোগ হলো। গোড়ায় প্রথম খণ্ডে ছিল বাছাই করা ৮৬টি গল্প। এবার তিনখণ্ডে মোট গল্পের সংখ্যা হলো ২১০টি।

দেখতে দেখতে বইখানির কয়েকটি সংস্করণ ফুরিয়ে গেল। কয়েকটি ভাষায় অনুবাদ হয়ে গেল। আজ অবধি পৃথিবীর ৪০টি দেশে ৫০টি ভাষায় এই বইখানি অনুবাদ হয়েছে। অন্ততঃ ২০,০০০ সংস্করণ ছাপা হয়েছে। বই বিক্রী হয়েছে ১০০,০০,০০,০০০ খানি। বাইবেল ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন বই এমন বিক্রী হয়নি।

শুধু গল্প পড়াই নয়। অন্ততঃ ২০০টি নাটক লেখা হয়েছে এই সব গল্প থেকে। চলচ্চিত্রও তৈরী হয়েছে।

বই বিক্রী হলো, খ্যাতি হলো, কিন্তু দু'ভাই তখন ভাষাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করছেন। একখানা বড় অভিধান করার জন্য তখন তাঁরা খাটছেন। সে অভিধান আর শেষ করা হোল না। জ্যাকব সপ্তাহ খানেক অসুখে ভুগে মারা গেলেন ১৮৬৩ সালে ৭৮ বছর বয়সে। উইল্‌হেল্‌ম্‌ অনেক দিন হাঁপানিতে কষ্ট পেয়েছিলেন। তিনি বড় ভাইয়ের পাঁচ বছর আগেই মারা যান।

দু'ভাই যে অভিধানের কাজ সুরু করে, A, B, C, D, E, F, অবধি লিখে গিয়েছিলেন, ১৯৬০ সালে সেই অভিধান সম্পূর্ণ হয়ে বেরুলো ৩২ খণ্ডে। সে অভিধান যত মূল্যবানই হোক্‌ গ্রিম-ভাই দু'টিকে লোকে জানে রূপকথার সংকলক হিসাবে। তাতেই তাঁরা সারা বিশ্বে অমর হয়ে আছেন।

গ্রিমের এই গল্পগুলি ছেলেমেয়েদের একান্ত উপযোগী। সর্ব-কালের সর্বদেশের ছোটরা রাজা-রাণী, দৈত্য-ডাইনী, পরী-বামনের কথা ভেবে আনন্দ পায়। তাদের কাছে পশু, পাখী, সাপ, ব্যাঙ, মাছ কথা বলে। দুষ্ট দৈত্যকে মেরে রাজপুত্র যখন রাজকন্যাকে উদ্ধার করে, ডাইনী যখন কাক হয়ে উড়ে যায়, পরের উপকার করে গরীব সিপাই যখন অর্ধেক রাজত্বের রাজা হয়ে বসে তখন শিশুমন তৃপ্তি পায়। কল্পনাকে প্রসারিত করে, শিশুমনকে পরিপূর্ণভাবে বিকাশ করে তোলার পক্ষে এই গল্পগুলির বিশেষ উপযোগিতা আছে। শিশুর অনুভূতি ও বিচারবুদ্ধিকে এই গল্পগুলি সজাগ করে তোলে।

নিছক আনন্দের মধ্যে দিয়ে এই গল্পগুলি ছোটদের কাছে যে শিক্ষা পরিবেশন করে তার উপযোগিতা যুগে যুগে অনুভব করেছেন ছোটদের মনের খবর যাঁরা রাখেন সেই মা-ঠাকুরমা-দিদিমারা। তাঁদেরই মুখে মুখে আদিকাল থেকে এই ধরণের লোকসাহিত্য চলে আসছে পৃথিবীর সকল দেশে। এর মধ্যেকার সুরটুকু সব দেশেই এক। সেইজন্য একদেশের রূপকথা আরেকদেশের ছেলে-মেয়েদের কাছে সমভাবেই আনন্দবর্ধক। সেই কারণেই গ্রিমের

গল্প শুধু জার্মানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, সব দেশের শিশুদের কাছেই তা ছড়িয়ে পড়েছে।

গ্রিমের গল্প আমাদের দেশে কিছু কিছু অনুবাদ হয়েছে। কিন্তু সমগ্র সংকলন আজ অবধি বেরোয় নি।

ইংরেজি ভাষায় বড় সংকলন আছে অনেকগুলি। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় যে বইখানি আমি পেয়েছি তাতে ১৯৬টি গল্প আছে। ছোটদের জন্য ততো বড় বই ছাপানর সাহস আমার নেই, তাহলে তার য়া দাম হবে আমাদের দেশের অধিকাংশ অভিভাবকের সে দামে বই কেনার সামর্থ্য নেই। তাই প্রথমে মাত্র চব্বিশটি গল্প বেছে নিয়ে আমি এই গ্রন্থে সংকলন করি। দ্বিতীয় সংস্করণে আরো বারোটি গল্প যোগ করি। তারপর গল্প সংখ্যা হয় চুয়ান্ন। এবার আরো বেড়েছে।

সবগুলিই ভাবানুবাদ। বই বড় হবার আশঙ্কায় অনেক স্থলে কাহিনীকে সংক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছি।

আরও ছবি দিয়ে বইখানি আরও মনোরম করবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাতে আরো খরচ বাড়ে। খরচ বাড়িয়ে বইয়ের দাম বেশী করতে আমি চাই না—বিশেষতঃ শিশু-পাঠ্য বইয়ের। গ্রিম-ভাইদের এই গল্পগুলি পড়ে ছোটরা আনন্দ পাবে এই বিশ্বাস নিয়েই আমি এই বইখানি সংকলন করেছি এবং সবাইকার কাছেই যাতে গিয়ে পৌঁছতে পারে সেজন্য দামও যতটা সম্ভব কম করেছি। বইয়ের আকারের সঙ্গে মূল্যের তুলনা করলেই সেটা ধরা পড়বে। তবু যদি কোথাও কোন ত্রুটি চোখে পড়ে, আমার ছোট ছোট পাঠক-পাঠিকারা সেটুকু আমায় দেখিয়ে দিলে সুখী হব। পরে শুধ্‌রে নেবার চেষ্টা করবো। ইতি—

কলিকাতা

—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

তিনজন সৈনিক বিদেশ থেকে ফিরছিল। বন-বাদাড় তেপান্তরের মাঠ পার হয়ে তিনবন্ধু একসঙ্গে বাড়ী ফিরছিল। একদিন এক বনের ধারে সন্ধ্যা হয়ে এল। তিন বন্ধুকে সেই বনের মাঝেই রাত কাটাতে হবে। কথা হল পালা করে এক একজন রাত জাগবে আব দু'জন কবে ঘুমুবে। খড়কুটো জোগাড় করে তারা আগুন জ্বালল, তারপব আগুনের পাশে দু'জন শুয়ে পড়ল, একজন বসে পাহারা দিতে লাগল।

প্রথম সৈনিক বসে বসে পাহারা দিচ্ছে। এমন সময় কোথা থেকে ছোট্ট একটি বামন এসে উপস্থিত হল: লাল জামা পরণে ছোট একরত্তি মানুষ, জিজ্ঞাসা করল—কে গো তুমি?



সৈনিক বলল—আমরা তিন বন্ধু। এখানে রাত কাটাচ্ছি। তুমি বস না আগুনেব ধাবে, খানিক গল্প কবি।

বামন আগুনেব পাশে বসল, বলল—তুমি তো বেশ ভালো লোক। তোমাকে আমি একটা জিনিষ দিয়ে যাই। এই চাদরখানি রাখ, এই চাদর গায়ে দিয়ে তুমি যা চাইবে, তাই পাবে।

চাদরখানি দিয়ে বামন চলে গেল।

এদিকে প্রথম সৈনিকের পালা শেষ হল। দ্বিতীয় সৈনিককে জাগিয়ে দিয়ে সে শুয়ে পড়ল।

দ্বিতীয় সৈনিক বসে বসে পাহারা দিচ্ছে। এমন সময় কোথা থেকে ছোট্ট একটি বামন এসে উপস্থিত হল। লাল জামা পরণে ছোট একরত্তি মানুষ। জিজ্ঞাসা করল—কে গো তুমি?

দ্বিতীয় সৈনিক বলল—আমরা তিন বন্ধু। এখানে রাত কাটাচ্ছি। তুমি বস না আগুনের ধারে, খানিক গল্প করি।

বামন আগুনের ধারে বসল, বলল—তুমি তো বেশ ভালো লোক। তোমাকে আমি একটা জিনিষ দিয়ে যাই। এই থলিটা রাখ, এই থলির টাকা কখনও ফুরাবে না। যত চাইবে তত পাবে।

থলি দিয়ে বামন চলে গেল।

এদিকে দ্বিতীয় সৈনিকের পালা শেষ হল। তৃতীয় সৈনিককে জাগিয়ে দিয়ে সে শুয়ে পড়ল।

তৃতীয় সৈনিক বসে বসে পাহারা দিচ্ছে। এমন সময় কোথা থেকে ছোট্ট একটি বামন এসে উপস্থিত হল। লাল জামা পরণে ছোট একরত্তি মানুষ। জিজ্ঞাসা করল—কে গো তুমি?

তৃতীয় সৈনিক বলল—আমরা তিন বন্ধু। এখানে রাত কাটাচ্ছি। তুমি বস না আগুনের পাশে, খানিক গল্প করি।

বামন আগুনের পাশে বসল, বলল—তুমি তো বেশ ভালো লোক। তোমাকে আমি একটা জিনিষ দিয়ে যাই। এই বাঁশীটি রাখ, এই বাঁশীটি বাজালেই চারিপাশের লোক জড়ো হবে, নিজের কাজকর্ম ভুলে নাচতে শুরু করবে। তুমি যা বলবে, তারা তাই করবে।

বাঁশী দিয়ে বামন চলে গেল।

এদিকে সকাল হয়ে এল। আর দু'জন সৈনিকের ঘুম ভাঙল। তিনজন একে একে বামনের কথা বলল। তারপর একসঙ্গে তিন বন্ধু আবার বেরিয়ে পড়ল পথে।

তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে তিনজনে সন্ধ্যাবেলা এসে পৌঁছাল এক সহরে। বলল—আর এভাবে পথ চলতে ইচ্ছে করে না, এই সহরে দিন কয়েক থেকে যাই।

প্রথম সৈনিক চাদরখানি গায়ে দিয়ে বলল—আমাদের একখানি ভালো বাড়ী হোক্।

চোখের নিমেষে মাঠের মাঝে একখানি বাড়ী হয়ে গেল। প্রকাণ্ড

বাড়ী। লোকজন, দাসদাসী, গাড়ী ঘোড়া—কত! সামনে ফুলের বাগান, পিছনে খিড়কীর পুকুর।

পরদিন তিন বন্ধু ভালো কাপড়-জামা পরে, গাড়ী চড়ে বেরুল সহরে বেড়াতে। গাড়ী এসে থামল রাজবাড়ীর সামনে। রাজা ভাবলেন, এতো যখন জাঁকজমক তখন এরা নিশ্চয়ই কোন রাজার ছেলে। আদর কবে রাজসভায় তাদের বসালেন। রাজার ছিল একটি মেয়ে। রাজা ভাবলেন এদেরই একজনের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দেবেন।



তিনবন্ধু রাজসভায় যায় আসে। বাজকন্যার সঙ্গে তাদের ভাব হয়ে গেল। একদিন রাজকন্যা দ্বিতীয় সৈনিককে জিজ্ঞাসা করল—তোমার ঐ থলিটি কিসের?

দ্বিতীয় সৈনিক বলল—এটি ভারী মজার থলি, এতে হাত ভরলেই টাকা পাওয়া যায়।

রাজকন্যা বললে—এ থলি কোথায় পেলে?

সৈনিক রাজকন্যাকে বামনেব কথা সব বলল।

রাজকন্যার ভাবী লোভ হল। সে ঠিক করলে ওই থলিটি সে নেবে। চুপি চুপি নিজে ঠিক সেই রকম রঙের তেমনি একটি থলি তৈরী করল। তারপর একদিন দ্বিতীয় সৈনিককে নিমন্ত্রণ করে সরবতের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিলে। দ্বিতীয় সৈনিক সরবৎ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, রাজকন্যা সেই ফাঁকে নকল থলিটি তার পকেটে রেখে আসল থলিটি সরিয়ে ফেলল।

দ্বিতীয় সৈনিক বাড়ী এলে থলির মধ্যে হাত ভরে আর টাকা পায় না। একি হল? দুই বন্ধুকে বলল সব কথা। প্রথম সৈনিক বলল—ঠিক আছে, আমি এখনই থলি নিয়ে আসছি।

প্রথম সৈনিক গায়ে চাদর মুড়ি দিল, বলল—আমাকে নিয়ে চল রাজকন্যার ঘরে।

চোখের নিমেষে সে রাজকন্যার ঘরে এসে পড়ল। রাজকন্যা তখন থলি থেকে টাকা বের করছে আর ঘরময় ছড়াচ্ছে। হঠাৎ প্রথম সৈনিককে সামনে দেখেই সে চমকে উঠল, চেঁচিয়ে উঠল—চোর! চোর!



চারিপাশ থেকে লোকজন দৌড়ে এল। সৈনিক ভুলে গেল তার চাদরের কথা। জানালা দিয়ে সে লাফ মারল বাইরে। চাদরখানা রয়ে গেল রাজকন্যার ঘরে। চাদরখানির গুণের কথা রাজকন্যা শুনেছিল, চাদরখানি পেয়ে সে ভারী খুসি হল।

হাঁপাতে হাঁপাতে প্রথম সৈনিক তো ফিরল। তার মুখ থেকে সব কথা শুনে তৃতীয় সৈনিক বলল—কোন ভয় নাই, আমি এখনই সব ব্যবস্থা করছি।



সে তখনই বাঁশী বাজাতে সুরু করল। হাজার হাজার লোক এসে জড়ো হল বাড়ীর সামনে। সৈনিক তাদের হুকুম দিলে—রাজবাড়ী দখল করে রাজকন্যাকে ধরে আন।

লোকজন ছুটল। রাজবাড়ী ঘেরাও করল। রীতিমত লড়াই বেধে গেল।

রাজকন্যা শুনেছিল বাঁশীর কথা। চাদরখানি গায়ে দিয়ে বলল—আমাকে নিয়ে চল সৈনিকের ঘরে।

চোখের নিমেষে রাজকন্যা সৈনিকের ঘরে এসে পৌঁছাল। সৈনিক ঘরে ছিল না। সে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল। বাঁশীটি ঝুলছিল দেয়ালের গায়ে। রাজকন্যা সেটি নিয়ে এল। বাঁশী বাজিয়ে রাজকন্যা লোকজনদের হুকুম দিলে—তোমরা চলে যাও!

লড়াই থেমে গেল, যারা এসেছিল তারা চলে গেল।

তিনবন্ধু তো অবাক। বাড়ী ফিরে দেখে, বাঁশী নেই। মনের দুঃখে বাড়ী-ঘর ছেড়ে তারা তিনজন আবার পথে বেরিয়ে পড়ল।

নগর ছাড়িয়ে তারা এসে পড়ল বনে। বনের মাঝে এক জায়গায় পথটি দু'ভাগ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় সৈনিক বলল—আমি একদিকে যাই, আর তোমরা দু'জন আর একদিকে যাও।

দ্বিতীয় সৈনিক গেল ডান দিকের পথে, আর প্রথম ও তৃতীয় সৈনিক গেল বাঁ দিকের পথে।

দ্বিতীয় সৈনিক চলতে চলতে বনের মাঝে সন্ধ্যা হয়ে এল। এক গাছের নিচে শুয়ে সে ঘুমুল। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই দেখে সেটা আপেলের বন। চারিপাশের গাছে লাল টুকটুকে আপেল ভরে আছে। তার ভারী খিদে পেয়েছিল, গাছ থেকে কয়েকটি আপেল পেড়ে নিয়ে সে খেতে, সুরু করে দিলে। আপেল খেতে খেতে তার নাকটা সুড় সুড় করে উঠল। হাত বুলিয়ে দেখে, নাক বাড়তে সুরু করেছে। দেখতে দেখতে নাকটি বুক অবধি ঝুলে পড়ল। তারপর লম্বা হয়ে গেল হাতীর শুঁড়ের মত। ধীরে ধীরে আরও বেড়ে চলল। বনের গাছের ফাঁক দিয়ে এগিয়ে চলল তার নাক।



এদিকে প্রথম ও তৃতীয় সৈনিক বনের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে কিসে একটা হোঁচট খেল, পায়ে লাগল নরম একটি শুঁড়। কার শুঁড়? দু'জনে সেই শুঁড় ধরে চলতে শুরু করল। শেষে এসে দেখে সেটি তাদের বন্ধুর নাক। নাকের ভারে বন্ধু শুয়ে আছে বনের মধ্যে।

বন থেকে দু' বন্ধু একটি গাধা ধরল। তারপর নাকওয়ালা বন্ধুর নাকটি গুটিয়ে নিয়ে, সেই গাধার পিঠে চড়িয়ে তাকে নিয়ে চলল সহরের দিকে। কিন্তু নাকের ভারে গাধা বেশীদূর চলতে পারল না। বনের মাঝেই বসে পড়ল। দুইবন্ধু তখন দ্বিতীয় সৈনিককে নিয়ে কি করবে বুঝতে পারল না। বনের মাঝে গাছতলায় বসে তারা ভাবতে লাগল।

এমন সময় সেই লাল জামা পরা বামনটি এসে হাজির হল, বলল —কি গো, কি খবর?

—আর খবর!—দু' বন্ধু বামনকে সব কথা বলল।

—এ আর এমন কি! আমি এখনই সারিয়ে দিচ্ছি,—বলে বামন সামনের একটি পেয়ারা গাছ থেকে একটি পেয়ারা পেড়ে এনে দিলে দ্বিতীয় সৈনিকেব হাতে, বলল—খেয়ে ফেল।

দ্বিতীয় সৈনিক পেয়ারাটি খেতে খেতে তার নাক আবার আগের মত ছোট হয়ে ঠিক হয়ে গেল।

বামন বলল—তোমরা এই আপেল আব পেযারা দিয়ে তোমাদের শত্রুকে জব্দ করতে পার। ওই গাছের আপেল খেলেই নাক বাড়বে, আর এই গাছের পেয়ারা খেলেই নাক ছোট হবে। এই আপেল আর পেয়ারা নিয়ে যাও সেই রাজকন্যার কাছে।

বামনের কথামত তিনবন্ধু কয়েকটি আপেল আর পেয়ারা নিয়ে তখনই সেই বন থেকে বেরিয়ে পড়ল।

দ্বিতীয় সৈনিক ফেরিওয়ালা সেজে আপেল বেচতে এল রাজার সভায়। লাল টুকটুকে আপেল। যে দেখে সেই বলে—চমৎকার! ফেরিওয়ালা বলল—শুনেছি রাজকন্যা খুব আপেল খেতে ভালবাসে, এগুলি সরেস আপেল, তার জন্যই এনেছি।

রাজা রাজকন্যাকে ডাকলেন। রাজকন্যা সব আপেল কিনে নিলে।

ঘরে বসে রাজকন্যা আপেল খায়। নাক সুড় সুড় করে উঠে। রাজকন্যা যত আপেল খায়, নাক ততো লম্বা হয়। জানালা দিয়ে বেরিয়ে নাক গিয়ে পড়ল বাগানে। তারপর বাগানও পার হয়ে গেল।

রাজ্য মধ্যে হৈ চৈ পড়ে গেল। নাকের ভারে রাজকন্যা উঠতে বসতে পারে না। রাজা বললেন—যে রাজকন্যাকে সারাতে পারবে তাকে লাখ টাকা পুরস্কার দোব।



দ্বিতীয় সৈনিক এবার বদ্যি সেজে এল রাজসভায়। রাজকন্যাকে দেখে-শুনে আধখানি পেয়ারা খেতে দিয়ে গেল। পেয়ারা অর্ধেক খেতেই নাক অর্ধেক হয়ে গেল।

পরদিন বদ্যি আবার এল। এবার সে আধখানি আপেল দিলে খেতে। আপেল খেতেই রাজকন্যার নাক আবার বেড়ে গেল।

পরদিন, বদ্যি এসে বলল—তাইত, ব্যাপার কি হল?

আবার সে আধখানা পেয়ারা দিলে খেতে। রাজকন্যার নাক আবার ছোট হয়ে গেল।

বদ্যি একদিন পেয়ারা দেয় আর পরদিন আপেল দেয়। একদিন নাক ছোট হয়, তার পরদিন আবার বড় হয়।

বদ্যি বলল—এমন হল কেন? রাজকন্যা নিশ্চয়ই কারও কোন জিনিষ চুরি করেছে।

রাজকন্যা কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল—হ্যাঁ, আমি চুরি করেছি।

বদ্যি বলল—চোরাই জিনিষ,—যার জিনিষ তাকে ফেরৎ দিতে হবে।

রাজকন্যা বলল—যাদের জিনিষ তারা তো দেশ ছেড়ে চলে গেছে, তাদের কোথায় এখন পাব?

বদ্যি বলল—আমার কাছে সেগুলি জমা রাখো।

রাজকন্যা তখনই দাসীকে বলে দিলে। দাসী থলি, চাদর আর বাঁশী এনে দিলে বদ্যির হাতে। বদ্যি এবার রজকন্যাকে পুরা একটি পেয়ারা দিলে, বললে—এবার নিশ্চয়ই সারবে।

রাজকন্যা পেয়ারাটি খেলে। দেখতে দেখতে নাক একেবারে ছোট হয়ে যেমনটি ছিল তেমনটি হয়ে গেল। রাজা ভারী খুসি হলেন, বললেন—নাও, তোমার লাখ টাকা পুরস্কার।

বদ্যি বলল—টাকার দরকার নেই মহারাজ। এ হল রাজকন্যার চুরি করার সাজা। রাজকন্যা সৎভাবে থাকলেই আমার পুরস্কার পাওয়া হবে, আর কিছু আমি চাই না। আমি বদ্যি, বদ্যির কাজ করেছি।

বদ্যি চলে গেল।

তারপর তিনবন্ধু আবার মনের আনন্দে দিন কাটাতে লাগল। কিছুরই আর তাদের অভাব রইল না। খায়-দায়, ঘুমায়, আর যত গরীব-দুঃখীকে ডেকে এনে যত-কিছু খাওয়ায়। দেশ জুড়ে তিনবন্ধুর জয়জয়কার পড়ে গেল। আমার গল্পও ফুরুল।

চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে—যখন পড়ে ধরা,
কেঁদে তখন থই পায় না—শাস্তি হয় কড়া।

হাঁস-রাখালী

এক ছিল রাজা। রাজার ছিল একটি মেয়ে। মেয়ের বয়স যখন খুব কম তখন রাজা মারা গেলেন। রাণীই রাজ্য চালাতে লাগলেন।

দিন যায়। বছর যায়। রাজকন্যা বড় হয়। রাজা রাজকন্যার বিয়ের ঠিক করে গিয়েছিলেন ভিন্‌দেশের এক রাজার ছেলের সঙ্গে। সে-দেশ থেকে খবর এল—তোমাদের মেয়েকে পাঠিয়ে দাও, এখানে বিয়ে হবে।

রাণী রাজকন্যার যাবার যোগাড় করলেন। হীরে-মুক্তার গহনা দিলেন বাক্স ভরে। লাল জরীর পোষাকে সাজিয়ে দিলেন মেয়েকে।

সাদা ঘোড়ার পিঠে চড়ে রাজকন্যা চলল রাজপুত্রের বাড়ী।

সঙ্গে চলল তার সহচরী কালো ঘোড়ার পিঠে চড়ে।

যাবার সময় রাণী রাজকন্যার হাতে দিলেন একটি রক্ষা-কবচ, বললেন—এটি কাছে থাকলে কোন বিপদ হবে না।

কবচ হাতে পরে রাজকন্যা চলল রাজপুত্রের বাড়ী।

কত বন-বাদাড় পার হয়ে, তেপান্তরের মাঠের উপর দিয়ে রাজকন্যা চলল। পথের বুঝি আর শেষ নেই। এক নদীর তীরে এসে রাজকন্যা বলল—সখী, বড় তেষ্টা পেয়েছে। জল এনে দাও, খাই।

সহচরী বলল—তোমার যদি তেষ্টা পেয়ে থাকে নিজে গিয়ে জল খাওগে, আমি আর তোমার দাসীর কাজ করব না।



রাজকন্যা কি আর করবে, ঘোড়া থেকে নেমে নদীতে গেল জল খেতে। জল পান করে রাজকন্যা আপন মনে বলল—এ- াবে আমি অত পথ কি করে যাব?

কবচ ছিল হাতে, কবচ বলে উঠল—

হায় হায় হায়, রাজার কন্যে, জানত যদি রাণী,
এমন সইকে তোমার সঙ্গে দিত না তা জানি।

রাজকন্যার স্বভাব ছিল ভারী শান্ত। সহচরীকে সে কিছুই বললে না। ঘোড়ায় চড়ে আবার সে চলল তেপান্তরের মাঠে।

চলতে চলতে দুপুর রোদে রাজকন্যা ক্ল- ন্ত হয়ে পড়ল। এত পথ সে কোন দিন চলেনি। আবার তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে গেল। আর এক নদীর ধারে এসে সে বলল—সখী, বড় তেষ্টা পেয়েছে, জল এনে দাও, খাই।

সহচরী এবার চড়া সুরে বলল—বলেছি তো, আমি তোমার দাসীর কাজ করব না। তেষ্টা পেয়ে থাকে নিজে গিয়ে জল খাও গে।

রাজকন্যা ঘোড়া থেকে নেমে গেল জল খেতে। জল পান করে রাজকন্যা আপন মনে বলল—এইভাবে আমি অত পথ কি করে যাব?

কবচ বলল—হায় হায় হায়, রাজার কন্যে, জানত যদি রাণী,
এমন সইকে তোমার সঙ্গে দিত না তা জানি।

তারপর নদীর জলে মুখ ধোবার সময় কোন্ এক ফাঁকে কবচটি খুলে জলে পড়ে গেল, রাজকন্যা জানতেও পারল না।

রাজকন্যা ফিরে আসতে সহচরী দেখল রাজকন্যার হাতে আব রক্ষা-কবচ নেই। কবচ যখন নেই রাজকন্যাকে আর ভয় করার কিছুই নেই। সহচরী বলল—তোমার সাজ-পোষাক আমাকে দাও, আমার সাজ-পোষাক তুমি নাও, তোমার ঘোড়ায় আমি চড়ি, আমার ঘোড়ায় তুমি চড়।

সহচরী জোর করে রাজকন্যার পোষাক খুলে নিলে, নিজের পোষাক তাকে পরাল। তাকে কালো ঘোড়ায় চড়িয়ে, নিজে রাজকন্যা সেজে সাদা ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল। বলল—এখন থেকে আমি হলেম রাজকন্যা, আর তুমি হলে সহচরী,—আমার দাসী। দেখো, এ-কথা যেন ভুল না হয়, ভুলেছ কি গর্দান গেছে।

রাজকন্যার স্বভাব ছিল শান্ত, সে কিছু বললে না, দাসী হয়েই চলল। চলতে চলতে তেপান্তরের মাঠ শেষ হল। তারা এসে পৌঁছাল ভিন্‌দেশের রাজবাড়ীর দরজায়। রাজবাড়ীতে নহবৎ বেজে উঠল। রাজা ছুটে এলেন, রাজপুত্র ছুটে এল। সহচরীর সাজ-পোষাক দেখে রাজপুত্র তাকেই রাজকন্যা বলে ভাবল, হাত ধরে তাকে ঘোড়া থেকে নামাল, সোনার চতুর্দোলা করে নিয়ে গেল অন্তঃপুরে। রাজকন্যা ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে রইল। খানিক বাদে রাজা বললেন—তুমি কে?

রাজকন্যা ভয়ে-ভয়ে বলল—আমি রাজকন্যার সই, তার দাসী।

রাজা তাকে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দিলেন। রাজকন্যাকে দেখেই

সহচরীর চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল, বললে—ও আবার এখানে কেন? ও দাসী, আমার কাছে থাকবে না। ওকে এখানে কোন কাজ দাও, কাজ করবে, খাবে।

রাজপুত্র রাজাকে বললে—দাসীকে একটি কাজ দিন।

রাজা বললেন—বেশ, যে ছেলেটি হাঁস চরায় সে একা তো সব দেখতে পারে না, ও গিয়ে তার সঙ্গে হাঁস চরাবে।

সেইদিন থেকে রাজকন্যার কাজ হল হাঁস চরানো।

এদিকে রাজকন্যার সাদা ঘোড়ার একটি মস্ত গুণ ছিল, সে মানুষের মত কথা বলতে পারত। সে তো সব কিছুই দেখেছিল, সব কিছুই সে জানে, এখন সে যদি কাউকে কোন কথা বলে দেয়! সহচরীর ভারী ভয় হল। সে একদিন রাজপুত্রকে বলল—রাজপুত্র, আমার একটি কথা রাখুন, ওই ঘোড়াটি মহা পাজী, ওকে মেরে ফেলুন।

রাজপুত্র তখনই হুকুম দিলেন। জল্লাদ গিয়ে ঘোড়ার মাথা কেটে ফেলল। রাজকন্যার মনে ভারী কষ্ট হল। ঘোড়ার কাটা মুণ্ডটা নিয়ে সে মাঠের মাঝে এক গাছের গায়ে পেরেক দিয়ে গেঁথে রাখল। প্রতিদিন সকালে সে সেই গাছের পাশ দিয়ে যায় হাঁস চরাতে আর ঘোড়ার মুণ্ডের পানে তাকিয়ে বলে—



সাদা ঘোড়া, সাদা ঘোড়া, মরলে তুমি আমার তরে।

কাটা মুণ্ড তখনই উত্তর দেয়—

অমন দুষ্ট সখী, কন্যে, কেউ যেন না রাখে ঘরে
হায় হায় হায়, রাজার কন্যে, জানত যদি রাণী,
এমন সইকে তোমার সঙ্গে দিত না, তা জানি।

হাঁস নিয়ে রাখাল ছেলের সঙ্গে রাজকন্যা যায় মাঠে। স্নান করে পুকুরের পাড়ে বসে চুল শুকায়। সোনার-বরণ চুল রোদ লেগে ঝিক্

ঝিক্ করে ওঠে। রাখাল ছেলে দেখে দৌড়ে আসে, বলে—এ তো চুল নয় এ যে সোনা! আমি কেটে নিয়ে যাই, বাজারে গিয়ে বিক্রী করব।

রাখাল ছেলে রাজকন্যার চুলগুলি কেটে নিতে যায়। রাজকন্যা বলে—আয় আয় আয়—বাতাস আয় দেশে,

টোকা যা তুই ভেসে।
হাওয়ার আগে টোকা যা,
রাখাল, তুই পিছু ধা।
টোকা যা তুই হাওয়ায় ভেসে
রাখাল ছুটুক মাঠের শেষে।
চুল শুকাতে যতেক বেলা
হাওয়ায় টোকা করুক খেলা।

তখনই ঝড়ের মত একটা দম্‌কা বাতাস এসে রাখালের মাথা থেকে টোকাটা উড়িয়ে নিয়ে গেল। রাখাল ছুটল টোকার পিছনে।



রাখাল যত ছোটে, টোকা তত বাতাসে ভেসে যায়।

সারাদিন সারা মাঠে টোকার জন্য ছুটোছুটি করে রাখাল যখন টোকা হাতে নিয়ে ফিরে এল, রাজকন্যার তখন চুল শুকিয়ে গেছে, চুল আঁচড়ে সে চুল বেঁধে ফেলেছে। রাখাল বললে—বেশ, আজ না হোক্ কাল আমি ওই চুল কেটে নিয়ে যাব, বাজারে বেচলেই টাকা পাব।

পরদিন রাজকন্যা আবার হাঁস চরাতে আসে। রাখাল ছেলে রাজকন্যার উপর নজর রাখে। গাছের নিচে এসে রাজকন্যা বলে—

সাদা ঘোড়া, সাদা ঘোড়া, মরলে তুমি আমার তরে।

ঘোড়ার কাটা মুণ্ড জবাব দেয়,

অমন দুষ্ট সখী, কন্যে, কেউ যেন না রাখে ঘরে॥
হায় হায় হায়, রাজার কন্যে, জানত যদি রাণী,
এমন সইকে তোমার সঙ্গে দিত না, তা জানি।

মাঠে হাঁস চরে, রাজকন্যা পুকুরে স্নান করে, ঘাটে চুল শুকাতে বসে। রাখাল ছুটে আসে, বলে—এবার! আজ সব চুল কেটে নেব।

রাজকন্যা বলে—আয় আয় আয়—

বাতাস আয় দেশে
টোকা যা তুই ভেসে।
হাওয়ার আগে টোকা যা,
রাখাল তুই পিছু ধা।
টোকা যা তুই হাওয়ায় ভেসে,
রাখাল ছুটুক মাঠের শেষে।
চুল শুকাতে যতেক বেলা
হাওয়ায় টোকা করুক খেলা।

রাখালের মাথার টোকা উড়ে গেল বাতাসে, রাখাল ছুটল টোকার পিছনে। সারাদিন টোকার পিছনে ছুটোছুটি করে রাখাল যখন টোকা নিয়ে ফিরল তখন রাজকন্যার চুল শুকিয়ে গেছে, বাঁধা হয়ে গেছে। রাখাল বললে—বেশ, আমি দেখছি!

রাখাল গেল রাজার কাছে। বললে—মহারাজ, নতুন যে মেয়েটিকে দিয়েছেন আমার সঙ্গে হাঁস চরাতে, সে একটা ডাইনী।



রাজা বললেন—কেন?

রাখাল বলল—তার সঙ্গে ঘোড়ার কাটামুণ্ড কথা বলে। সে মন্ত্র পড়লে ঝড় বয়। আপনি চলুন, আমি আপনাকে দেখিয়ে দেব।

পরদিন সকালে রাজা লুকিয়ে রইলেন মাঠের এক গাছের আড়ালে। রাজকন্যা হাঁস নিয়ে এল মাঠে, গাছের নিচে এসে বলল—

সাদা ঘোড়া, সাদা ঘোড়া, মরলে তুমি আমার তরে।

গাছ থেকে কাটা মুণ্ড জবাব দিলে—

অমন দুষ্ট সখী, কন্যে, কেউ যেন না রাখে ঘরে ॥
হায় হায় হায় রাজার কন্যে, জানত যদি রাণী,
এমন সইকে তোমার সঙ্গে দিত না, তা জানি।

রাজকন্যা পুকুরে স্নান করে ঘাটে বসল চুল শুকাতে, রাখাল গিয়ে তার চুলে হাত দিল। রাজকন্যা বলল—আয় আয় আয়—

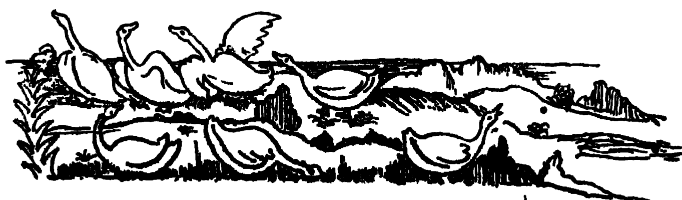
বাতাস আয় দেশে,
টোকা যা তুই ভেসে।
হাওয়ার আগে টোকা যা,
রাখাল তুই পিছু ধা।
টোকা যা তুই হাওয়ায় ভেসে,
রাখাল ছুটুক মাঠের শেষে।
চুল শুকাতে যতেক বেলা
হাওয়ায় টোকা করুক খেলা।

বলতে বলতে রাখালের টোকা হাওয়ায় ভেসে গেল। রাখাল ছুটল টোকার পিছনে।



রাজা সব দেখলেন। তখন কিছু বললেন না। সন্ধ্যাবেলা রাজকন্যা ফিরতেই ডেকে বললেন—হাঁস-রাখালী, তুমি ডাইনী, কাটা মুণ্ডুর সঙ্গে কথা বল, মন্ত্র পড়ে ঝড় বহাও। তোমার সত্যিকারের পরিচয় কি বল ?

রাজকন্যা কেঁদে ফেলল। তারপর একে একে বলল সব কথা। রাজা সব শুনলেন। তারপর তখনই যত ভাল ভাল সাজ-পোষাক



আনিয়ে পরতে দিলেন রাজকন্যাকে। সাজ-পোষাকে তাকে এমন মানাল যে, রাজা দেখেই বুঝলেন—এ-ই সত্যিকারের রাজকন্যা।

তারপর রাজা ডাকলেন রাজসভা। নকল রাজকন্যাকে বললেন—তোমার বিচার-বুদ্ধির পরীক্ষা করব। একটি গল্প বলি, শোন—

রাজা সাজিয়ে-গুছিয়ে বললেন রাজকন্যা আর তার সহচরীর গল্প। শেষে বললেন—বল দেখি, এই সহচরীর কি সাজা হওয়া উচিত? দেখি, রাণী হবার পরে তুমি কেমন বিচার করবে?

নকল রাজকন্যা তখনই জবাব দিলে—অমন সহচরীকে হেঁটে-কাঁটা উপরে-কাঁটা দিয়ে পুঁতে ফেলা উচিত।

রাজা বললেন—বেশ, তোমার বিচারই আমি মেনে নিলাম। তুমি সেই নকল রাজকন্যে, আর আসল রাজকন্যে এই দেখ।

আসল রাজকন্যাকে রাজা এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন সভার মাঝে। তখনই নকল রাজকন্যাকে হেঁটে-কাঁটা উপরে-কাঁটা দিয়ে পুঁতে ফেলা হল।

এবার আসল রাজকন্যার সঙ্গে রাজপুত্রের বিয়ে হয়ে গেল। রাজকন্যার দুঃখ ঘুচল। আমার কথাটিও ফুরুল—

অন্যায় কাজ করে যদি গোড়ায় করো সুবিধা হয়,
শেষটা তার দেখবে তুমি কোনদিনই শুভ নয়

ইচ্ছাপূরণ পাথর

দুঃখীরামের আপনজন বলতে কেউ ছিল না। সামান্য দু-চার টাকা যা ছিল তাই নিয়ে সে একদিন বেরিয়ে পড়ল তীর্থ ভ্রমণে। তখনকার দিনে ত আর রেলগাড়ী ছিল না, হাঁটতে হাঁটতে সে চলল মেঠো পথ ধরে। হাঁটতে হাঁটতে একদিন সে এসে পৌঁছাল এক গাঁয়ে। পথের পাশে গাঁয়ের ছেলেরা একটা নেংটি-ইঁদুরের লেজে সুতো বেঁধে নাচাচ্ছিল। ইঁদুরটা পালাবার জন্য ছট্‌ফট্ করছে।

ছেলেরা হাততালি দিচ্ছে, আর হাসছে। ছেলেরা বলল—দেখ এসে ইঁদুর নাচ।

দেখে দুঃখীরামের কষ্ট হল, বলল—ওকে ছেড়ে দাও, আমি তোমাদের পয়সা দিচ্ছি।

ছেলেদের হাতে দুঃখীরাম কয়েকটা পয়সা দিল, তারা ইঁদুরটাকে ছেড়ে দিলে। ইঁদুরটা এক লাফে ঢুকে গেল মাঠের এক গর্তে।

দুঃখীরাম হাঁটতে হাঁটতে এল আর-এক গাঁয়ে। সেখানে একদল ছেলে একটা গাধাকে জ্বালাতন করছিল। গাধাটাকে পিছনের দু'পায়ে দাঁড় করাচ্ছে, পড়ে গেলেই মারছে। গাধা দু'পায়ে দাঁড়াতে পারবে কেন? মার খেয়ে খেয়ে বেচারা কাতরাচ্ছে। দেখে দুঃখী-রামের কষ্ট হল, বলল—ওকে ছেড়ে দাও, আমি তোমাদের পয়সা দিচ্ছি।

দুঃখীরাম কয়েকটা পয়সা দিল, ছেলেরা গাধাটিকে ছেড়ে দিলে।

দুঃখীরাম হাঁটতে হাঁটতে এল আর-এক গাঁয়ে। সেখানে একদল ছেলে একটা বাচ্চা ভালুককে নাচতে শেখাচ্ছে। নাকে দড়ি বাঁধা, দড়ির টানাটানিতে ভালুকের নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে। দেখে দুঃখীরামের কষ্ট হল, বলল—ওকে ছেড়ে দাও, আমি তোমাদের পয়সা দিচ্ছি।

দুঃখীরাম পয়সা দিল, ছেলেরা ভালুকটিকে ছেড়ে দিলে। ভালুকের বাচ্চা পালিয়ে গেল বনের মধ্যে।

এদিকে পয়সা দিতে দিতে দুঃখীরামের পকেট খালি হয়ে গেছে, যা কিছু ছিল সবই খরচ হয়ে গেল। এখন সে তীর্থে যাবে কেমন করে? সামনেই রাজার বাড়ী, দুঃখীরাম ভাবল—'রাজার ত কত টাকা, কিছু ধার নিয়ে তীর্থ টা আগে ঘুরে আসি, ফিরে এসে শোধ করে দিলেই হবে।' দারোয়ানের চোখে ধুলো দিয়ে দুঃখীরাম রাজবাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ল। রাজার ধনাগারে গিয়ে নিজের দরকার মত সামান্য টাকা-পয়সা নিয়ে সে বেরিয়ে এল। কিন্তু বেরুবার সময় পাহারাওয়ালা তাকে ধরে ফেলল।

রাজসভায় দুঃখীরামের বিচার হল। রাজা বললেন—ও চোর, ওকে একটা বাক্সে ভরে জলে ভাসিয়ে দাও।

দুঃখীরামকে একটা কাঠের সিন্দুকে বন্ধ করে নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হল। কাঠের সিন্দুক ভেসে চলল নদীর স্রোতে। ভাসতে ভাসতে এসে লাগল এক ঘাটে। কুট্‌কুট্‌ কুট্‌কুট্‌ করে বাক্সের ডালা কাটার শব্দ হল। তারপরেই সিন্দুকের ডালা খুলে গেল, দেখা গেল ইঁদুর, গাধা আর ভাল্লুক বাক্সের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তারা বলল—আপনি একদিন আমাদের বাঁচিয়েছিলেন, আমরা সে উপকার ভুলিনি।

চারজনে বনের পথ ধরে চলতে সুরু করল। কোন এক সময় নদীর তীর থেকে ভালুক একটা পাথর কুড়িয়ে নিলে, বললে—এটি ইচ্ছাপূরণ পাথর। এর কাছ থেকে যা চাইবে তাই পাবে।

দুঃখীরাম তখনই সেই পাথরের কাছ থেকে চেয়ে বসল—এখানে এখনি একখানি বড় বাড়ী হোক্, একটা চমৎকার বাগান হোক্, হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, গাড়ী—সব হোক।

তখনই সেখানে বাড়ী হল, বাগান হল, হাতী ঘোড়া হল।

চার বন্ধু সুখে সেখানে বাস করতে লাগল।

সেই পথ দিয়ে একদল সদাগর যাচ্ছিল। বনের ধারে অমন বাড়ী বাগান দেখে তারা অবাক হয়ে গেল। দুঃখীরামকে তারা জিজ্ঞাসা করল—এই বনের ধারে এমন বাড়ী করলেন কেন?

দুঃখীরাম বলল—আমায় কিছু করতে হয়নি, সব এই ইচ্ছাপূরণ পাথরখানি করেছে।

সদাগর বলল—ওই পাথরখানি আমাদের বিক্রী করুন। কি চান বলুন?

পাথরখানি থেকে যা চাইবে তাই পাবে,—একথা দুঃখীরাম ভুলে গেল, বলল—তোমাদের কাছে যা আছে সব যদি আমাকে দাও, ত দিই।

সদাগররা তখনই যা ছিল সব দিয়ে দিলে। দুঃখীরামও পাথরখানি তাদের দিয়ে দিলে।

পাথরখানি নিয়ে সদাগররা চলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে দুঃখীরামের বাড়ীঘর সব উবে গেল। দুঃখীরাম দেখে যে সে বসে আছে বনের ধারে। ভালুক বলল—যেভাবেই হোক্ ওই পাথরখানি ফেরৎ পেতেই হবে।

চারজন মিলে চলল, সদাগররা যে পথে গিয়েছিল সেই পথে।

কিছুদূর গিয়েই দেখে সদাগররা আর-একখানি বাড়ী করে দিব্যি আছে। ইঁদুর গিয়ে ঢুকল সেই বাড়ীতে। সারা বাড়ী তন্ন তন্ন করে সে দেখে এল, বলল—পাথরখানি যেখানে আছে, সেখানে একটি হুলো বিড়াল বসে আছে। ওই বিড়াল থাকতে পাথরখানি আমি আনতে পারব না।

ভালুক বলল—বেশ, ওই বিড়ালকে তাড়াতে হবে। ফন্দি বলে দিচ্ছি।

রাত্রে সদাগর ঘুমুচ্ছিল ইঁদুর গিয়ে তার নাকে কামড়ে দিল। সদাগর ত রেগেই আগুন। বিড়ালটা কিছুই করে না, এত ইঁদুর হয়েছে বাড়ীতে একটাকেও ধরে না। তখনই সে বিড়ালটাকে মেরে বাড়ী থেকে বের করে দিলে।

এবার ইঁদুরের সুবিধা হল। সারা রাত বসে বসে কাঠের সিন্দুকটা কাটল। বের করে আনল সেই পাথরখানিকে। তারপর পাথরখানিকে গড়িয়ে গড়িয়ে নিয়ে এল ঘরের বাইরে। সেখান থেকে বাগানের পাঁচিলের পাশে। বাগানের মধ্যে গাধা দাঁড়িয়েছিল, সে পাথরখানি মুখে নিয়ে বাগান থেকে বেরিয়ে এল। ভালুক ছিল বনের ধারে, সে এবার গাধা আর ইঁদুরকে পিঠে নিয়ে এক দৌড়ে বন পার হয়ে এল নদীর তীরে। ভালুক বলল—যাক্, আমাদের বুদ্ধিতে এবার কাজ হয়েছে! কি বল?

গাধার মুখে পাথর, সে কোন জবাব দিল না।

ভালুক বলল—কি রে গাধা, কথা বলছিস্ না যে? কথার জবাব দিবিনে? জানিস্ আমি ভালুক, এক চড়ে তোকে ঠাণ্ডা করে দেবো।

—কি বলব, আমার মুখে যে পাথর।

যেই কথা বলা অমনি পাথরখানি গাধার মুখ থেকে পড়ে গেল। গোল পাথর। গড়িয়ে পড়ে গেল নদীর জলে। গাধা বলল—এখন কি হবে?

ভালুক বলল—কি আবার হবে, ওই পাথর তুলতে হবে।

—নদীর তলা থেকে পাথর কি করে তুলবে?

—ঠিক তুলব, আমি কি তোর মত গাধা!

নদীর তীরে ব্যাঙের বাসা। ভালুক সব ব্যাঙদের ডেকে বলল—তোমরা এখনো দিব্যি আরামে বসে আছ, এদিকে যে কি বিপদ আসছে তার কোন খবরই জান না?

ব্যাঙেরা বলল—কি হয়েছে?

ভালুক বলিল—বনে এক প্রকাণ্ড জানোয়ার এসেছে, সে দিনে একশো ব্যাঙ ধরে খায়। আমাদের ওদিকে সব ব্যাঙ খেয়ে শেষ করেছে, এবার আসছে এই দিকে।

—আমরা কি করব?

—পাথর জোগাড় কর,—আশেপাশে, নদীর নীচে, যেখানে যত পাথর পাও জড়ো কর। আমরা এদিকে একটা উঁচু পাঁচিল তুলে দেব, যাতে সেই জানোয়ারটা পাঁচিল পার হয়ে এদিকে না আসতে পারে।

ব্যাঙেরা পাথর জড়ো করতে সুরু করল। নদীর পাড়ের পাথর শেষ হয়ে গেল, এবার ব্যাঙেরা ডুব দিল নদীর জলে। দেখতে দেখতে নদীর তলা থেকে তারা অনেক পাথর কুড়িয়ে আনল। সেগুলি দেখতে দেখতে ভালুক শেষে ইচ্ছাপূরণ পাথরখানি খুঁজে পেল। আর যায় কোথা, ভালুক ত বেজায় খুসি, বলল—থাক্ থাক্, আর তোমাদের পাথর তুলতে হবে না। কে আবার কষ্ট করে দেয়াল তুলতে যাবে? সেই জানোয়ারটা যদি আসে, ত তোমরা আমাদের ডাক দিও, আমরা এসে এই পাথর ছুঁড়ে তাকে মেরে ফেলব। সেইটেই সোজা হবে, আমরা ভেবে দেখলাম। পাথরগুলো সব এইখানে হাতের কাছে জড়ো করা থাক্।

তিন বন্ধুতে আবার নদীর পথ ধরে চলল। দুঃখীরামের কাছে

এসে বলল—এই নিন সেই পাথর, এবার আর কাউকে বিলিয়ে দেবেন না।

পাথর হাতে পেয়েই দুঃখীরাম বলল—আবার সেই বাড়ী হোক্!

বাড়ী হল। হাতীশালে হাতী হল, ঘোড়াশালে ঘোড়া হল, গাড়ী হল। দুঃখীরাম বলল—ভালুক, গাধা আর ইঁদুর তোমরা আমার বন্ধু, তোমরাও আমার সঙ্গে থাকবে এখানে।

চার বন্ধুতে সেখানে সুখে বাস করতে লাগল।

ভাল লোক কোনদিন দুঃখ নাহি পায়।
সবার সাথে মিলেমিশে আনন্দে কাটায়॥

দুই ভাই

দুই ভাই ছিল। বড় ভাই বড়লোক আর ছোট ভাই গরীব। বড় ভাই আরামে সুখে থাকে। ছোট ভাই চাষ-আবাদ করে, সারাদিন খাটে।

একবার ছোট ভাইয়ের বাগানে প্রকাণ্ড এক কুমড়ো হল। বারো হাত কুমড়ো। ছোট ভাই একখানি গরুর গাড়ীতে চাপিয়ে কুমড়োটি নিয়ে গেল রাজবাড়ীতে। রাজা তো বারো হাত কুমড়ো দেখে অবাক্। বললেন—এমন কুমড়ো তো কখনও দেখি নি! এ কুমড়ো কার বাগানের?

ছোট ভাই বলল—হুজুর, আমার বাগানের?

রাজা বললেন—তুমি যখন এতো বড় কুমড়ো ফলাতে পার, তখন তুমি তো ভালো চাষী। তোমাকে আমি একশো মোহর পুরস্কার দোব, একশো বিঘে জমি দোব, একশোটা গরু দোব।

রাজার পুরস্কার নিয়ে ছোট ভাই বাড়ী ফিরল।

ছোট ভাইয়ের ব্যাপার দেখে বড় ভাইয়ের ভারী হিংসা হল। সে ভাবল, একটা কুমড়ো দেখেই রাজা যদি এতো কিছু দিয়ে থাকেন,

তাহলে আরও ভাল জিনিষ পেলে রাজা আরও কত কি দেবেন। বড় ভাই সোনা-রূপার সব দামী দামী জিনিস নিয়ে চলল রাজার কাছে। রাজা বড় ভাইয়ের উপহারগুলি নিলেন, তারপর হেসে বললেন—তোমার তো অনেক পয়সা, তোমাকে আর আমি কি দোব ?

রাজা কিছুই দিলেন না। বড় ভাই খালি হাতে ফিরে এল। তার যত রাগ গিয়ে পড়ল ছোট ভাইয়ের উপর।

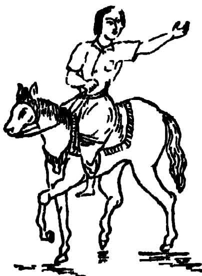
একদিন ছোট ভাইকে ডেকে সে বলল—ভাই, এক জায়গায় গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছি। মাটি খুঁড়ে তুলতে হবে, তুমি চল আমার সঙ্গে।

ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে বড় ভাই বনের মাঝে এক গাছতলায় গেল। সেখানে হঠাৎ ছোট ভাইকে ধরে সে বেঁধে ফেলল। তারপর একটা থলির মধ্যে ভরে তাকে সেই গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিয়ে বড় ভাই বাড়ী ফিরে গেল।



ছোট ভাই ঝুলতে লাগল গাছের ডালে। বহুক্ষণ ধরে দাঁতে কামড়ে, নখে ছিঁড়ে সে থলির মধ্যে একটা ফুটো করল। তারপর সেই ফুটো দিয়ে সে মাথাটা বের করে দিলে।

এদিকে কিছুক্ষণ পরে সেই পথ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে আসছিল একটি ছেলে। ছোট ভাই বলল—নমস্কার বন্ধু, প্রাতঃপ্রণাম !



ছেলেটি প্রথমে তাকে দেখতে পায়নি, বলল—কে ? কে কথা বলল ?

ছোট ভাই বলল—এই যে আমি গাছের উপরে।

ছেলেটি বলে—বারেঃ, তুমি ওখানে কি করছ ?

ছোট ভাই বলল—জ্ঞান অর্জন করছি। এখানে থাকলে কিছুই আর অজানা থাকে না। আমি দেখছি আকাশ কি রকম, বাতাস

কি করে বয়, রাস্তায় কত বালি আছে, কোন্ গাছের পাতায় ওষুধ তৈরী হয়।—এই সবই আমার জানা হয়ে যাচ্ছে।

ছেলেটি এসব শুনে তো অবাক। বলল—এতো জ্ঞান হয় ওখানে থাকলে?

ছোট ভাই বলল—থেকেই দেখ না একদিন। তোমারও জ্ঞান হবে। খানিকক্ষণের জন্য আমি তোমাকে থলিটা ছেড়ে দিতে পারি।

ছেলেটি বলল—কি করে আমি ওখানে উঠব?

ছোট ভাই বলল—গাছের দড়িটা খুলে তুমি আগে আমাকে নামিয়ে নাও। তারপর তোমাকে আমি তুলে দোব।

ছেলেটি তখনই দড়ি খুলে ছোট ভাইকে নামাল।

থলির মুখ খুলতেই ছোট ভাই বেরুল। তারপর ছেলেটিকে সেই থলির মধ্যে ভরে ঝুলিয়ে দিল গাছের ডালে। বললে—তুমি এইখানে থাক, কিছুক্ষণ থাকলেই বুঝতে পারবে, জগৎটা কি রকম।

ছেলেটি সেখানে বুঝতে লাগল, আর ছোট ভাই বরাবর চলে এল নিজের বাড়ীতে।

আসার সময় পথে একটি লোককে বলে এল—ওগো, গাছে একটা ছেলে ঝুলছে, যদি পার তো তাকে নামিয়ে দিও।

সেই থেকে দুই ভাইয়ে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেল।

অপরের ঈর্ষা করা কভু ভাল নয়।
নিজের নিয়ে খুসি থাকা—সুখ তাতেই হয়॥

মুচি আর বামন

এক ছিল মুচি। বেচারা বড় গরীব। জুতো তৈরী করে কোন রকমে তার দিন চলত। কোনদিন দুটি খেতে পেত, কোনদিন তা-ও জুটত না। কিন্তু লোকটি ছিল বড় ধার্মিক, অবসর পেলেই সে ভগবানের নাম করত।

মুচি রোজ এক জোড়া জুতো তৈরী করত। রাত্রে চামড়া কেটে রাখত, সকালে উঠে জুতো সেলাই করতে বসত। সন্ধ্যাবেলা সেই জুতো জোড়া বেচে যা লাভ করত, তাতেই কোন রকমে দিন চলত।

একদিন হল কি, রাত্রে জুতোর চামড়া কেটে রেখেছিল, সকালে উঠে দেখে চমৎকার এক জোড়া জুতো তৈরি হয়ে আছে। মুচি ত অবাক। এ জুতো জোড়া সারা রাত বসে তৈরী করলে কে? একটু পরেই এক খদ্দের এসে ভাল দাম দিয়ে জুতো জোড়া নিয়ে গেল।

সেদিন রাত্রে মুচি দু'জোড়া জুতোর চামড়া কেটে রেখে দিলে। পরদিন সকালে দেখে দু'জোড়া জুতোই তৈরী হয়ে আছে। একটু পরে দু'জন খদ্দের এসে জুতো দু'জোড়া ভাল দামে কিনে নিয়ে গেল।

সেদিন রাত্রে মুচি আবার দু'জোড়া জুতোর চামড়া কেটে রেখে দিলে। সকালে উঠে দেখে ঠিক আগের মতই দু'জোড়া জুতো তৈরী হয়ে আছে। চমৎকার জুতো। যে দেখে তারই পছন্দ হয়। বিক্রী হতে দেরী হয় না।

এইভাবেই দিন যায়। দেখতে দেখতে জুতো বেচে মুচির অবস্থা স্বচ্ছল হয়ে উঠল। একদিন মুচি বলল—সারা রাত জেগে কে আমার জুতো তৈরী করে, আজ রাত জেগে তাই দেখব।

মুচি-বৌ বললে—বেশ, আমিও রাত জাগব।

দু'জনে ঘরের এক পাশে এক পর্দার আড়ালে সারা রাত জেগে বসে রইল।

রাত দুপুরে জানালা দিয়ে এল দুটি বামন। কাটা চামড়াগুলো নিয়ে তারা জুতো সেলাই করতে বসল। এক প্রহরের মধ্যে জুতো সেলাই হয়ে গেল। টেবিলের উপর জুতো রেখে তারা জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

পরদিন মুচি-বৌ বললে—ওরা আমাদের জন্য কতদিন ধরে জুতো তৈরী করে দিচ্ছে। অথচ ওদের গায়ে জামা নেই। আমি ওদের জামা তৈরী করে দোব।

মুচি বলল—ওদের জন্য আমি জুতো তৈরী করে দেব।

সেইদিনই মুচি-বৌ ছুটি জামা তৈরী করে ফেললে। মুচি তৈরী করে ফেলল ছু'জোড়া জুতো। তারপর সেই জামা জুতো তারা সাজিয়ে রেখে দিলে টেবিলের উপরে।



রাত্রে জানালা দিয়ে বামন ছু'জন এল। জুতো আর জামা দেখে ত তারা ভারী খুসী। জামা পরল। জুতো পায়ে দিল। তারপর নাচতে নাচতে হাসতে হাসতে তারা জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল। মুচি ও মুচি-বৌ দেখে ভারী খুসী হল।

সেই যে বামনরা গেল আর এল না। কিন্তু তারপর থেকে সেই মুচিরও আর ছুঃখ রইল না। তখন তার কারবার দিব্যি জমে উঠেছে।

মন যার ভাল হয় ভাল হয় তার।
উপকারীর করতে হয় উপকার॥

জয়-জয়ন্তী

এক গাঁয়ের পাশেই ছিল এক গভীর বন। বনের মধ্যে একটি সুন্দর বাড়ী ছিল। সেই বাড়ীতে থাকত এক পরী। বাড়ীর চারিপাশে সে মন্ত্র পড়ে রেখেছিল, কোন ছেলে সেখানে গিয়ে পড়লে আর বেরিয়ে আসতে পারত না, কোন মেয়ে সেখানে গিয়ে ঢুকলে পাখী হয়ে যেত। পরী সোনার খাঁচায় ভরে সেই সব পাখী সাজিয়ে রাখত তার বাড়ীর বারান্দায়। সাত শো মেয়েকে পরী পাখী করে পুষে রেখেছিল নিজের বাড়ীতে।

গাঁয়ের ছুই ভাই-বোন একদিন খেলতে খেলতে সেই বনে এসে

পড়ল। জয় আর জয়ন্তী। বনে এসেই তারা পথ আর খুঁজে পায় না। যত ঘোরে ততই বনের মাঝে হারিয়ে যায়। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সূর্য অস্ত গেল।

যেই সূর্য অস্ত গেল অমনি জয়ন্তী একটি পাখী হয়ে জয়ের হাত ছাড়িয়ে উড়ে গেল।

এ কি হল? জয় কাঁদতে কাঁদতে বনের মধ্যে ঘুরতে লাগল— কোথায় গেল জয়ন্তী? কেন এমন হল?

অন্ধকারে বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে জয় অবসন্ন হয়ে পড়ল। কোন এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল এক গাছতলায়। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জয় স্বপ্ন দেখল। স্বপ্ন দেখল, বনের মাঝে এক জায়গায় অনেক জবাফুল ফুটেছে। একটি ফুল খুব বড়, তার মাঝে একটি মুক্তা চক্‌চক্ করছে। সেই মুক্তাটি নিয়ে সে এক বুলবুলির গায়ে ছোঁয়াল, অমনি বুলবুলটি জয়ন্তী হয়ে গেল। বোনের হাত ধরে সে বাড়ী ফিরে গেল।

সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই জয় বেরিয়ে পড়ল সেই জবাফুলের সন্ধানে। বনে বনে ঘুরল। কত রকমের কত ফুল দেখল, কিন্তু স্বপ্নে দেখা সেই জবাফুলের বাগান সে আর খুঁজে পেলে না। বনের মাঝে সে ঘুরে বেড়ায় আর কাঁদে। দিন যায়।

দেখতে দেখতে সাঁত দিন কেটে গেল। ঘুরে ঘুরে কেঁদে কেঁদে জয় পাগলের মত হয়ে গেছে। এমন সময় একদিন সে সেই জবাফুলের বাগানে এসে পড়ল। শুধু জবা আর জবা। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় একটা ফুল ফুটে আছে, তার মাঝে একটি শাদা মুক্তা। সেই ফুলটি তুলে নিয়ে জয় চলল আবার জয়ন্তীর খোঁজে।

বাগানের পাশেই সেই পরীর বাড়ী। দরজা খোলা। পরী তখন বাড়ী ছিল না। ভিতরে ঢুকে জয় দেখে বারান্দায় সারি সারি পাখী খাঁচায় বসে আছে। জয়ের কি মনে হল, খাঁচা খুলে একটা পাখীর গায়ে ছুঁইয়ে দিলে সেই ফুল। পাখীটি তখনই একটি মেয়ে হয়ে গেল। জয় তখন একে একে সব পাখীর গায়ে ছোঁয়াল সেই ফুল। দেখতে

দেখতে সাত শো পাখী সাত শো মেয়ে হয়ে গেল। সবার শেষ পাখীটি হল জয়ন্তী।

জয়ের তখন আনন্দ দেখে কে! জয়ন্তীর হাত ধরে, সেই সাত শো মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে সে বেরিয়ে এল বন থেকে। এদিকে পরী তখন তেড়ে এল, কিন্তু জয়ের হাতের ফুলটি দেখে সে কিছুই করতে পারলে না। যারা এতদিন মেয়ে হারিয়ে কাঁদছিল তারা মেয়েকে ফিরে পেলে। সাত শো বাপ-মায়ের মুখে হাসি ফুটল। সবাই জয়কে আশীর্বাদ করল, চারিপাশে জয়জয়কার পড়ে গেল।

দুষ্টজন বার বার করে অন্যায়।
শেষকালে একদিন সব সে হারায়॥

ভেক-কুমার

এক ছিল রাজা। রাজার মেয়ে সন্ধ্যাবেলা ঝর্ণার ধারে গিয়েছিল বেড়াতে। ঝর-ঝর করে জল পড়ছে। জলের উপর রোদ পড়ে লাল নীল রং ফুটছে। রাজকন্যা ঝর্ণার ধারে বসে দেখছে। রাজকন্যার হাতে ছিল একটি সোনালী বল। কোন এক সময় বলটি হাত থেকে পড়ে গেল ঝর্ণার জলে। কাঠের বল জলে ভেসে গেল। রাজকন্যা সাঁতার জানে না। জলে নেমে বলটি তুলতে পারে না। শুধু তাকিয়ে থাকে বলটির পানে, তারপর চেঁচিয়ে বলে—কে আছ গো, আমার বলটা এনে দাও।

এমন সময় একটা কোলা ব্যাঙ জলের উপর মুখ তুলল। বলল—আমি যদি তোমার বলটি এনে দিই, তুমি আমাকে কি দেবে?

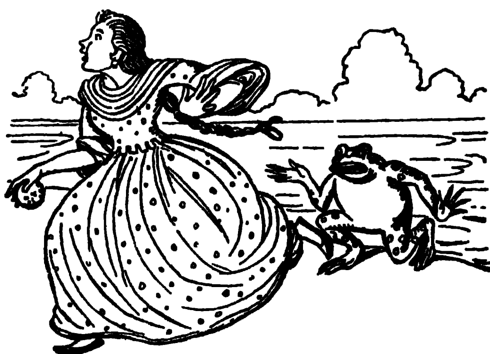
রাজকুমারীও ব্যাঙের কথা শুনে চমকে উঠল। বলল—তুমি আমাকে বলটি এনে দেবে? বেশ দাও। যা চাইবে তাই তোমাকে দোব—টাকা-পয়সা হীরে-মুক্তা।

ব্যাঙ বলল—টাকা-পয়সা হীরে-মুক্তা কিছুই আমার চাই না।

আমি চাই তোমার সঙ্গে এক সঙ্গে বসে খাব। আর তোমার বিছানায় শুয়ে ঘুমুব। রাজী আছ?

রাজকন্যা বলল—বেশ, তাই হবে, বল এনে দাও।

ব্যাঙ তখনই চলে গেল। সাঁতার কেটে একটু পরেই বলটি মুখে করে নিয়ে এল। বলল—এই নাও তোমার বল।



রাজকন্যা বলটি কুড়িয়ে নিয়ে দৌড় দিল রাজবাড়ীর দিকে। ব্যাঙ ডাকল—ও রাজকন্যা, আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও।

রাজকন্যা সে ডাক শুনল না। পিছন পানে একবার তাকালও না।

পরদিন সন্ধ্যায় রাজকন্যা খেতে বসেছে, এমন সময় শুনতে পেলে থপ্ থপ্ করে পাথরের সিঁড়ি দিয়ে কে যেন উঠে আসছে। তারপরেই দরজায় কে ধাক্কা দিল, বলল—

দরজা খোল রাজার কন্যে, দরজা খোল।
খাবার কথা বলে এলে, এখন কেন ভোল॥

রাজকন্যা দরজা খুলল। ব্যাঙকে দেখে সে চমকে উঠল। ঝনাৎ করে বন্ধ করে দিলে দরজা। রাজা বসেছিলেন সেখানে, বললেন—কি হল? কে ডাকছে?

রাজকন্যা বলল—ও একটা কোলা ব্যাঙ, কাল ঝর্ণা থেকে আমার বলটা তুলে দিয়েছিল।

রাজকন্যা বলল সব কথা।

ব্যাঙ তখন দরজায় ধাক্কা দিয়ে আবার বললে—

দরজা খোল রাজার কন্যে, দরজা খোল।
খাবার কথা বলে এলে, এখন কেন ভোল॥

রাজা বললেন—দরজা খুলে দাও। কথা দিয়েছ, কথা রাখতে হবে।

রাজকন্যা দরজা খুলে দিলে। থপ্ থপ্ করে ব্যাঙ এসে ঢুকল ঘরের মধ্যে। বলল—রাজকন্যা, আমাকে টেবিলের উপর বসিয়ে দাও, তোমার থালার পাশে।

রাজকন্যা ব্যাঙকে উঠিয়ে দিল খাবার থালার সামনে।

ব্যাঙ বসে বসে খেল। রাজকন্যার আর খাওয়া হল না। পাতের পাশে কোলা ব্যাঙ, ঘৃণায় তার সর্বাঙ্গ শির শির করতে লাগল। কিন্তু রাজার ভয়ে সে কিছুই বলতে পারল না।



খাওয়া শেষ করে ব্যাঙ বলল—রাজকন্যে, এবার আমাকে নিয়ে চল শোবার ঘরে। তোমার বিছানায় শুয়ে আমি ঘুমুব।

রাজকন্যা ব্যাঙকে নিয়ে গিয়ে খাটের উপর ছেড়ে দিল। ব্যাঙ বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকাল হতেই ব্যাঙ উঠে পড়ল। এক লাফে খাট থেকে নেমে থপ্ থপ্ করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। রাজকন্যা নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। যাক্, আপদ গেল!

কিন্তু রাজকন্যা যা ভেবেছিল তা হল না। সন্ধ্যাবেলা আবার সেই দরজায় ধাক্কা পড়ল—

দরজা খোল রাজার কন্যে, দরজা খোল।
শোবার কথা বলে এলে, এখন কেন ভোল॥

রাজকন্যা দরজা খুলতেই থপ্ থপ্ করে ব্যাঙ ঘরে এসে ঢুকল। বলল—আমাকে তুলে দাও বিছানার উপর, আমি ঘুমুব।

রাজকন্যা কি আর করে, ব্যাঙকে বিছানার উপর উঠিয়ে দিল।

ব্যাঙ বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আবার রাত ভোর হতেই এক লাফে খাট থেকে নেমে থপ্ থপ্ করে লাফাতে লাফাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সেদিনও সন্ধ্যাবেলা আবার ঠিক সেই ব্যাঙ এসে হাজির হল। সে রাতেও ব্যাঙ ঘুমুল রাজকন্যার বিছানায়।

কিন্তু পরদিন ঘুম ভাঙতেই রাজকন্যা চমকে উঠল। তার বিছানায় ত ব্যাঙ নেই, রয়েছে এক রাজপুত্র। রাজকন্যা ত অবাক। বলল—কে? তুমি কে?

রাজপুত্র বলল—আমি রাজার ছেলে। এক ডাইনী আমাকে যাদু করেছিল, বলেছিল 'যদি কোন রাজকন্যা তোমার সঙ্গে বসে খায় আর তিনদিন তার বিছানায় তোমাকে শুতে দেয়, তবেই তুমি আবার রাজপুত্র হবে।' আজ তাই আমি আবার রাজপুত্র হলাম।

রাজকন্যা রাজপুত্রকে নিয়ে গেল রাজার কাছে। রাজা সব শুনলেন। রাজপুত্রের সঙ্গে রাজা রাজকন্যার বিয়ে দিলেন। অনেক ধুমধাম হল। আট ঘোড়ার চতুর্দোলা চড়ে রাজপুত্র রাজকন্যাকে নিয়ে গেল নিজের রাজ্যে।—

বাইরেটা যত হোক্ কুৎসিত যার,
বাইরেটা দেখে কভু করো না বিচার।

কুঁড়ের বাদশা

এক ছিল রাজা। রাজার তিনটি ছেলে। সব ছেলেকেই রাজা সমান ভালবাসেন। তিনি সদাই ভাবেন—তিন ছেলে ত একসঙ্গে রাজা হতে পারবে না, এক ছেলে রাজা হবে। কিন্তু সে কে?

রাজা ছিলেন ভারী আল্‌সে। তিনি অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করলেন, যে ছেলে সবচেয়ে বেশী কুঁড়ে হবে তাকেই তিনি রাজা করে যাবেন।

রাজা একদিন ছেলেদের ডেকে বললেন—তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী কুঁড়ে কে, বল দেখি ?

বড় ছেলে বলল—মহারাজ, আমিই সবচেয়ে বড় কুঁড়ে। আমি যখন ঘুমাই তখন যদি আমার চোখে কিছু পড়ে, তাহ'লে আমি সেটা আর তুলি না। চোখে বেশী কড়কড় করলে চোখ বন্ধ না করেই আমি ঘুমাই। কে আবার অত কষ্ট করে চোখ থেকে বালি বের করে ?

মেজো ছেলে বলল—মহারাজ, আমিই সবচেয়ে বড় কুঁড়ে। একদিন আমি আগুন পোহাচ্ছিলাম, আমার পায়ের কাছে একটা জ্বলন্ত কাঠ ছিট্‌কে এসে পড়ল। আমার পা পুড়ে গেল, তবু আমি পা সরাতে পারলাম না। কে আবার অত কষ্ট করে পা সরায় ? পোড়ে ত পুড়ুক !

ছোট ছেলে বলল—মহারাজ, আমিই সবার চেয়ে বেশী কুঁড়ে। আমার গলায় একবার একটা দড়ি জড়িয়ে গিয়েছিল। ফাঁস লেগে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। পকেটে ছুরি ছিল। কিন্তু ছুরিখানা বের করে দড়িটা কাটব, সে আর আমি পেরে উঠিনি। কে আবার অত কষ্ট করে বাঁচার জন্য ? একদিন তো মরতেই হবে !

রাজা তিন ছেলের কথা শুনলেন।

খানিক বসে ভাবলেন। মনে মনে বিচার করলেন।

তারপর বললেন—দেখ বাপু, তোমাদের তিনজনের মধ্যে ছোটটিই সবার চেয়ে বেশী কুঁড়ে, সে-ই কুঁড়ের দেশে রাজা হবার যোগ্য। আমার পরে সেই হবে এই রাজ্যের রাজা।

ছোট রাজপুত্রই পরে কুঁড়ের বাদশা হল।—

কুঁড়ের দেশে কাজের লোকের নাই কোন সম্মান।
সবার সেরা কুঁড়ে সেথায় রাজার আসন পান॥

কুকুর ও চড়ুইপাখী

এক রাখালের একটি কুকুর ছিল। কিন্তু কুকুরটিকে সে খেতে দিত না। একদিন খিদের জ্বালায় কুকুরটি মনের দুঃখে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। পথে যেতে যেতে এক চড়ুইপাখীর সঙ্গে তার দেখা। চড়ুই বলল—কি বন্ধু, কোথায় যাচ্ছ? তোমায় বড় শুকনো-শুকনো দেখছি।

কুকুর বলল—দু'দিন কিছুই খেতে পাইনি, বড় খিদে পেয়েছে।

—এস, আমি খাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

বাজারে এক কশাই-এর দোকানে চড়ুইপাখী ঢুকে পড়ল। কশাই মাংস বেচতে ব্যস্ত। চড়ুই তার পাশ থেকে এক টুকরা মাংস ঠোঁটে করে টেনে আনল দোকানের কিনারায়, তারপর একেবারে গড়িয়ে ফেলে দিলে নীচে। কুকুর তখনই সেটি মুখে করে নিয়ে দৌড় দিলে।

চড়ুই বলল—এস, তোমাকে আরও মাংস খাওয়াচ্ছি।

চড়ুই বাজারের আরেক দোকানে ঢুকল। সেখানেও ওইভাবে আরেক টুকরো মাংস ফেলে দিলে দোকানের নীচে। কুকুর সেটি খেলে।

চড়ুই বলল—আর কিছু খাবে?

কুকুর বলল—এক টুকরো রুটি পেলে ভাল হয়।

—এস তাহলে আমার সঙ্গে।

চড়ুই এবার গেল বাজারে এক রুটিওয়ালার দোকানে। সেখানেও ওইভাবে এক টুকরো রুটি ফেলে দিলে নীচে, কুকুর সেটি খেলে।

চড়ুই বলল—খাওয়া ত হল, এবার চল, আমরা বেড়াই গে।

খানিকক্ষণ পথে পথে ঘুরে কুকুর বললে—আমার বড় ঘুম পাচ্ছে, একটু ঘুমিয়ে নিই।

পথের পাশে এক গাছের ছায়ায় কুকুর শুয়ে পড়ল। চড়ুই বলল—বেশ, আমিও গাছের ডালে বসে একটু ঝিমিয়ে নিই।

কুকুর ঘুমুচ্ছে, এমন সময় একখানি গাড়ী এসে পড়ল। গরুর

গাড়ী। চড়ুই চীৎকার করে উঠল—বন্ধু, গাড়ী আসছে, চাপা যাবে, ওঠো-ওঠো!

কিন্তু কুকুর ওঠবার আগেই গরুর গাড়ী তাকে চাপা দিয়ে চলে গেল। কুকুর মারা গেল। চড়ুইপাখীর চোখে জল এল, বলল—গাড়োয়ান, তুমি আমার বন্ধুকে খুন করলে। আমি এর শোধ নেব।

গাড়োয়ান বলল—যা যা, যা পারিস্ করগে যা!

চড়ুই আর কিছু বলল না, গাড়ীর পিছনে গিয়ে বসল। গাড়ীতে যাচ্ছিল গুড়ের নাগড়ি। কলসীর মুখগুলি সব একটা দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল। চড়ুই বসে বসে ঠুকরে ঠুকরে সেই দড়িটা কাটল। হঠাৎ বাঁধন খুলে যেতেই যত কলসী সব হুড়মুড় করে রাস্তায় পড়ে গেল। কতকগুলো ভাঙল। কত গুড় নষ্ট হল। গাড়োয়ান হায় হায় করে উঠল। বলল—ইস্, অনেক টাকা লোকসান হয়ে গেল!

চড়ুই বলল—লোকসান এখন কি হয়েছে, এইত সুরু।

গাড়োয়ান গুড় নিয়ে ব্যস্ত, এমন সময় চড়ুইপাখী গিয়ে বসল গরুর কানে। তার চোখে ঠোকর মারতে সুরু করল। গরু ত বিরক্ত। শেষে চড়ুইয়ের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য চলতে সুরু করল। গাড়োয়ান এবার রাগে হাতের লাঠিগাছটা দিয়ে এক ঘা বসিয়ে দিলে চড়ুইকে।

চড়ুই ত ফুরুৎ করে উড়ে গেল, কিন্তু লাঠিগাছটা গিয়ে লাগল গরুর মাথায়। আচমকা লাঠির ঘা খেয়ে গরুটি পড়ল আর মরল।

গাড়োয়ান আর কি করে, শেষ অবধি ভাঙ্গা গুড়ের নাগড়িগুলি নিয়ে, একটি গরুকে নিয়েই গাড়ী হাঁকাল। বাড়ী ফিরে এসে সে নিজের লোকসানের হিসাব করতে বসল।

এদিকে চড়ুই তখন আরও অনেক চড়ুইকে ডেকে এনেছে। গাড়োয়ানের ধান ছিল গোলায়। সেই গোলার ছাদে গর্ত করে সব চড়ুই সেখানে ধান খেতে সুরু করে দিয়েছে। গাড়োয়ানের স্ত্রী কত তাড়া দিল, কিন্তু চড়ুইয়ের দল কিছুতেই যায় না। বৌ ছুটে এল গাড়োয়ানের কাছে, বলল—এর এখনই একটা ব্যবস্থা কর!

গাড়োয়ান তাড়াতাড়ি গেল, কোন রকমে চড়ুই তাড়িয়ে গোলার ছাদটা সে আবার মেরামত করে দিলে। ততক্ষণে গোলার অর্ধেক ধান চড়ুই খেয়ে ফেলেছে।

গাড়োয়ান দাওয়ায় এসে বসল। তার মন-মেজাজ তখন খারাপ। অনেক টাকার গুড় লোকসান হল, গোলার অর্ধেক ধান চড়ুইয়ে খেলে। কি কুক্ষণেই সে আজ ঘর থেকে বেরিয়েছিল।

চড়ুই এসে বসল তার সামনে, বলল—দেখছ ত, আমি প্রতিশোধ নিতে পারি। আমার বন্ধুকে তুমি গাড়ী চাপা দিয়েছ, তোমার আরো ক্ষতি করব।

—বটে!—হাতের কাছে লাঠি ছিল, গাড়োয়ান সেই লাঠির এক বাড়ি বসিয়ে দিল চড়ুইয়ের উপর। চড়ুই ফুরুৎ করে উড়ে এসে বসল গাড়োয়ানের মাথার উপর। কিছুতেই সেখান থেকে যায় না। যত তাড়ায় ততই উড়ে উড়ে মাথার উপর বসে। গাড়োয়ান বৌকে ডাকল, বলল—এই নাও লাঠি, যেই চড়ুই আমার মাথার উপর বসবে তখনই বসিয়ে দেবে এক ঘা।

চড়ুই মাথায় এসে বসল। বৌ মারল লাঠির বাড়ি। ফুরুৎ করে চড়ুই উড়ে গেল। লাঠির ঘায়ে গাড়োয়ানের মাথা ফাটল। গাড়োয়ান পড়ল আর মরল।

চড়ুই এবার উড়ে গেল নিজের বাসায়।—

অন্যায় করবে না, সইবে না অন্যায়।
হঠকারী কর্মদোষে বহু কষ্ট পায়॥

পাষাণপুরী

এক ছিল রাজা। রাজার ছিল তিন ছেলে। বড় দুই ছেলে একদিন বেরিয়ে পড়ল দেশ ভ্রমণে। সারা দেশ তারা ঘুরে বেড়াবে। অনেক টাকা-পয়সা নিয়ে দু'ভাই বেরুল।

দিন গেল, মাস গেল, বছর গেল, দু'ভাই আব ফিরল না।

শেষে ছোট ভাই একদিন বেরুল বড় দু'ভাইয়েব খবর আনবার জন্য। নানাদেশ ঘুরতে ঘুরতে শেষে ছোট ভাই একদিন বড় দু'-ভাইয়ের সন্ধান পেল। তাদের টাকা-পয়সা তখন সব খরচ হয়ে গেছে। ছোট ভাই বলল—চল দেশে ফিরে যাই।

বড় দু'ভাই বলল—তা কি হয়, পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়েছি, সব না দেখে ফিরব কি করে?

তিন ভাই তখন একসঙ্গে বেরুল বাকি পৃথিবীটাকে ঘুরে দেখতে।

ঘুরতে ঘুবতে একদিন তারা এক বনের ধারে এক গাছতলায় বসে জিরুচ্ছে, এমন সময় একটা পিঁপড়ে কামড়ে দিল বড ভাইয়ের পায়ে। বড ভাই দেখল পাশেই এক পিঁপড়ের ঢিবি বয়েছে। বলল—অনেক কামড়েছে, ওদের ঢিবিটা ভেঙ্গে দিই, সব মরুক।



ছোট ভাই বড় ভাইকে কিছুতেই পিঁপড়ের ঢিবি ভাঙতে দিলে না।

তিন ভাই আবার চলেছে। চলতে চলতে পথে এক দীঘির ধারে তারা এসে পড়ল। প্রকাণ্ড দীঘি। এই দীঘিতে ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁস সাঁতার দিয়ে বেড়াচ্ছে।

মেজো ভাই বলল—হাঁসের মাংস অনেক দিন খাইনি। একজোড়া হাঁস মেরে খাই।

ছোট ভাই বলল—না না, ওরা কেমন সাঁতার দিচ্ছে, ওদের মেরো না।

ছোট ভাই কিন্তু কিছুতেই বড় দু'ভাইকে হাঁস মারতে দিলে না।

তিন ভাই আবার চলেছে। চলতে চলতে এসে পড়ল এক

বনের ধারে। দেখল প্রকাণ্ড এক গাছের ডালে মস্ত বড় এক মৌমাছির চাক। বড় দু'ভাই বলল—অনেক দিন মধু খাইনি। গাছের নীচে খড়-কুটো জড়ো করে আগুন জ্বেলে দিই, মৌমাছি সব পালাবে, তখন চাক ভেঙ্গে মধু খাব।

ছোট ভাই বলল—না না, চাক ভেঙ্গো না, ওতে কত মৌমাছির বাচ্চা আছে, মিছামিছি তাদের মারবে কেন? বাজার থেকে মধু কিনে খাও।

ছোট ভাই কিছুতেই মৌচাক ভাঙতে দিলে না।

তিন ভাই আবার চলতে স্বরু করল।

এবার তিনজনে এসে পৌঁছাল এক রাজবাড়ীতে। প্রকাণ্ড দুধ-পাথরের বাড়ী। কিন্তু কেউ কোথাও নেই। ঘোড়াশালে ঘোড়া রয়েছে কিন্তু সে পাথরের ঘোড়া। হাতীশালে হাতী রয়েছে কিন্তু সে পাথরের হাতী। সেপাই-সান্ত্রী লোকজন সব পাষাণ। এ যেন এক খেলাঘরের বাড়ী হঠাৎ বড় হয়ে গেছে। বেশ লাগে দেখতে।

তিন ভাই ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ায়। ঘুরতে ঘুরতে একটি ঘরে গিয়ে দেখে, এক বুড়ো বসে আছে। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া পাকা চুল, মুখে লম্বা পাকা দাড়ী। বড় ভাই ডাকল—ও বুড়ো কর্তা, তুমি একা এখানে থাক?

বুড়ো কোন সাড়া দিলে না।

মেজো ভাই ডাকল—বলি ও বুড়ো কর্তা, শুনছ?

বুড়ো কোন সাড়া দিল না।

ছোট ভাই ডাকল—বলি ও কর্তামশায়, শুনছেন?

বুড়ো এবার উঠে এল। মুখে কোন্ কথা বলল না। বড় ভাইয়ের হাত ধরে বরাবর নিয়ে এল খাবার ঘরে। খাবার টেবিলের উপর নানা খাবার সাজান ছিল। বুড়ো তিন ভাইকে সামনে বসিয়ে দিলে। খিদে পেয়েছিল খুব। তিনজন যা পারলে খেলে।

খাওয়া শেষ হলে বুড়ো তিনজনকে নিয়ে এল শোবার ঘরে।

তিনখানি খাটের উপর দুধের মত তিনটি বিছানা পাতা ছিল। তিন ভাই সেখানে শুয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে বুড়ো এসে তিন ভাইকে ডেকে তুলল। বড় ভাইয়ের হাত ধরে নিয়ে গেল একটি টেবিলের সামনে। পাথরের টেবিল। টেবিলের গায়েই খোদাই করা আছে :



এক ডাইনী যাদু করে এখানকার সব কিছু পাষাণ করে দিয়েছে। এই যাদু কাটিয়ে এদের আবার মানুষ করে তুলতে হলে সবার আগে একটি কাজ করতে হবে। বনের ধারে গাছ-তলায় রাজকন্যার মুক্তার মালা ছিঁড়ে মুক্তাগুলি হারিয়ে গেছে। সেই এক হাজার মুক্তা একদিনে খুঁজে বের করতে হবে। সূর্যাস্তের আগে হাজার মুক্তা খুঁজে না পেলে সূর্য অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গে সে পাষাণ হয়ে যাবে।

বড় ভাই তখনই বেরুল মুক্তা খুঁজতে।

বনের ধারে গিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে ঘাসের মাঝে মুক্তা খুঁজল। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত খুঁজেও একশো মুক্তা সে বের করতে পারল না। সূর্য অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গে বড় ভাই পাষাণ হয়ে গেল।

পরদিন মেজো ভাই বেরুল মুক্তা খুঁজতে। সারাদিন কাজ করেও সে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাত্র দু'শো মুক্তা খুঁজে বের করল। সূর্য অস্ত গেলে সে-ও পাষাণ হয়ে গেল।

এবার ছোট ভাই বেরুল। কিছুক্ষণ মুক্তা খুঁজেই সে বুঝতে পারল যে সন্ধ্যার আগে এক হাজার মুক্তা খুঁজে বের করতে সে পারবে না। দু'ভাই ত পাষাণ হয়ে গেছে, সে-ও পাষাণ হয়ে যাবে। মনের দুঃখে ছোট ভাই এক গাছের নীচে বসে কাঁদতে লাগল।

সেই গাছের পাশেই ছিল পিঁপড়ের ঢিবি। ছোট ভাইয়ের কান্না শুনে পিঁপড়েরা বেরিয়ে এল। তাকে দেখেই তারা চিনতে পারল। বলল—কাঁদছ কেন? বল কি করতে হবে? তুমি আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছ, তোমার জন্য আমরা সবকিছু করব।

ছোট ভাই বলল এক হাজার মুক্তা খোঁজার কথা।

পিঁপড়ের দল তখনই ঘাসের ভিতর থেকে মুক্তা খুঁজতে লেগে গেল। সন্ধ্যার আগে এক হাজার মুক্তা তারা খুঁজে এনে দিলে।

ছোট রাজপুত্র মুক্তা এনে দিল বুড়োকে।

দ্বিতীয় দিন সকালবেলা বুড়ো ছোট ভাইকে নিয়ে গেল আর এক টেবিলের সামনে। টেবিলের শ্বেত-পাথরের উপর খোদাই করা আছে:

তিন রাজকন্যা পাষাণ হয়ে গেছে। তারা ঘরের মধ্যে আছে। তাদের শোবার ঘরের চাবি পড়ে গেছে পুকুরের মধ্যে। সেই চাবি তুলে সন্ধ্যার আগে তাদের শোবার ঘর খুলতে হবে।

ছোট রাজপুত্র বেরিয়ে পড়ল। দীঘির পাড়ে এসে সে ভাবনায় পড়ল। কি করে এই গভীর জলের তল থেকে সে চাবি বের করবে?

হাঁসের দল দীঘিতে সাঁতার কাটছিল। এক জোড়া হাঁস এগিয়ে এল রাজপুত্রের কাছে। বলল—কি ভাবছ এত? বল কি কাজ করতে হবে? তুমি আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছিলে, তোমার জন্য আমরা সবকিছু করতে পারি।



রাজপুত্র বলল জলের নীচে চাবির কথা। হাঁস দুটি তখনই জলের মাঝে ডুব দিল। খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করেই তারা চাবি তুলে আনল।

সেই চাবি দিয়ে সন্ধ্যার আগেই রাজপুত্র রাজকন্যাদের শোবার

ঘর খুলে দিলে। তিন রাজকন্যা পাষাণ হয়ে বিছানায় শুয়েছিল। রাজপুত্র তাদের গায়ে হাত দিতেই তারা আবার মানুষ হয়ে গেল।

বোবা বুড়োর এবার মুখ ফুটল। বলল—আর একটি কাজ বাকি আছে, তুমি যদি সেটি করতে পার তাহলে এই পাষাণপুরী আবার জীবন্তপুরী হবে। তিন রাজকন্যার মধ্যে কে ছোট তোমাকে বলে দিতে হবে। বড় রাজকন্যা খায় চিনি, মেজো রাজকন্যা খায় সরবৎ, আর ছোট রাজকন্যা খায় মধু। মুখ দেখে তোমাকে বলে দিতে হবে মধু-খাওয়া রাজকন্যা কোনটি।

তিন রাজকন্যা সামনে এসে দাঁড়াল। রাজপুত্র তিনজনের মুখের দিকে তাকাল। চোখ মুখ একরকম, কেউ মাথায় ছোট নয়, বড় নয়। কে ছোট, কে বড় বুঝবে কেমন করে? রাজপুত্র মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসল।

এমন সময় মৌমাছিদের রাণী এসে ঘরে ঢুকল। রাজপুত্রকে দেখেই সে চিনল। গুন্ গুন্ করে বলল—রাজপুত্র, এত ভাবছ কেন? তুমি আমাদের চাক রক্ষা করেছ, আমাদের বাচ্চাদের বাঁচিয়েছ, আমরা তোমার এটুকু উপকার করতে পারব না?



মৌমাছি গিয়ে বসল বড় রাজকন্যার ঠোঁটের উপর, সে ঠোঁটে চিনির গন্ধ। মৌমাছি গিয়ে বসল মেজো রাজকন্যার ঠোঁটের উপর, সে ঠোঁটে সরবতের গন্ধ। মৌমাছি গুন্ গুন্ করে রাজপুত্রের কানে কানে বলল —আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, তুমি দেখিয়ে দাও।

মৌমাছি গিয়ে বসল ছোট রাজকন্যার ঠোঁটের উপর। রাজপুত্র দেখিয়ে দিল—এই ছোট রাজকন্যা।

ডাইনীর যাত্ন এবার ভেঙে গেল। পাষাণপুরীর যে যেখানে পাষাণ হয়ে ছিল সবাই জীবন্ত হয়ে উঠল। পাষাণপুরীতে মানুষের সাড়া জাগল। রাজা জাগল, মন্ত্রী জাগল, সেপাই-সান্ত্রী জাগল, দাসদাসী জাগল। আর তারই সঙ্গে জাগল রাজপুত্রের বড় তুই ভাই।

খুব ধুমধাম করে ছোট রাজকন্যার সঙ্গে ছোট রাজপুত্রের বিয়ে হয়ে গেল। ছোট রাজপুত্রকে রাজা দিলেন অর্ধেক রাজত্ব।

আর বড় তুই ভাই বড় তুই বোনকে বিয়ে করে নিয়ে গেল নিজের দেশে।—

লোকের ভাল কর যদি তোমার ভাল হবে,
সবাই ভাল বাসবে তবে ভাল বলবে সবে।

রাজকন্যার বিয়ে

এক ছিল রাজা। তার ছিল পরমাসুন্দরী এক কন্যা। রাজকন্যার বিয়ের বয়স হয়েছে। রাজা স্বয়ম্বর সভা ডাকলেন। দেশ-বিদেশের রাজপুত্রদের নিমন্ত্রণ করলেন সেই সভায়। রাজকন্যা বর পছন্দ করবে।

রাজসভায় যত রাজপুত্র এসে বসল। রাজকন্যা এল তাদের দেখে পছন্দ করতে। কিন্তু রাজকন্যার মনে ছিল ভারী অহংকার। কাউকেই তার পছন্দ হল না। রাজকন্যা এক একজন রাজপুত্রকে দেখে আর বলে—কি মোটা, যেন পিঁপে!

—কি লম্বা, যেন একটা তালগাছ!

—কি বেঁটে, যেন একটা বামন!

—এর মুখখানা কি ফ্যাকাসে, যেন মোমের পুতুল!

—এর মুখখানা কি লাল, ঠিক বাঁদরের মত!

—দেখ, উনি কেমন বেঁকে বসেছেন, যেন একটি উট!

—দেখ, ওর মুখে কেমন দাড়ি, যেন একটি রামছাগল!

রাজকন্যা সবাইকে বিদ্রূপ করল। মনের দুঃখে রাজপুত্রেরা যে যার দেশে চলে গেল। রাজার ভারী রাগ হল। তিনি বললেন—যখন এত রাজা-মহারাজার ছেলেকে রাজকন্যার পছন্দ হল না, তখন ওর সঙ্গে আমি এক ভিখারীর বিয়ে দোব। যে রাজবাড়ীতে ভিক্ষা করতে আসবে তারই সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দোব।

দু'দিন পরে রাজবাড়ীতে এক বাউল এল ভিক্ষা করতে। একতারা বাজিয়ে গান গেয়ে বাউল ভিক্ষা চাইল। রাজামশাই বললেন—ভিখারীকে ভিতরে নিয়ে এস।

ভিখারী এল রাজসভায়। ময়লা কাপড় পরণে। এক মুখ দাড়ী গোঁফ। রাজা বললেন—তোমার সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হবে।



ভিখারী বলল—সে কি মহারাজ, আমি যে ভিখারী।

রাজা বললেন—আমি ভিখারীর সঙ্গেই, রাজকন্যার বিয়ে দোব।

রাজকন্যা ত কেঁদে ফেলল। রাজা কোন কথা শুনলেন না। সেই ভিখারীর সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেল। রাজা বললেন—রাজকন্যা কোন রাজপুত্রকে বিয়ে করেনি। বিয়ের পর আর তার রাজবাড়ীতে থাকা চলবে না। ভিখারীর সঙ্গে তাকে চলে যেতে হবে রাজবাড়ী ছেড়ে। যেখানে ভিখারী থাকে সেখানে রাজকন্যা থাকবে।

রাজার হুকুম। ভিখারীর হাত ধরে রাজকন্যা পথে বেরিয়ে পড়ল।

ভিখারী ভিক্ষা করে আর পথ চলে। রাজকন্যাও ভিখারীর সঙ্গে চলে। পথ চলার অভ্যাস নেই, চলতে চলতে পায়ে ব্যথা ধরে। এক বাগানের ধারে এসে রাজকন্যা বসে পড়ল, জিজ্ঞাসা করল—এ কার বাগান ?

ভিখারী বললে—সেই যে রাজপুত্র, যাকে তুমি ছাগলদাড়ি বলেছিলে, এটি তার বাগান।

রাজকন্যা বলল—হায় হায়, যদি তার সঙ্গে আমার বিয়ে হত তাহলে আজ আমাকে এভাবে পথ চলতে হত না।

চলতে চলতে দু'জন এসে পড়ল প্রকাণ্ড এক ধান-ক্ষেতে। যতদূর চোখ যায় শুধু ধানের শিষ বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে। রাজকন্যা বলল—এ'কার ক্ষেত?



ভিখারী বলল—সেই যে রাজপুত্র, যাকে তুমি ছাগলদাড়ি বলেছিলে, এটি তার ক্ষেত।

রাজকন্যা বলল—হায় হায়, যদি তার সঙ্গে আমার বিয়ে হত তাহলে আজ আমাকে এভাবে পথ চলতে হত না।

চলতে চলতে দু'জনে এসে পড়ল এক প্রকাণ্ড সহরে। বাড়ীর পর বাড়ী দোকান-পসারী, গাড়ী-ঘোড়া, মানুষের ভীড়। রাজকন্যা বলল—এ সহর কার?

ভিখারী বলল—সেই যে রাজপুত্র, যাকে তুমি ছাগলদাড়ি বলেছিলে, এই সহর তার।

রাজকন্যা বলল—হায় হায়, যদি তার সঙ্গে আমার বিয়ে হত তাহলে আজ আমাকে এভাবে পথ চলতে হত না।

ভিখারী বলল—বারবার তুমি এমন কথা বলছ কেন? আমাকে যদি তোমার পছন্দ না হয়ে থাকে, যেদিকে মন চায় তুমি চলে যেতে পার।

রাজকন্যা চুপ করে যায়।

ভিখারী তাকে নিয়ে এল সহরের এক কুঁড়েঘরে। বলল—এই আমাদের বাড়ী।

রাজকন্যা বলল—এইখানে থাকতে হবে?

ভিখারী বলল—হ্যাঁ, এইখানে থাকতে হবে।

রাজকন্যা বলল—ঝি-চাকর নাই ত?

ভিখারী বলল—চাকর বলতে আমি, আর ঝি বলতে তুমি।

রাজকন্যা ত কেঁদে ফেলল। কিন্তু তখন কেঁদে কোন লাভ নেই। ভিখারী বলল—কাঁদবে পরে, এখন রান্না কর। কিছু খেতে হবে ত?

রাজকন্যা রাঁধতে জানে না, তা রাঁধবে কি? ভিখারী কাঠ কাটে, উনুনে আগুন দেয়। রাজকন্যা রাঁধতে গিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলে। ভাত হয় আধ-সিদ্ধ, তরকারী হয় পোড়া। কোন মতে দুটি খেয়ে ভিখারী বলল—বসে বসে ত আর দিন চলবে না, খাব কি? পয়সা রোজগার করতে হবে। আমি বন থেকে বেত কেটে আনি, তুমি ঝুড়ি বুনবে।

রাজকন্যা বলল—ঝুড়ি বুনতে ত জানি না।

ভিখারী বলল—শিখিয়ে দোব।

ভিখারী চলে গেল। বন থেকে বেত কেটে নিয়ে এল। রাজকন্যা শিখল ঝুড়ি বুনতে। কিন্তু বেতের আঁশ বিঁধে রাজকন্যার আঙুল ফুলে উঠল। ভিখারী বলল—তুমি ঝুড়ি বুনতে পারবে না। তুমি সুতো কাটতে শেখ।

ভিখারী তূলো নিয়ে এল, চরখা নিয়ে এল। রাজকন্যাকে শেখাল সুতো কাটতে। কিন্তু রাজকন্যার নরম আঙুল সুতোয় কেটে গিয়ে ফুলে উঠল। ভিখারী বলল—তুমি সুতো কাটতেও পারবে না। তোমার অন্য কাজ চাই। আমি মাটির হাঁড়ি-কলসী গড়ব, হাটে একটা দোকান করব, বসে তোমাকে বেচতে হবে।

রাজকন্যা বলল—হাটে বসব আমি হাঁড়ি বেচতে? যারা আমাকে রাজকন্যা বলে চিনবে তারা কি ভাববে?

ভিখারী বলল—তুমি ত এখন আর রাজকন্যা নও, তুমি এখন ত ভিখারীর বউ। রোজগার না করলে খাবে কি?

রাজকন্যাকে হাটের দোকানে গিয়ে বসতে হল। ভিখারী বালি-মাটির হাঁড়ী গড়ে, কুঁজো গড়ে, কলসী গড়ে। হাটের দোকানে বসে রাজকন্যা বিক্রী করে। দিন কাটে।



একদিন এক সৈনিক ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিল। সৈনিক মাতাল, ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে রাজকন্যার হাঁড়ীর দোকানের উপর দিয়ে। সব ভেঙে গেল। রাজকন্যা কাঁদতে লাগল। সৈনিক চোখ রাঙিয়ে চলে গেল। রাজকন্যা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরে এল। ভিখারী বলল—তুমি একটা দোকান চালাতেও পার না? যাক্ গে, চল, রাজবাড়ীতে দাসীর যদি কোন কাজ পাওয়া যায় তোমাকে ভর্তি করে দিয়ে আসি গে। সুখে থাকতে পাবে, খেতে-পরতে পাবে।

ভিখারী রাজকন্যাকে রাজবাড়ীর দাসী করে দিল। রান্নাঘরের দাসী, রাঁধুনীকে জোগান দিতে হয়, খাবার গোছাতে হয়। রান্নাঘরে যখন যা দরকার হয় সবকিছুই করতে হয়।



সারাদিন কাজ করার পর সন্ধ্যার সময় রাজকন্যার ছুটি হয়। নিজের খাবার আর ভিখারীর খাবার নিয়ে রাজকন্যা ফিরে আসে তার কুঁড়েঘরে।

এইভাবেই দিন কাটে। রাজকন্যা একদিন খাবার নিয়ে ফিরছে এমন সময় রাজপুত্র এসে তার হাত ধরল—তোমাকে ত আমি চিনি, আজ তোমাকে রাজসভায় নাচতে হবে।

রাজকন্যা মুখ তুলে দেখে, সে রাজপুত্র আর কেউ নয়, সে-ই যাকে সে বলেছিল ছাগলদাড়ি, তিনিই। লজ্জায় দুঃখে রাজকন্যা তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়ে নিলে। হাতের খাবার হাত থেকে পড়ে গেল। রাজকন্যা কেঁদে ফেলল।

রাজপুত্র তখন বলল—ভয় নেই, কেঁদো না। আমিই বাউল সেজে তোমাকে বিয়ে করে এনেছি। আমিই সৈনিক সেজে তোমার হাঁড়ীর দোকান ভেঙেছি। তুমি আমাকে ছাগলদাড়ী বলেছিলে, তোমার ভারী অহংকার ছিল, তোমার সেই অহংকার চূর্ণ করার জন্য আমি এই সব করেছি। তোমার দর্প চূর্ণ হয়েছে। তোমার অনেক শিক্ষা হয়েছে। এবার থেকে তুমি রাজবাড়ীতেই থাকবে। আর তোমাকে কুঁড়েঘরে ফিরে যেতে হবে না।

রাজকন্যা কান্না ভুলে গেল, রাজকন্যার মুখে এবার হাসি দেখা দিল।

এবার রাজবাড়ীতে মহা ধূম পড়ে গেল। রাজপুত্রের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হবে। ঢাক ঢোল সানাই বাজল। দেশ সুদ্ধ নিমন্ত্রণ হল। রাজকন্যা রাজবাড়ীর বউ হল।—

মনের মাঝে রাখতে নেই দর্প অহংকার
অবশেষে অপমানে মানতে হবে হার।

চাষী-বউ

এক ছিল চাষী আর তার বউ।

একদিন চাষী ক্ষেতে চাষ করতে যাবার সময় বলে গেল—বৌ, রান্না করে রাখিস, আমি এসেই খাব।

চাষী-বউ পুকুরে গিয়ে মাছ ধরল। তারপর সেই মাছের ঝোল রাঁধল। ঝোল নামিয়ে রেখে চাষী-বউ গেল চাল ধুতে। পুকুর থেকে চাল ধুয়ে এসে দেখে একটা কুকুর ঘরে ঢুকে মাছের ঝোল

খাচ্ছে। তাড়া দিতেই মাছ মুখে নিয়ে কুকুরটা পালাল। চালের চালুনীটা নামিয়ে রেখে চাষী-বউ ছুটল কুকুরের পিছনে। কিন্তু কুকুরের সঙ্গে ছুটে চাষী-বউ পারবে কেন? কুকুর কোথায় পালিয়ে গেল। চাষী-বউ ফিরে এল ঘরে।

ঘরে তখন আরেক কাণ্ড। কোথা থেকে এক ঝাঁক কাক এসে সব চাল খেয়ে শেষ করেছে। চাষী-বউ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

খানিক পরেই চাষী বাড়ী ফিরল, বলল—কি রেঁধেছিস্ খেতে দে।

বউ বলল—ঝোল রেঁধেছিলাম কুকুরে নিয়ে গেছে, চাল ধুয়েছিলাম কাকে খেয়েছে, আবার ভাত করছি।

চাষী বলল—শুধু ভাত খাব কি দিয়ে?

বউ বলল—তা আমি কি করব, এখানে এত কুকুর আছে এত কাক আছে, তা ত তুমি আমাকে কখনও বলনি।

—কুকুর আর কাক সব জায়গাতেই আছে। যাক্, নুন ভাত দাও তাই খাই।

চাষী নুন ভাত খেলে। খেতে খেতে ভাবল—আমার বউয়ের যা বুদ্ধি দেখছি, তাতে তার উপর কোন কাজে ত আর ভরসা করা যায় না। নিজেকেই সাবধান হতে হবে।

চাষী কিছু টাকা জমিয়েছিল। সেই টাকাগুলো সে বের করল। একটা কৌটার মধ্যে ভরে বলল—এর মধ্যে কতকগুলো সাদা চাকৃতি রইল। এগুলো আমাদের কোন দরকার নেই, এগুলো আমগাছটার নীচে পুঁতে রাখছি। তোমার হাতের কাছে থাকলে তুমি কখন ফেলে দেবে।

চাষী টাকাগুলি বাড়ীর পিছনে আমগাছের নীচে পুঁতে রাখল।

দুপুর বেলা চাষী চলে গেল হাটে। ঠিক সেই সময় ক'জন ফেরিওয়ালা এল মাটির হাঁড়ি-কুঁড়ি কুঁজো-কলসী বেচতে। চাষী-বউকে বলল—কিনবে গো?

চাষী-বউ বলল—কিনলে ত হয়, কিন্তু আমার কাছে ত পয়সা নেই, সাদা চাকৃতি তোমাদের কোন দরকারে আসবে? নেবে?

—সাদা চাক্‌তি ? কি দেখি ?

—ওই যে আমগাছের তলায় পোঁতা আছে।

ফেরিওয়ালা দু'জন তখনই আমগাছের নীচেটা খুঁড়ে ফেললে। কৌটা খুলেই দেখলে সব টাকা। টাকাগুলি সব নিয়ে হাঁড়ি কলসী কুঁজো সব দিয়ে তারা চলে গেল।

চাষী-বউ ত মহাখুসি। সমস্ত হাঁড়ি কলসী কুঁজো সে সাজিয়ে রাখল ঘরের মধ্যে।

বিকালবেলা চাষী ফিরল হাট থেকে। বলল—একি, এত হাঁড়ি কলসী ?

বউ বলল—এ সব আমি কিনেছি, তোমার ওই সাদা চাক্‌তিগুলো নিয়ে তারা এগুলো দিয়ে গেছে।

—করেছ কি ? সে সাদা চাক্‌তিগুলো সব যে রূপোর টাকা।

—তা আমি কি করে জানব, তুমি ত সে কথা বলনি। আমি সেগুলো চোখেও দেখিনি।

—এখনি গিয়ে সেই ফেরিওয়ালাদের ধরতে হবে।

—তুমি তাদের চিনবে কি করে ? আমাকে তাহলে তোমার সঙ্গে যেতে হবে।

বেশ, তাই চল। কিছু মুড়ি আর কিছু বাতাসা নিও, পথে যেতে যেতে হয়ত খেতে হবে।

চাষী-বউ এক ধামা মুড়ি আর এক ধামা বাতাসা নিয়ে চলল।

চাষী হাঁটে হনহন করে, চাষী-বউ অত তাড়াতাড়ি চলতে পারে না। সে পিছিয়ে পড়ে। কোন এক সময় এক পুকুরপাড়ে এসে চাষী-বউ আর হাঁটতে পারে না. মুড়ি বাতাসার ধামা দুটি নামিয়ে রেখে এক গাছতলায় বসে পড়ল। পুকুরের পাড়টা ছিল ঢালু, মুড়ির ধামাটা ঠিক বসেনি, হঠাৎ কেমন করে যেন ধামাটা গড়িয়ে গেল নীচের দিকে, একেবারে পুকুরের জলের মধ্যে। চাষী-বউ বলল—গরমের দিনে মুড়ির ভেজবার ইচ্ছা হয়েছে তাই জলে গিয়ে নামল, বাতাসাও তাহলে ওর কাছেই থাক।

মুড়ি আর বাতাসা দুই-ই চাষী-বউ জলে ভিজিয়ে দিলে।

ওদিকে চাষা পুকুরের ওপারে বসেছিল, বউকে ডেকে বলল—দাও, মুড়ি বাতাসা খাই।

চাষী-বউ ভিজে মুড়ি আর জলে ভেজা বাতাসার ধামা দুটি এগিয়ে দিলে। চাষী বলল—এ কি? মুড়ি জলে ভেজালে কেন?

—মুড়ির গরম লেগেছে, তাই ধামাশুদ্ধ নিজেই গড়িয়ে গেল জলের মধ্যে, জলে নিজেই ভিজল। বাতাসাগুলোরই বা কষ্ট হয় কেন, সেগুলোকেও আমি তাই ভিজিয়ে নিলাম।

—মুড়ি বাতাসার আবার গরম লাগে নাকি? তুমি একেবারে গাধা!

—আমাদের রোদ লেগে গা গরম হয়, ওদেরও ত গরম হয়, তাহলে গরম লাগে না একথা বললেই আমি শুনব,—আমি কি এতই বোকা নাকি?

—বেশ, তুমি খুব চালাক, তা এখন একবার বাড়ী যাও, আবার কিছু মুড়ি বাতাসা নিয়ে এস, আবার জলে ভিজিয়ে এনো না। আর আসবার সময় দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়ে এস, বাগানের দরজাটাও দেখে এস। আমি এইমাত্র হাট থেকে এলাম। আমি ততক্ষণ একটু বসি।

চাষী-বউ চলে গেল। ঘরে গিয়ে মুড়ি নিল, বাতাসা নিল, তারপর ঘরের দরজাটা বন্ধ করল। কিন্তু বাগানের দরজা বন্ধ করতে গিয়ে তার মনে পড়ল চাষী ত দরজা বন্ধ করতে বলেনি, বলেছে 'বাগানের দরজাটা দেখে এস।' তা আমি কি দেখব? তার চেয়ে দরজাটা বরং মাথায় করে নিয়ে যাই, যা দেখবার তিনি নিজেই দেখুন।

যেমন ভাবা তেমন কাজ, বাগানের দরজাটা খুলে চাষী-বউ মাথায় তুলে নিলে।

পুকুরপাড়ে এসে চাষী-বউ বলল—দরজা দেখতে বলেছিলে, তাই দরজাটা নিয়ে এলাম, যা দেখবার তুমি নিজের চোখে দেখ।

—বেশ করেছ! তোমার বুদ্ধি দেখে খুব খুসি হয়েছি। এখন

চল—ওই দরজা মাথায় নিয়েই চল। ওই কপাটখানার উপর নাও তোমার মুড়ি-বাতাসার ধামা।

মুড়ি খেয়ে চাষী আবার রওনা হল। চাষী-বউ মাথায় কপাট নিয়ে তার উপর মুড়ি-বাতাসার ধামা নিয়ে চলল।

চলতে চলতে পথে সন্ধ্যা হয়ে এল। সামনেই এক বন। চাষী আর চাষী-বউ বনের ধারে এক বটগাছের উপর উঠে বসে রইল। মুড়ি-বাতাসার ধামা আর কপাটখানাও তারা তুলে রাখল গাছের উপর।

ঠিক সেই সময় দুজন ফেরিওয়ালা এল সেই গাছের নীচে। বলল —আজ অনেক টাকা লাভ হয়েছে, এইখানে বসে টাকাগুলো ভাগ করে নিই।

তারা টাকাগুলি ভাগ করতে বসল।

টাকা গুনতে গুনতে অন্ধকার হয়ে গেল। তারা কাঠকুটো কুড়িয়ে নিয়ে আগুন জ্বালল, সেই আলোয় আবার টাকা ভাগ করতে বসল।

এমন সময় চাষী-বউয়ের হাত পিছলে মুড়ির ধামাটা উল্টে গেল। আগুনের উপর মুড়িগুলি পড়তেই আগুনটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। ফেরিওয়ালারা অবাক হয়ে গেল, বলল—এ কি হল, আগুনে কি পড়ল?

এদিকে চাষী-বউ ফিস্ ফিস্ করে বলল—বাতাসার ধামাটা এবার হাত থেকে পড়ে যাবে।

চাষী বলল—বেশ, আমাকে দাও।

ওরা টাকা গোনে আর চাষী এক একটা বাতাসা ওদের গায়ে ছুঁড়ে মারে। নিচে বাতাসা পড়ে ভেঙে যায়। ফেরিওয়ালা দুজন উপর পানে তাকায়, অন্ধকারে কিছুই দেখতে পায় না। বলে—তাইত, এসব কি ব্যাপার? ভূত নাকি?

চাষী-বউ ফিস্ ফিস্ করে বলল—দরজাটা এবার হাত থেকে পড়ে যাবে।

চাষী বলল—সর্বনাশ, তাহলে ত ওরা এখনি আমাদের কথা টের পাবে, গাছে উঠে এসে আমাদের খুন করে ফেলবে

—কিন্তু দরজাটা আমি আর ধরে রাখতে পারছি না।

—আমাকে দাও, আমি ধরছি।

কিন্তু দেবার আগেই চাষী-বউয়ের হাত থেকে কপাটখানি পড়ে গেল—দড়াম্!

—ওরে বাবারে, খুন করলে রে! ভূত রে, বেম্মদত্যি রে—!

ফেরিওয়ালা দু'জন টাকা-পয়সা সব ফেলে রেখে সেখান থেকে প্রাণের ভয়ে দৌড় দিলে।

এবার চাষী আর চাষী-বউ গাছ থেকে নামল।

টাকাগুলি সব তারা কুড়িয়ে নিলে। কৌটা ভরা সব তাদেরই টাকা।

গুনে হিসাব করে চাষী দেখল, সব টাকাই ফেরৎ পেয়েছে।

হাসতে হাসতে দুজনে আবার ফিরে এল।—

চাষীর বউ মুখ্যু বড়, বুদ্ধি নেইক মোটে,
তারই দোষে চাষীর ঘরে যত সঙ্কট জোটে।

পাঁচ বন্ধু

এক ছিল রাণী। রাণীর ছিল এক মেয়ে। মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী। সেই রূপের কথা শুনে দেশ-বিদেশ থেকে কত রাজপুত্র আসত সেই মেয়েকে বিয়ে করার জন্য। রাণী এক একজনকে এক একটি এমন কাজ দিত, যে কাজ কোন রাজপুত্রই করতে পারত না, রাণী তাকে বন্দী করে রাখত। পরে অনেক টাকা-পয়সা হীরে-জহরৎ দিলে তবে সেই রাজপুত্রকে ছেড়ে দিত। মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে যত রাজপুত্র আসে রাণীর তত লাভ হয়।

এদিকে রাজকন্যার রূপের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল দেশ-বিদেশে। এক রাজপুত্র সেই খবর শুনে রাজাকে বলল—বাবা, আমি যাব ওই দেশে, দেখি ওখানকার রাণী কি কাজ করতে দেয়?

রাজা বললেন—না, ও রাণী ডাইনী, যে যায় তাকেই বন্দী করে রাখে। অনেক হীরে-জহরৎ পেলে তবে ছাড়ে। তুমি বন্দী হলে তোমাকে ছাড়াবার জন্য অত হীরে-জহরৎ আমি কোথায় পাব?

রাজা অনুমতি দিলেন না, রাজপুত্র নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিলে। সাত বছর রাজপুত্রের আহার নিদ্রা নেই। রাজা ভাবলেন—তাইত, এভাবে থাকলে রাজপুত্র ত মারা যাবে, বললেন—বেশ, তোমার যেখানে ইচ্ছে যাও, আমি আর কিছু বলব না।

রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়ল।

কত বন-বাদাড়, পাহাড়-পর্বত পার হয়ে রাজপুত্র চলল। চলতে চলতে এক বনের ধারে দেখে একটি প্রকাণ্ড মানুষ শুয়ে আছে, মানুষ ত নয় যেন একটা হাতী। মানুষটি রাজপুত্রকে দেখে হেসে বলল—কি গো রাজকুমার, তোমার চাকর চাই নাকি? আমায় রাখবে?



রাজপুত্র বলল—তোমার মত মোটা লোককে আমি কি কাজ দোব?

মোটা বলল—আমি যত মোটাই হই না কেন, তোমার কাজ করা নিয়ে ত কথা।

রাজপুত্র বলল—বেশ, তবে চল আমার সঙ্গে।

মোটা রাজপুত্রের সঙ্গী হল।

আরো কিছুদূর গিয়ে রাজপুত্রের চোখে পড়ল ফাঁকা মাঠের মাঝে ঘাসের উপর কান পেতে একটি লোক কি যেন শুনছে। রাজপুত্র বলল—তুমি এখানে কি করছ?

লোকটি বলল—আমি সারা দুনিয়ার খবর শুনছি।

রাজপুত্র বলল—বেশ, বলত যে রাজকন্যার সন্ধানে আমি যাচ্ছি সেখানকার কি খবর?

লোকটি বলল—এই ত শুনলাম, সেখানে এক রাজপুত্রকে জেল-খানায় বন্দী করা হল।

রাজপুত্র বলল—ঠিক আছে, তুমি আমার সঙ্গে চল।

সে-ও রাজপুত্রের সঙ্গী হল।

আরো কিছুদূর গিয়ে রাজপুত্র দেখল তালগাছের মত উঁচু একটা লোক লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলছে। রাজপুত্র বলল—আশ্চর্য, এমন লম্বা মানুষ হয়!

লম্বা বলল—আমি ত এখন ছোট হয়ে আছি, ইচ্ছা করলে আমি একটা পাহাড়ের মত উঁচু হতে পারি। তুমি আমাকে একটা ভাল কাজ দাও দিকি।

রাজপুত্র বলল—বেশ, তুমি আমার সঙ্গে চল।

তিন সঙ্গী নিয়ে রাজপুত্র এগিয়ে চলল।

আরো কিছুদূর গিয়ে তারা দেখে বনের ধারে মাঠের উপর শুয়ে শুয়ে একটি লোক রোদ পোহাচ্ছে, আর থর থর করে কাঁপছে। রাজপুত্র কাছে গিয়ে বলল—তোমার কি হয়েছে? অমন কাঁপছ কেন?

লোকটি বলল—রোদ আর আগুনে আমার বড় শীত করে, কিন্তু বরফ গায়ে লাগালে আমি বেশ গরম হই। রোদে শুয়ে আছি কাঁপুনি হচ্ছে, আগুনের ধারে বসলে ত ঠাণ্ডায় জমে যাব।



রাজপুত্র বলল—আশ্চর্য ত! তা তোমার ত এখন কোন কাজ নেই, তুমি চল আমার সঙ্গে।

চারজন সঙ্গী নিয়ে রাজপুত্র এগিয়ে চলল।

আর কিছু দূরে গিয়ে তারা দেখল একটি লোক কপালে হাত দিয়ে চারিপাশে ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছে—বেশ ভাল করে দেখছে। রাজপুত্র বলল—কি দেখছ অমন করে?

লোকটি বলল—আমি সব কিছু দেখতে পাই, তাই এখন পৃথিবীর কোথায় কি ঘটছে তাই দেখছি।

রাজপুত্র বলল—বেশ, তুমি চল আমাদের সঙ্গে।

পাঁচজন সঙ্গী নিয়ে রাজপুত্র চলল।

আর কিছুদুব গিয়ে তারা এসে পৌঁছাল সেই রাণীর রাজ্যে। রাণীর সভায় গিয়ে বাজপুত্র বলল—আমি এসেছি রাজকন্যাকে বিয়ে করব বলে।

রাণী বলল—বেশ, তিনটি কাজ করতে হবে, যদি করতে পার তবেই রাজকন্যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে।

রাজপুত্র বলল—কি কাজ বলুন ?

রাণী বলল—লালসাগরের মধ্যে আমার একটি আংটি পড়ে গেছে তুমি সেটা তুলে নিয়ে এস।

রাজপুত্র রাজসভা থেকে বেরিয়ে এল। সঙ্গীদের বলল—কি করা যায় ?



যে সব কিছু দেখতে পায়, তার নাম 'প্রখরদৃষ্টি'। প্রখরদৃষ্টি বলল—আমি দেখে দিচ্ছি সাগরের কোথায় আংটিটি পড়েছে।

প্রখরদৃষ্টি সেখান থেকেই দেখতে পেলে, সাগরের নীচে এক পাহাড়ের গুহার মধ্যে আংটিটি রয়েছে।

মোটা লোকটি বলল—আমার নাম 'সর্বভুক্', আমি এখনই সাগরের জল শুষে নিচ্ছি।

সর্বভুক্ সাগরে মুখ দিয়ে সব জলটুকু শুষে নিলে।

সব চেয়ে লম্বা লোকটি বলল—আমার নাম 'দীর্ঘদেহ', আমি এখনই গিয়ে আংটিটি তুলে আনছি।

দীর্ঘদেহ তখনই দেহটিকে তালগাছের মত লম্বা করে দিলে, তারপর হাত বাড়িয়ে তুলে নিলে আংটিটি।

রাজপুত্র এবার আংটিটি নিয়ে গিয়ে দিলে রাণীর সভায়। রাণী আংটিটি হাতে নিয়ে বলল—বেশ, প্রথম কাজ তুমি ভালই করেছ, এবার দ্বিতীয় কাজ কর। আমার বাগানে একশোটি ছাগল চরছে। সেই ছাগলগুলি আজকের মধ্যে তোমাকে খেয়ে শেষ করতে হবে।

রাজপুত্র বলল—আমাকে একাই খেতে হবে, না আমরা সব ক'জনে খাব?

রাণী বলল—না, সকলে মিলে নয়, ইচ্ছা করলে তুমি আর একজন মাত্র সঙ্গী নিতে পার।

রাজপুত্র রাজসভা থেকে বেরিয়ে এল। সঙ্গীদের বলল—কি করা যায়?

সর্বভূক্ বলল—চিন্তার কিছু নেই, আমি তোমার সঙ্গী হব।

রাণী একশোটি ছাগলের মাংস রান্না করে রাজপুত্রকে খবর দিল, রাজপুত্র সর্বভূক্‌কে সঙ্গে নিয়ে গেল রাজসভায়। রাজপুত্র ত সাধারণ মানুষ, সে আর কত খাবে। কিন্তু সর্বভূক্ একে একে একশো পাঁঠাই খেয়ে শেষ করে ফেললে, তারপর বললে—আর কিছু আছে?

রাণী বলল—বেশ, দ্বিতীয় পরীক্ষাতেও তুমি সফল হলে। এবার তৃতীয় পরীক্ষা। রাজকন্যার ঘরের দরজায় সন্ধ্যা থেকে রাত বারোটা অবধি তোমাকে পাহারা দিতে হবে। রাত বারোটার সময় যদি দেখি যে রাজকন্যা ঘরে নেই, তাহলে কাঁধের উপর মাথা থাকবে না।

রাজপুত্র বলল—এ ত অতি সহজ কথা। খুব পারব।

রাজপুত্র রাজসভা থেকে বেরিয়ে এল। সঙ্গীদের বলল—ব্যাপার ত খুব সহজ বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু সহজ নয়। কি করা যায়?

সঙ্গীরা বলল—কোন চিন্তা নেই, আমরা আছি।

সন্ধ্যাবেলা রাণী খবর দিল। রাজপুত্র গেল রাজকন্যার দরজায় পাহারা দিতে। ঘরের ভিতরে রাজকন্যা, ঘরের বাইরে রাজপুত্র বসে রইল। ধীরে ধীরে রাত বাড়ল। রাজবাড়ীর সব গোলমাল থেমে

গেল। চারিপাশ চুপচাপ হয়ে গেল। শুধু একটানা ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক ভেসে আসতে লাগল। মাথার উপর চাঁদ এক আকাশ আলো ছড়িয়ে দিলে। রাত এক প্রহরের শেয়াল ডেকে গেল। রাজপুত্র ঠায় বসে আছে। আর মাঝে মাঝে দেখছে ঘরের মধ্যে রাজকন্যা ঠিক বসে আছে কি না।

এইভাবে বসে থাকতে থাকতে কোন এক সময় রাজপুত্র ঘুমে ঢুলে পড়ল। আর ঠিক সেই সময় রাজকন্যাও অদৃশ্য হল।

হঠাৎ রাজপুত্রের ঘুম ভেঙে গেল। বারোটা বাজতে তখন মাত্র কয়েক মিনিট দেরী আছে। ঘরের মধ্যে তাকিয়েই রাজপুত্র চমকে উঠল—সর্বনাশ, রাজকন্যা ত নেই!

রাজপুত্র ছুটে এসে সঙ্গীদের খবর দিলে।

প্রখরকর্ণ তখনই মাটিতে কান পেতে বলল—কোন ভয় নেই, আমি শুনতে পাচ্ছি, রাজকন্যা কোথায় যেন বসে কাঁদছে।

প্রখরদৃষ্টি তখনই চারিপাশে ভাল করে তাকিয়ে নিয়ে বলল—দেখতে পেয়েছি, তিনশো মাইল দূরে এক পাহাড়ী গুহার মধ্যে রাজকন্যা বসে আছে।

দীর্ঘদেহ বলল—বেশ, আমি এক মিনিটে তাকে নিয়ে আসছি।

তখনই দীর্ঘদেহ লম্বা লম্বা পা ফেলে রাজকন্যাকে নিয়ে এল।

এদিকে ঢং ঢং করে রাজবাড়ীর ফটকে রাত বারোটার ঘণ্টা বাজল। রাণী এল। রাজপুত্রের পাশে রাজকন্যাকে দেখে রাণী অবাক হয়ে গেল। বলল—এবার তোমাকে শেষ পরীক্ষা দিতে হবে।

রাজপুত্র বলল—কি করতে হবে বলুন?

রাণী বলল—অগ্নি পরীক্ষা দিতে হবে।

পরদিন তিনশো গাড়ী কাঠ জড়ো করা হল রাজবাড়ীর উঠানে। সেই কাঠে আগুন জ্বালিয়ে রাণী বলল—ওই আগুনের ভিতর দিয়ে অক্ষত দেহে চলে যেতে হবে।

রাজপুত্র বলল—আমাকেই যেতে হবে, না আমার কোন সঙ্গী গেলে চলবে?

রাণী বলল—তোমাদের যে কোন একজন গেলেই চলবে।

আগুনে যার ঠাণ্ডা লাগে আর বরফে যার গরম বোধ হয়, সে এবার এগিয়ে এল, বলল—দেখি আমি আগুনের মধ্যে যেতে পারি কি না।

সে বরাবর অগ্নিকুণ্ডের মাঝে গিয়ে ঢুকল। তারপর যখন আগুন পার হয়ে সে বেরুল, তখন থর থর করে কাঁপছে, বলল—উঃ কী ঠাণ্ডা, শরীর যেন জমে গেল!

রাজপুত্র বলল—আর কোন পরীক্ষা আছে?

রাণী বলল—না। আজই রাজকন্যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে।

তখনই রাণী বিয়ের জোগাড় করার জন্য হুকুম দিলে।

এদিকে কিন্তু রাজপুত্রকে রাণীর পছন্দ হয়নি। যে ছেলের এমন সব বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান সঙ্গী আছে, তাকে ত বশে রাখা যাবে না। রাণী তাই গোপনে জল্লাদকে বলে দিলে—রাজপুত্র যখন বিয়ে করতে আসবে, তখন পথের মাঝে তাকে খুন করবে।

কথাটা গোপনে বললেও প্রখরকর্ণ সবকিছু শুনতে পায়, সে সেই কথাটা ঠিক শুনতে পেল। বলল—রাজকুমার, আমরা আজ রাজবাড়ীতেই থাকব, পথে বেরুব না।



রাজপুত্র সেদিন পথে বেরুল না।

জল্লাদও রাজপুত্রকে খুন করতে পারল না।

রাজকন্যার সঙ্গে রাজপুত্রের বিয়ে হয়ে গেল।

রাজপুত্র এবার রাজকন্যাকে নিয়ে দেশে ফিরল।

পাঁচ বন্ধু রাজপুত্রের কাছে বিদায় নিল. বলল—আমরা পাঁচজনে একবার পৃথিবীটা ঘুরে আসি। যখনই দরকার হবে আমাদের ডাকবেন আমরা যেখানেই থাকি শুনতে পাব, আমরা আসব।—

রাজকুমারের পাঁচ বন্ধু নয়ক' সাধারণ।
আজব তাদের কীর্তি-কথা, মজার অঘটন॥

সিংহ-রাজকুমার

এক ছিল সদাগর। সদাগরের তিনটি মেয়ে। সদাগর যাবে দেশ-বিদেশে সদাগরি করতে। সাতখানি ডিঙায় জিনিসপত্র বোঝাই করে সদাগর বিদেশ যাত্রার জন্য তৈর হল। বড় মেয়েকে সদাগর জিজ্ঞাসা-করল—বিদেশ থেকে তোর জন্য কি আনব?

বড় মেয়ে বলল—ভাল এক ছড়া মুক্তার মালা এনো।

মেজো মেয়েকে সদাগর জিজ্ঞাসা করল—তোর জন্য কি আনব?

মেজো মেয়ে বলল—ভাল একটি হীরে বসান আংটি এনো।

ছোট মেয়েকে সদাগর বলল—তোর জন্য কি আনব?

ছোট মেয়ে বলল—আমার জন্য একটা লাল গোলাপ ফুল এনো।

সদাগর বেরিয়ে পড়ল। দেশ-বিদেশে বাণিজ্য করে দেশে ফেরার সময় বড় মেয়ের জন্য নিলে মুক্তার মালা, মেজো মেয়ের জন্য নিলে হীরে-বসান আংটি, কিন্তু ছোট মেয়ের লাল গোলাপ ফুল আর কোথাও পায় না। তখন শীতকাল, গোলাপ ত তখন সে-দেশে ফোটে না। যেখানে সদাগর খোঁজ করে সেখানেই লোক বলে—শীতকালে কি গোলাপ ফোটে নাকি?



শেষে সদাগরের ডিঙা এসে ভিড়ল এক ঘাটে। ঘাটের সামনেই প্রকাণ্ড এক বাড়ী। বাড়ীর সামনেই বাগান। বাগানে গোলাপ ফুল ফুটেছে হাজার হাজার। সদাগর সবচেয়ে ভাল বড় একটি লাল গোলাপ তুলে নিয়ে নৌকায় এসে উঠবে, এমন সময় এক সিংহ এসে তার পথ আড়াল করে দাঁড়াল, বলল—তুমি আমার বাগান থেকে ফুল তুলেছ, তোমায় আমি খেয়ে ফেলব, হালুম!

সদাগর হাত জোড় করে বলল—আমায় মাপ করুন।

সিংহ বলল—তোমায় মাপ করতে পারি শুধু একটি সর্তে। বাড়ী ঢুকে তুমি প্রথমে যাকে দেখবে তাকেই এনে দেবে আমার কাছে।

সদাগর বলল—বেশ, তাই হবে।

সিংহ বলল—কথা দিলে কিন্তু!

সদাগর বলল—কথা দিলাম।

সিংহ পথ ছেড়ে দিল, সদাগর ডিঙায় গিয়ে উঠল।

ক'দিন পরে দেশের ঘাটে ডিঙা এসে ভিড়ল। জিনিষপত্র নিয়ে সদাগর বাড়ী ঢুকছে, সবার আগে ছুটে এল তার ছোট মেয়ে, বলল —বাবা, আমার লাল গোলাপ এনেছ?

সদাগরের মুখ কালো হয়ে গেল, সিংহকে সে কথা দিয়ে এসেছে, বাড়ী ঢুকেই প্রথমে যাকে দেখবে তাকে নিয়ে আসবে সিংহের কাছে। যাক্, তখন সদাগর সে কথা আর কিছু বলল না। পরে এক সময় মেয়ের কাছে বলল সব কথা। সদাগর বলল—সিংহকে বোকা বানিয়ে এসেছি। আবার আমি যাব তার কাছে এমন বোকা আমি নই।

ছোট মেয়ে বলল—সে কি কথা! তুমি যে কথা দিয়েছ বাবা?

সদাগর বলল—কথা দিয়েছি বলে কি আমার মেয়েকে আমি সিংহের মুখে ফেলে দিয়ে আসব?

মেয়ে বলল—সে সিংহ ত সাধারণ সিংহ নয় বাবা, সে সিংহ মানুষের মত কথা বলে, তার কাছে গিয়ে আমি কান্নাকাটি করলে সে ছেড়ে দেবে কিন্তু কথার খেলাপ করলে মহাপাপ হবে।

ক'দিন ধরে অনেক আলোচনা ও পরামর্শের পর সদাগর মেয়েকে সিংহের কাছে নিয়ে যেতে রাজী হল।

আবার একদিন সদাগরের ডিঙা এসে ভিড়ল সেই ফুলবাগানের ঘাটে। সদাগরের মেয়ে দেখে সিংহ বলল—এ আমার কাছেই থাক্, পরে যা হয় করা যাবে।

সদাগর একা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল।

ছোট মেয়ে সিংহের কাছেই রয়ে গেল। আসলে সেই সিংহ ছিল

এক রাজপুত্র, এক ডাইনী তাকে যাদু করেছিল। সারাদিন সে সিংহ হয়ে থাকত আর রাত্রে হত রাজপুত্র। সন্ধ্যাবেলা সিংহ রাজপুত্র হয়ে গেল। নিজের পরিচয় দিয়ে সে বলল—আমি তোমাকে বিয়ে করব, তুমি এখানকার রাণী হবে।



সিংহ-রাজপুত্রের সঙ্গে সদাগরের ছোট মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। সে হল সেখানকার রাণী।

দিন যায়। সিংহ একদিন এসে খবর দিলে—তোমার বোনের বিয়ে, তুমি যাবে না?

ছোট মেয়ে সাজগোজ করে তৈরী হল। সিংহ বললে—বনের ধার অবধি আমি পৌঁছে দিয়ে আসব, তারপর তুমি একলা যাবে।

সিংহ বন পার করে দিয়ে এল। বাকি পথটুকু সদাগরের মেয়ে একাই গেল। বাড়ীর সবাই ত তাকে দেখে মহা খুসি, বললে—আমরা ভেবেছিলাম সিংহ তোকে খেয়ে ফেলেছে।

ক'দিন আনন্দ উৎসবের মধ্যে কাটিয়ে ছোট মেয়ে আবার ফিরে এল।

দিন যায়। কিছুদিন পরে সিংহ আবার একদিন এসে বলল—তোমার মেজো বোনের বিয়ে, তুমি যাবে না?

ছোট মেয়ে সাজগোজ করে তৈরী হল। সিংহ বললে—আমি তোমাকে বনের ধার অবধি পৌঁছে দিয়ে আসি।

ছোট মেয়ে বলল—না, এবার তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে, সবাই তোমাকে দেখতে চেয়েছে।

সিংহ বলল—কিন্তু রাত্রে কোন আলো আমার গায়ে লাগলেই আমি ঘুঘু হয়ে উড়ে যাব, ডাইনীর যাদু আছে।

ছোট মেয়ে বলল—আমি তোমাকে অন্ধকার দিয়ে নিয়ে যাব, কোন ভয় নেই।

কাজেই সিংহকে যেতে হল ছোট মেয়ের সঙ্গে।

কিন্তু বিয়ে-বাড়ীতে অন্ধকার কোথায়? ফটকের সামনে যেতেই আলোর ঝিলিক এসে পড়ল সিংহের গায়। সিংহ তখনই একটি সাদা ঘুঘুপাখী হয়ে উড়ে গেল।

ঘুঘুপাখী উড়ে যায়। সদাগরের মেয়ে তার পিছু পিছু যায়। পাখী যে পথ দিয়ে যায় সেই পথে পাখীর পালক পড়ে থাকে। যখন পাখী দেখা যায় না, তখন সেই পাখীর পালক দেখে দেখে ছোট মেয়ে পথ চলে। শেষে একদিন সে আব পালক খুঁজে পায় না। তখন সে সূর্যকে ডেকে বললে—হে সূর্যদেব, তুমি বলে দাও কোন্ দিকে যাব।

সূর্যদেব বললেন—সোজা যাও।

ছোট মেয়ে সোজা গিয়ে, অনেক দূর যাবাব পব রাত্রে আবাব পথ হাবিয়ে ফেলল। তখন সে চাঁদকে ডেকে বললে—হে চন্দ্রদেব, তুমি বলে দাও আমি কোন্ দিকে যাব।

চাঁদ বললেন—সোজা যাও।

ছোট মেয়ে সোজা গিয়ে, অনেক অনেক দূব যাবাব পব আবার পথ হারিয়ে ফেলল। রাতেব ঝড়ো হাওয়াকে ডেকে তখন ন বলল—ওগো বাতাস, আমাকে বলে দাও, কোন্ দিকে যাব।

ঝড়ো হাওয়া বললে—দখিনা হাওয়াকে জিজ্ঞাসা কর।

ছোট মেয়ে বলল—দখিনা হাওয়া, বলে দাও কোথায় গেলে আমি ঘুঘুপাখীব দেখা পাব।

দখিনা হাওয়া বললে—ঘুঘু আর এখন ঘুঘু নেই, লালসাগরে স্নান করে ঘুঘু আবাব সিংহ হয়ে গেছে। সেখানে এক বাঘেব সঙ্গে লড়াই বেধে গেছে। তুমি তাড়াতাড়ি এই পথ যাও। লালসাগরের তীরে গিয়ে দেখবে লাল লাল নলখাগড়া হয়েছে, প্রথমে বারোটি নলখাগড়া তুলে নিয়ে সেই বাঘ আর সিংহের গায়ে ছুঁড়ে মারবে, তাহলেই লড়াই থেমে যাবে,—ডাইনীর যাদু কেটে যাবে।

সদাগর-কন্যা তাড়াতাড়ি এল লালসাগরের তীরে। অনেক বন-বাদাড় পথ-প্রান্তর পার হয়ে এল নলখাগড়ার বনে। বারোটি নলখাগড়া তুলে নিয়ে সে বরাবর গেল যেখানে বাঘে-সিংহে লড়াই হচ্ছে। নল-খাগড়াগুলি সে ছুঁড়ে মারল বাঘ-সিংহের গায়। তখনই সিংহ হয়ে গেল রাজপুত্র আর বাঘ হয়ে গেল রাজকন্যা। রাজপুত্র সদাগর-কন্যাকে চিনতেও পারলে না। রাজকন্যা রাজপুত্রের হাত ধরে চলে গেল।



সদাগর-কন্যা আবার বেরুল রাজপুত্রের খোঁজে। কত বন-বাদাড়, কত নদনদী, কত তেপান্তরের মাঠ পার হয়ে সদাগর-কন্যা চলল। শেষে একদিন এসে পৌঁছাল সেই রাজকন্যার রাজবাড়ীতে। রাজকন্যা তাকে দেখেই বললে—কে তুমি? কি চাও?

সদাগর-কন্যা বললে—আমি রাজপুত্রের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

রাজকন্যা বললে—রাজপুত্র ঘুমুচ্ছে,—দেখা হবে না।

সদাগর-কন্যা পরদিন আবার গেল। রাজকন্যা বললে—কি চাও?

সদাগর-কন্যা বললে—রাজপুত্রের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

রাজকন্যা বললে—রাজপুত্র ঘুমুচ্ছে, দেখা হবে না।

সদাগর-কন্যা সেদিনও ফিরে এল। মনে বড় দুঃখ হল, রাজবাড়ীর বাইরে বসে সারারাত সে কাঁদতে লাগল। সেই কান্না শুনে রাজপুত্রের ঘুম ভেঙ্গে গেল, দাসীকে জিজ্ঞাসা করল—কাঁদে কে?

দাসী বলল—জানি না।

রাজপুত্র তখন বেরুল কে কাঁদছে দেখার জন্য। বাগানে এসে সদাগর-কন্যাকে দেখেই সে চিনল। বলল—তুমি এখানে বসে কাঁদছ? তোমার কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

তারপর সেই সদাগর-কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে রাজপুত্র চুপি চুপি সেই বাগান থেকে বেরিয়ে পড়ল। রাজকন্যা কিছু জানার আগেই তারা সে রাজ্যের সীমানা পার হয়ে গেল।



তারপর কত বন-বাদাড়, তেপান্তরের মাঠ পার হয়ে রাজপুত্র এল নিজের দেশে। ডাইনীর যাদু তখন কেটে গেছে। সিংহের বন তখন মানুষের নগর হয়ে গেছে। রাজপুত্র হল রাজা, সদাগর-কন্যা হল রাণী। দিব্যি সুখে স্বচ্ছন্দে তাদের দিন কাটতে লাগল।—

সত্য ও সততার সাফল্য চিরকাল।
সতের জীবন-পথে ভগবান ধরে হাল॥

সোনার হাঁস

এক ছিল চাষা। চাষার তিন ছেলে। একদিন চাষার বড় ছেলে গেল জঙ্গলে কাঠ কাটতে। গামছায় বেঁধে নিয়ে গেল মুড়ি আর বাতাসা। কাঠ কাটতে কাটতে দুপুর হয়ে গেল, নদীর ধারে গিয়ে সে বসল মুড়ি বাতাসা খেতে। সবে খেতে সুরু করেছে এমন সময় এক বামন এসে বলল—বাবা, বড় খিদে পেয়েছে, কিছু খেতে দিবি?

বড় ছেলে বললে—না, যা আছে তাতে আমারই পেট ভরবে না।

বামন চলে গেল। খাওয়া শেষ করে বড় ছেলে আবার কাঠ কাটতে গেল। কিন্তু কাঠ আর কাটা হলো না, কুড়ুলের প্রথম কোপই এসে পড়ল তার পায়ের উপর। রক্তারক্তি ব্যাপার। কোন রকমে পায়ে পটি বেঁধে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বড় ছেলে বন থেকে ফিরে এল।

পরের দিন মেজো ছেলে গেল বনে কাঠ কাটতে। সে-ও গামছায় বেঁধে নিয়ে গেল মুড়ি আর বাতাসা। দুপুর বেলা নদীর ধারে বসে সে যখন মুড়ি বাতাসা খাচ্ছে, তখন সেই বামন আবার এল, বলল—বাবা, আমায় কিছু খেতে দিবি?

মেজো ছেলে বললে—না, কিছুই দোব না, তোমাকে যা দোব তাই ত আমার কম পড়বে।

বামন চলে গেল। খাওয়া শেষ করে মেজো ছেলে আবার কাঠ কাটতে গেল। কিন্তু কাঠ আর কাটতে হল না, কুড়ুলের প্রথম কোপই এসে পড়ল তার পায়ের উপর। রক্তারক্তি ব্যাপার। কোন রকমে পায়ে পটি বেঁধে খোঁড়াতে খোঁড়াতে মেজো ছেলে বন থেকে ফিরে এল।

পরদিন ছোট ছেলে বলল—বাবা, আজ আমি কাঠ কাটতে যাব।

কাঠুরে বলল—না, তুই ছেলেমানুষ।

—না বাবা, আমি যাব।

—যাবি ত যা! শেষে বনের মাঝে হারিয়ে যাবি।

তবু ছোট ছেলে কুড়ুল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। গামছায় বেঁধে নিলে মুড়ি আর বাতাসা। বনের মাঝে এসে আগেই সে নদীর কিনারায় বসে মুড়ি বাতাসা খেতে স্থুরু করে দিলে। ঠিক সেই সময় বামনও এসে বলল—বাবা, আমায় কিছু খেতে দিবি? বড় খিদে পেয়েছে।

—এই মুড়ি বাতাসায় তোমার পেট ভরবে?

—খুব হবে বাবা।

—তাহলে বসে যাও আমার সঙ্গে। কথার কি আছে?

দু'জনে মিলে মুড়ি বাতাসা খেলে। খাওয়া শেষে বামন বললে—তোর মন খুব ভালো, তোর ভাল হবে। তুই নদীর ধারে ওই বুড়ো বটগাছটার গোড়া খুঁড়ে দেখ্‌—অনেক কিছু পাবি।

ছোট ছেলে তখনই গাছটার গোড়া খুঁড়ে ফেললে। দেখে একটি সোনার হাঁস,—আগাগোড়া সোনার।

হাঁসটি নিয়ে সে জমিদার-বাড়ীর সামনে দিয়ে আসছে। বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল জমিদারের তিন মেয়ে। বড় মেয়ে বললে—ও দীননাথ, ওটা কি'রে তোর হাতে?

—সোনার হাঁস।

—দেখি দেখি—বলে সে হাঁসটিকে কেড়ে নিতে এল দীননাথের হাত থেকে, কিন্তু হাঁসের গায়ে হাত দিতেই তার হাত আটকে গেল, আর ছাড়াতে পারে না।

মেজো বোন বলল—কি হল রে?

বড় বোনের গায় যেই সে হাত দিয়েছে তার হাত আটকে গেল, আর ছাড়াতে পারে না।

ছোট বোন বলল—এ কি ব্যাপার?

মেজো বোনকে সে যেই ধরেছে অমনি তার হাত আটকে গেল মেজো বোনের গায়। টেনে ছাড়াতে পারে না।

দীননাথ চলল। তিন বোনও চলল তার পিছনে। হাঁসের গায়ে আটকে আছে বড় বোনের হাত, বড় বোনের গায়ে আটকে আছে মেজো বোনের হাত, মেজো বোনের গায়ে আটকে আছে ছোট বোনের হাত।

এমন সময় জমিদারবাবু দেখতে পেলেন, ছুটে এলেন, বললেন—এ কি? নীলা, লীলা, শীলা, এভাবে কোথায় যাচ্ছিস্?

—দীনু টেনে নিয়ে যাচ্ছে বাবা!—মেয়েরা বলল।

—দেখাচ্ছি মজা,—বলে জমিদার যেই ছুটে এসে ছোট মেয়ের হাত ধরে টেনেছেন, অমনি তাঁর হাতও আটকে গেল মেয়ের গায়ে, তিনিও আর হাত ছাড়িয়ে নিতে পারেন না।

দরোয়ান বলল—এ কি বাবু?

সে এল বাবুকে ছাড়াতে, বাবুর হাত ধরে টানতে গিয়ে তার হাতও আটকে গেল বাবুর গায়ে। টেনে আর ছাড়াতে পারে না।

চাকর দৌড়ে এল, বলল,—এ কি ব্যাপার কর্তা, সবাইকে নিয়ে চললেন কোথায়?

সে দরোয়ানের হাত ধরে টানতেই তার হাত আটকে গেল দরোয়ানের গায়। টেনে ছাড়াতে পারে না।

ওদিকে দীননাথ মহা খুসি। এ ত ভাঁরী মজার ব্যাপার! সোনার হাঁস বগলে নিয়ে সে মনের আনন্দে চলল পথ দিয়ে। দীননাথের পিছনে চলল তিন বোন, জমিদার, দরোয়ান আর চাকর। পথে যে দেখে সেই অবাক হয়ে যায়। জানা-চেনা লোককে দেখলেই জমিদার চীৎকার করে ওঠে, বলে—আয় না বাবা, টেনে ছাড়িয়ে দে না?

কিন্তু যে-ই আসে টেনে ছাড়াতে তারই হাত আটকে যায়। দল ক্রমেই বাড়তে থাকে। দীননাথ হাসে, হাঁস নিয়ে মহা আনন্দে সে পথ দিয়ে চলে।

রাজবাড়ীর সামনে দিয়ে পথ। রাজকন্যার মুখে হাসি নেই। জন্ম থেকে রাজকন্যা হাসে নি। রাজা তাই ঘোষণা করেছেন, রাজকন্যাকে যে হাসাতে পারবে তিনি তাকে অর্ধেক রাজত্ব দেবেন।

আজ রাজকন্যা রাজবাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। দীননাথকে ওইভাবে পথ দিয়ে যেতে দেখে সে ত প্রথমে অবাক, সারি সারি লোক চলেছে। মানুষগুলোর পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে, একজন আর একজনের গায়ে গিয়ে পড়ছে। এ কি কম হাসিব ব্যাপার—হিহিহি—হিহিহি—হিহিহি!

রাজকন্যা যত দেখে তত হাসে। কী মজা!

রাজকন্যা হাসতেই সবার হাত ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

রাজা তখনই দীননাথকে ডেকে পাঠালেন। রাজকন্যা হেসেছে। দীননাথের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেল। রাজা অর্ধেক রাজ্য দিলেন তাকে। কাঠুরিয়ার ছেলে রাজার জামাই হল, অর্ধেক রাজ্যের রাজা হল।

বরাত যখন ফিরবে তখন বোঝে না কেউ ঘটল কি যে।
ভাল লোকের ভালই যে হয় একটু ভাবলে বুঝবে নিজে॥

এক ছিল রাজা। রাজার তিন ছেলে। রাজা বুড়ো হয়ে গেছেন, আর বেশী খাটতে পারেন না। তাই ঠিক করলেন এক ছেলেকে রাজকার্যের ভার দেবেন। কিন্তু কোন্ ছেলে রাজকার্যের যোগ্য তা ত জানতে হবে। তাই রাজা একদিন ছেলেদের ডেকে বললেন—আমি বুড়ো হয়ে গেছি, তোমাদের একজনকে এবার রাজা হতে হবে। আমি দেখতে চাই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান কে, তাকেই রাজা করব। আমি তোমাদেরকে কাজের ভার দেব। প্রথম কাজ হল একশো হাত কাপড় আনতে হবে, সে কাপড় এমন মিহি হওয়া চাই যে আমার আংটির ভিতর দিয়ে গলে যাবে। সেই কাপড় খুঁজে আন দিকি।

তিন ছেলে কাপড় আনতে বেরুল।

বড় দু'ভাই বেরুল ঘোড়ায় চড়ে, অনেক লোকজন নিয়ে বাজারে যত মিহি কাপড় পেলে সব দু'জনে কিনে আনলে।

ছোট ভাই বেরুল একা। তেপান্তরের মাঠ পার হয়ে, কত বন-বাদাড় ভেঙে একটির প'র একটি হাটে সে ঘুরল কিন্তু কোথাও মনের মত মিহি কাপড় সে পেলে না। শেষে একদিন ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যাবেলা এক ঝর্ণার ধারে বসে সে ভাবতে লাগল—কোথায় যাই? কোথায় গেলে তেমন কাপড় পাই?



ঝর্ণার ধারে একটি সোনা-ব্যাঙ বসেছিল, রাজপুত্রের মুখের পানে তাকিয়ে হঠাৎ সে মানুষের মত কথা বলে উঠল—রাজকুমার, কি ভাবছ?

রাজপুত্র ত অবাক।

ব্যাঙ আবার বললে—রাজকুমার, কি ভাবছ?

রাজপুত্র এবার জবাব দিলে—ভাবছি একশো হাত মিহি কাপড়ের কথা।

ব্যাঙ বললে—একশো হাত মিহি কাপড়? বস, আমি এনে দিচ্ছি।

ব্যাঙ ঝর্ণার জলে লাফিয়ে পড়ল। একটু পরেই জল থেকে তুলে এনে দিলে হাত খানেক লম্বা ময়লা এক টুকরো কাপড়, বলল—এইটি নিয়ে যাও, এতেই কাজ হবে।

রাজপুত্র কাপড়ের টুকরো দেখে বিশ্বাস করতে পারলে না যে তাতে কি কাজ হবে। কিন্তু ব্যাঙের কথা শুনে তার কেমন যেন মনে হল, কাপড়ের টুকরোটা পকেটে নিয়ে সে ঘোড়ায় চড়ে বসল। যত বাড়ীর কাছে আসে, তত পকেট ফুলে ওঠে। রাজবাড়ীতে এসে যখন পৌঁছাল, তার অনেক আগেই বড় দু'ভাই ফিরে এসেছে। তারা এনেছে যত রাজ্যের মিহি কাপড়। রাজা এক একখানি কাপড আংটির ভিতর দিয়ে টেনে নিতে চেষ্টা করলেন কিন্তু কোনখানিই গেল না। শেষে ছোট ভাই পকেট থেকে বের করে দিলে তার কাপড়খানি। সেখানি তখন আর ময়লা কাপড় নেই,—দুধের মত শাদা একশো হাত অতি মিহি কাপড় হয়ে গেছে। আংটির ভিতর দিয়ে কাপড়খানি দিব্যি গলে গেল।

রাজা বললেন—এবার দ্বিতীয় কাজ করতে হবে। একটি ছোট্ট কুকুর এনে দিতে হবে আমাকে, কুকুরটি এমন ছোট হওয়া চাই যে একটি বাদামের খোলার মধ্যে থাকতে পারবে।

তিন ভাই আবার বেরিয়ে পড়ল।

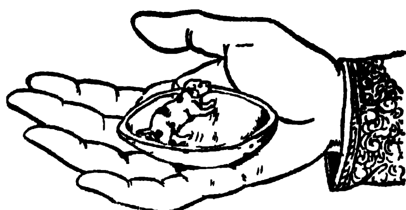
বড় দু'ভাই গেল একদিকে, ছোট ভাই গেল আরেকদিকে।

ছোট ভাই এবার বরাবর এল ঝর্ণার ধারে। ব্যাঙ বসেছিল, বলল—আবার কি হল রাজকুমার?

রাজপুত্র বলল—এবার একটি ছোট কুকুর চাই।

ব্যাঙ বললে—আমি ব্যবস্থা করছি।

ব্যাঙ লাফিয়ে পড়ল জলে। একটু পরে জল থেকে উঠে এসে রাজপুত্রের হাতে দিলে একটি বাদাম, বললে—এটি তুমি একেবারে রাজার কাছে নিয়ে যাও, সেখানে আস্তে আস্তে ভাঙবে, না হলে ভিতরের কুকুরটির আঘাত লাগবে।



ছোট ভাই সেই বাদামটি নিয়ে বাড়ী ফিরল। বড় দু'ভাই তার আগেই বাড়ী ফিরেছে। তারা সঙ্গে করে এনেছে যত রাজ্যের ছোট ছোট কুকুর। কিন্তু তার কোনটিই একটি বাদামের খোলার মধ্যে থাকবাব মতো নয়।

সবার শেষে ছোট ভাই রাজাব হাতে দিলে তার বাদামটি। বললে—আস্তে আস্তে ভাঙবেন, না হলে কুকুর-বাচ্চার আঘাত লাগবে।

রাজা বাদামটি ভাঙলেন। ভিতরে ছোট্ট একটি সাদা কুকুর বসে আছে, রাজাকে দেখে সে লেজ নাড়তে সুরু করল। রাজা ভাবী খুসি হলেন।

রাজা বললেন—এবাব তৃতীয় কাজটি তোমাদের করতে হবে। আমার রাজ্যের সবচেয়ে রূপসী কন্যাকে খুঁজে আনতে হবে। পরে সেই হবে এই রাজ্যের রাণী।

আবার তিন রাজপুত্র বেরিয়ে পড়ল।

বড় দু'জন গেল একদিকে, আর ছোটটি গেল আরেকদিকে।

ছোট রাজপুত্র বরাবর এল সেই ঝর্ণার ধারে। ব্যাঙ সেখানে বসেছিল। ছোট রাজপুত্র বলল—এবার আর তুমি কিছুই করতে পারবে না। এবার রাজা বলেছেন সবচেয়ে সুন্দরী কন্যাকে খুঁজে নিয়ে যেতে হবে।

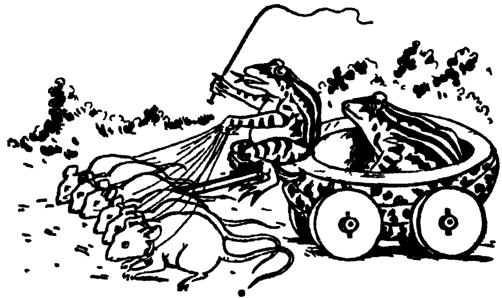
ব্যাঙ বলল—বেশ, দেখ আমি কিছু করতে পারি কি না। তুমি বাড়ী যাও। সবার সেরা রূপসী কন্যা তোমার পিছু পিছু যাবে।

তবে একটি কথা, পথে যা কিছু দেখবে, হেসো না। হাসলেই সব বিগড়ে যাবে।

ব্যাঙ এই কথা বলেই জলের মাঝে লাফিয়ে পড়ল।

রাজপুত্র কি করবে ভেবে পেলে না। তবে ব্যাঙ দু'বার তার উপকার করেছে, এবারও তেমন কিছু ঘটে যাবে ভেবে, সে বাড়ীর দিকে পা বাড়াল। কিছুদূর যেতে না যেতেই সে পিছনে কিসের যেন একটা শব্দ পেলে, ফিরে দেখে ছয়টি বড় ইঁদুর একটি কুমড়ো টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কুমড়োটিতে চারখানি চাকা লাগিয়ে একটি গাড়ী করা হয়েছে। গাড়ীর কোচোয়ান হয়েছে এক কোলা-ব্যাঙ, কুমড়োর ভিতরে বসে আছে তার চেনা সেই সোনা-ব্যাঙটি। ব্যাপার দেখে রাজপুত্র





অবাক হয়ে গেল। গরগর করে গাড়ীখানি তাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। রাজপুত্র ব্যাপাব কিছু বুঝল না, চলল নিজের পথে। খানিক আগে একটি বনের ধারে ব্যাঙের গাড়ী হারিয়ে গেল গাছের আড়ালে। সেই গাছগুলির পাশে এসেই রাজপুত্র চমকে উঠল, সেই গাছের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ছ' ঘোড়ার গাড়ীতে এক পরমাসুন্দরী কন্যা। কন্যা বলল—আসুন, আমরা এক গাড়ীতেই যাই।

রাজপুত্র বলল—তুমি কে কন্যা ?

কন্যা বলল—আমি এক সদাগরের মেয়ে। গণৎকারেরা বলেছিল আমি রাজরাণী হব। তাই শুনে হিংসা করে এক ডাইনী আমাকে যাদু করে ব্যাঙ করে দেয়। কথা ছিল, যদি কোন রাজপুত্র আমায়

দেখে না হাসে, তবেই আমি মুক্তি পাব। আজ আপনি আমায় দেখে হাসেন নি, তাই আমি মুক্তি পেলাম।

ছু'জনে গাড়ী চড়ে বাড়ী ফিরল। বড় ছু'ভাই তার আগেই ফিরেছে। অনেক রূপসী মেয়েকে সঙ্গে এনেছে। তাদের মাঝে যখন ভেক-কুমারী গিয়ে দাঁড়াল, তখন রাজসভায় সবাই বলল—হ্যাঁ, সুন্দরী বটে!

রাজা এবার বুঝলেন কোন্ ছেলে সবচেয়ে কাজের ছেলে। ছোট ছেলেকে তিনি করলেন রাজা, আর ভেক-কুমারী হল তার রাণী। দিব্যি সুখে স্বচ্ছন্দে তারা রাজ্য করতে লাগল।—

তুচ্ছ তুমি ভাবছ কাকে, হাস্যকর বলবে কারে।
ছোট যা তা অনেক সময় মহৎ কিছু করতে পারে॥

তুষারকণা

এক ছিল রাজা। রাজার একটি মেয়ে। মেয়েটির যেমন রূপ তেমনি গুণ। তুষারের মত শাদা তার গায়ের রং, গোলাপের পাপ্ড়ির মত তার মুখখানি। রাণী তার নাম রাখলেন—তুষারকণা।

দিন যায়, তুষারকণা বড় হয়। রাজা-রাণীর একমাত্র আদরের মেয়ে। বাপ-মা তাকে এক মুহূর্ত চোখের আড়াল করতে পারে না। আদর-আবদারের মধ্যে রাজকন্যার দিন কাটে।

কিন্তু রাজকন্যার অদৃষ্ট মন্দ। রাণী মারা গেলেন। রাজা নতুন বিয়ে করে আনলেন। নতুন রাণী দেখতে খুবই সুন্দরী, সেজন্য তার মনে ছিল খুবই অহংকার। নতুন রাণীর ছিল একটি আয়না। সে আয়না কথা বলত। নতুন রাণী সেই আয়নাকে জিজ্ঞাসা করত—

আয়না, সত্যি করে বল্
করিস্ নে কো ছল,
আমার মত রূপ আছে কি—
আর কারও, বলত দেখি?

আয়না বলত—



সত্যি করে কইগো আমি, রাণী।
তোমার রূপ নাইকো কারও জানি,
তোমায় সেরা সুন্দরী বলে মানি॥

নতুন রাণীর মনটা খুসি হত। তার মত সুন্দরী যে আর কেউ হতে পারে সে তা ভাবতেও পারত না।

দিন যায়। তুষারকণা বড় হতে থাকে। সাত বছব যখন বয়স হল তখন তাকে দেখতে হল নতুন বাণীর চেয়ে অনেক বেশী সুন্দরী। নতুন রাণী যখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলল—

আযনা, সত্যি করে বল্
করিস্ নে কো ছল,
আমার মত রূপ আছে কি—
আর কারও, বলত দেখি?

আয়না বলল—সত্যি করে কইগো আমি, বাণী,
তোমার মত আরেকজনকে জানি।
তুষারকণা তোমার চেয়ে রূপসী বলে মানি॥

রাণীর মুখ কালো হয়ে গেল। তখনই এক সেপাইকে ডেকে বলল—তুষারকণাকে এখনই নিয়ে যাও, বনের মাঝে নিয়ে গিয়ে তাকে শেষ করবে, যেন আর কখনও তার মুখ না দেখি।



সেপাই রাজকন্যাকে নিয়ে বনে চলে গেল। রাজবাড়ীর পুরানো সেপাই সে। রাজকন্যাকে মারতে তার মনে কষ্ট হল, বলল—

রাজকন্যা, তোমার সৎমা তোমাকে মেরে ফেলতে বলেছে, আমি তা পারব না। তুমি এই বনের মাঝে কোথাও চলে যাও। রাজবাড়ীতে আর ফিরে যেও না। তোমার সৎমা তোমাকে দেখতে পেলেই মেরে ফেলবে। আমি চললাম।

সেপাই চলে গেল। সেই গভীর বনের মাঝে রাজকন্যা ভয়ে কেঁদে ফেললে। বনের মাঝে কোথায় যাবে, কি করবে, কিছুই ভেবে পেলে না। বাঘ ডাকে, ভালুক ডাকে, শেয়াল ডাকে, সে চম্‌কে চম্‌কে ওঠে, ভয়ে দু'পা-একপা করে এগিয়ে যায়। কয়েক পা গিয়েই সে দেখলে বনের মাঝে ছোট একখানি কুঁড়েঘর। তুষারকণা সেই ঘরের মধ্যে ঢুকল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর। সামনে টেবিলের উপর সাতটি থালায় খাবার সাজানো, সাত গেলাস জল বসানো আছে। দেয়ালের গায় সাতটি ছোট খাটে সাতটি বিছানা পাতা রয়েছে। রাজকন্যার খুব খিদে পেয়েছিল, সে এক একটি থালা থেকে এক টুকরো রুটি নিলে, আর সাতটি গেলাস থেকে এক এক চুমুক জল খেলে। তারপর একটি বিছানার উপর শুয়ে পড়ল। শুতে না শুতেই ঘুম।

সেই কুঁড়েঘরে থাকত সাতজন বামন। সন্ধ্যা হতেই তারা বাড়ী ফিরে এল। সাতটি আলো জ্বেলে সাতজন খেতে বসল। থালার পানে তাকিয়েই সাতজন বলে উঠল—আমাদের রুটি ছিঁড়ে খেয়েছে কে? আমাদের জল খেলে কে? কে? কে?



চারিপাশে তাকিয়ে দেখে খাটের উপর শুয়ে আছে ছোট্ট একটি মেয়ে। সাতটি আলো হাতে নিয়ে সাতটি বামন ছুটে এল, বললে—বাঃ, বেশ ত মেয়ে, তুষারের মত রং, গোলাপের মত মুখ। এ কে?

সবাই বলল—এখন থাক্, সকালে ঘুম থেকে উঠলে জিজ্ঞাসা করব।

সকালে ঘুম থেকে উঠতেই বামনরা তুষারকণাকে ঘিরে ধরল, বলল—তুমি কে? কোথা থেকে আসছ?

তুষারকণা সব কথা বলল। বামনরা বলল—বেশ, তোমাকে আর কোথাও যেতে হবে না, তুমি এখানেই থাক।

রাজকন্যা সেখানেই থেকে গেল। বামনদের জন্য রান্না করে। বামনদের খাবার সাজিয়ে রাখে। বামনদের জামা-কাপড় সেলাই করে। বামনদের জন্য বিছানা পাতে। বামনরা রাজকন্যাকে খুব ভালবাসে, বলে—তুমি আমাদের বাড়ীর লক্ষ্মী, আমাদের ছোট্ট মা।

ওদিকে নতুন রাণী মনে করে তুষারকণা মরে গেছে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলে—আয়না, সত্যি করে বল্

করিস নে কো ছল,
আমার মত রূপ আছে কি—
আর কারও বলত দেখি?

আয়না বলল—সত্যি করে কইগো আমি, রাণী,
তোমার মত আরেক জনকেঁ জানি।
তোমার চেয়ে রূপসী বলে মানি॥
বনের মাঝে সাত বামনের ঘরে,
ছোট্ট মেয়ে সেথায় বসত করে।
রূপসী কেউ নেইকো তার 'পরে॥

রাণী বলল—কোন্ সে কন্যে, কি নাম বল তারি?
আয়না বলল—তুষারকণা, রাজার কুমারী॥

তুষারকণা তাহলে মরেনি? তার চেয়ে সুন্দরী হয়ে সে বেঁচে থাকবে? রাণী তখনই এক ফেরিওয়ালী সাজল। রকমারি জিনিষ নিয়ে একটি ঝুড়ি বোঝাই করল। তারপর সেই ঝুড়ি মাথায় নিয়ে চলল বনের মধ্যে।

তুষারকণার দরজায় এসে রাণী হাঁক দিলে—



জিনিস চাই গো রকমারী—
লেশ, ফিতে, জরী, মনোহারী।

রাজকন্যা জানালা দিয়ে দেখল, বলল —কি আছে গো?

ফেরিওয়ালী বলল—

জিনিস আছে রকমারি—
লেশ, ফিতে, জরী, মনোহারী।

রাজকন্যা দরজা খুলে তাকে ঘরের মাঝে ডাকল। ফেরিওয়ালী বলল—ওমা, এমন মেয়ে তুমি, আর তোমার এমন পোষাক! একটা লাল ফিতে তোমার গলায় কেমন মানাবে দেখ দিকি।



ফেরিওয়ালী রাজকন্যার গলায় একটি লাল ফিতে বেঁধে দেবার ছল করে একেবারে টেনে ফাঁস দিয়ে দিলে। দম বন্ধ হয়ে তুষারকণা সেইখানে ঢলে পড়ল। রাণী বলল—

তোর রূপ নিয়ে তুই মর।
চললাম আমি আমার ঘর॥

রাণী রাজবাড়ীতে ফিরে এল।

সন্ধ্যাবেলায় বামনরা ফিরল। রাজকন্যাকে ওই ভাবে পড়ে থাকতে দেখে তারা অবাক। তাড়াতাড়ি তার গলার ফাঁস কেটে দিলে। তুষারকণার আবার ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস বইতে সুরু করল। জ্ঞান ফিরে এল। বামনদের সে বলল—সব কথা। বামনরা বলল —খুব সাবধান, ওই ফেরিওয়ালী তোমার সৎমা, নতুন রাণী। আর কখনও তাকে বাড়ীর মধ্যে ডেকো না।

ওদিকে সন্ধ্যাবেলা রাজবাড়ী ফিরে রাণী আয়নাকে জিজ্ঞাসা করল—

আয়না, সত্যি করে বল্,
করিস্ নে কো ছল,
আমার মত রূপ আছে কি—
আর কারও, বলত দেখি ?

আয়না বলল—সত্যি করে কই গো আমি, রাণী,
তোমার মতন আরেক জনকে জানি,
তোমার চেয়ে রূপসী বলে মানি।
বনের মাঝে সাত বামনের ঘরে,
ছোট্ট মেয়ে সেথায় বসত করে,
রূপসী কেউ নেইকো তার 'পরে ॥

কী ! তুষারকণা এখনও বেঁচে আছে ? এবার রাণী দাড়ী-গোঁপ পরে সাজল এক ফেরিওয়ালা। আরসি, চিরুণী, চুলের কাঁটা একটা ঝুড়িতে সাজিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। বরাবর এল বনের মাঝে বামনদের কুঁড়েঘরের দরজায়। হাঁক দিল—

রেশমের মত চুল চিরুণীতে আঁচড়াও।
ঝক্‌ঝকে আয়নায় মুখখানি দেখে নাও ॥

তুষারকণা জানালা দিয়ে দেখল। এ তো সে আগের ফেরিওয়ালী নয়। এ তো ফেরিওয়ালা। বলল—কি আছে গো তোমার কাছে ?

—আরসি, চিরুণী, চুলের কাঁটা। এই দেখ না, কেমন স্থন্দর চিরুণী, তোমার রেশমী চুলগুলি আঁচড়ে নাও।

রাণী একখানি চিরুণী দিলে রাজকন্যার হাতে। চিরুণীটিতে বিষ মাখানো ছিল, রাজকন্যা চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে মাথা ঘুরে পড়ে গেল। রাণী বলল—তোর রূপ নিয়ে তুই মর্।
চললাম আমি আমার ঘর ॥

রাণী চলে গেল।

বামনরা সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে দেখে তো অবাক্। তুষারকণার মাথা থেকে তারা চিরুণীখানি ফেলে দিলে। রাজকন্যার আবার

নিঃশ্বাস বইতে সুরু করল। জ্ঞান হল। রাজকন্যা বলল—সব কথা। বামনরা বলল—খুব সাবধান, ওই ফেরিওয়ালা তোমার সৎমা, নতুন রাণী—তুমি কখনও কোন ফেরিওয়ালাকে ডেকো না, কাউকে দরজা খুলো না।

রাণী ওদিকে বাড়ী ফিরেই আয়নাকে জিজ্ঞাসা করল—

আয়না, সত্যি করে বল্,
করিস্ নে কো ছল।
আমার মত রূপ আছে কি—
আর কারও, বলত দেখি?

আয়না বলল—সত্যি করে কই গো আমি, রাণী,
তোমার মত আরেক জনকে জানি,
তোমার চেয়ে রূপসী বলে মানি।
বনের মাঝে সাত বামনের ঘরে,
ছোট্ট মেয়ে সেথায় বসত করে,
রূপসী কেউ নেইকো তার 'পরে॥

কী! তুষারকণা এখনও বেঁচে আছে? এবার আমি তাকে শেষ করবই। রাণী সাজলো এক চাষী। এক ঝুড়ি আপেল নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। বরাবর এলো বনের মাঝে বামনদের বাড়ীব সামনে। দরজায় ধাক্কা দিয়ে বললে—ও খুকী, দরজা খোল্।

তুষারকণা বলল—কে গো তুমি?

বুড়ী বলল—আমি গাঁয়ের চাষী, তোর জন্য আপেল এনেছি।

তুষারকণা বলল—দরজা খুলব না, আপেল খাব না, বামনরা বারণ করেছে।

বুড়ী বলল—আমার আপেল খাবি ভয় কি? আমি কি তোকে বিষ খাইয়ে মারব?

তুষারকণা বলল—না, আপেল আমি নোব না—খাব না।

বুড়ী বলল—তোর যদি অতই ভয়, এই দেখ একটা আপেলের আধখানা আমি খাই, বাকি আধখানা তুই খা।

বুড়ী একটা আপেলে আধখানায় বিষ মাখিয়ে এনেছিল, আর আধখানা ভাল ছিল। ভাল দিকটা সে নিজে খেলে, বিষাক্ত দিকটা দিলে তুষারকণার হাতে। তুষারকণা লোভ সামলাতে পারল না, আপেলে কামড় দিল। আর যায় কোথা, বিষে তার সারা দেহ নীল হয়ে গেল। সে টলে পড়ে গেল।

রাণী বলল—বিষে বিষে নীল হয়ে তুই মর—
বাঁচবি নে আর যতই কেন কর।

রাণী বাড়ী ফিরে গেল।

সন্ধ্যার সময় বামনরা ফিরে এল। তুষারকণাকে পড়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গেল। রাজকন্যা নীল হয়ে গেছে, নিঃশ্বাস বইছে না। সাত বামন অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই তুষারকণার জ্ঞান আর ফিরল না। তখন তারা তুষারকণাকে একটি বাক্সের মধ্যে রেখে এক পাহাড়ের কোলে একটি গোলাপ গাছের নীচে রেখে দিলে। বাক্সের গায়ে সোনা দিয়ে লিখে দিলে—রাজার মেয়ে তুষারকণা।

ওদিকে রাণী আয়নাকে বলল—

আয়না, সত্যি করে বল্,
করিস্ নে কো ছল।
আমার মত রূপ আছে কি—
আর কারও, বলত দেখি?

আয়না বলল—সত্যি করে কই গো আমি, রাণী,
তোমার রূপ নেইকো কারো জানি
তোমায় সেরা সুন্দরী বলে মানি।

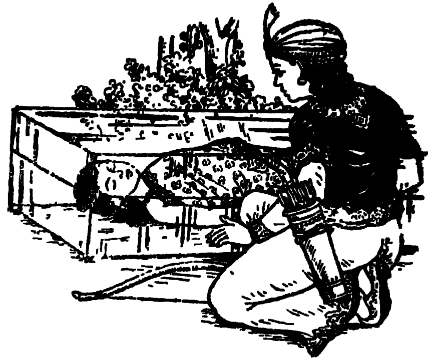
রাণী এবার খুসি হল।

এদিকে দিন যায়। কাঠের বাক্সের মধ্যে তুষারকণা পড়ে থাকে। গোলাপ গাছ থেকে গোলাপ ঝরে পড়ে। এক একজন বামন পালা করে পাহারা দেয় বাক্সটিকে।

একদিন এক রাজপুত্র এল সেই বনে শিকার করতে। বাক্সটি

দেখে তার উপরের লেখাটি পড়ে সে বলল—তুষারকণাকে আমি নিয়ে যাই, সহরে গিয়ে রাজবদ্যিকে দেখাব যদি বাঁচে।

বামনরা রাজী হল। রাজপুত্র তুষারকণাকে ঘোড়ার পিঠে তুলল। তুষারকণার মাথাটি যেই উঁচু করা হয়েছে অমনি তার মুখ থেকে আপেলের টুকরোটা পড়ে গেল। তুষারকণা চোখ মেলল, বললে—আমি কোথায়? তুমি কে?



রাজপুত্র বলল—আমি রাজার ছেলে, তোমাকে নিয়ে যাব আমার রাজ্যে, তোমাকে আমার রাণী করব।

বামনরা বলল—সেই ভাল, সেই বেশ হবে।

রাজপুত্র তুষারকণাকে নিয়ে গেল নিজের বাড়ীতে। বিরাট ধুমধাম করে রাজপুত্রের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেল। কত ঢাক-ঢোল সানাই বাজল, দেশসুদ্ধ লোক লুচি সন্দেশ খেলে। সাত বামন মনের আনন্দে যত নাচল তত গাইল।

ওদিকে রাণী আয়নাকে বলল—

আয়না, সত্যি করে বল্,
করিস্ নে কো ছল।
আমার মত রূপ আছে কি—
আর কারও, বলত দেখি?

আয়না বলল—সত্যি করে কই গো আমি, রাণী,
তোমার মত আরেক জনকে জানি।
রাজপুত্রের বউ সে যে, সবার সেরা মানি॥

কী! আমার চেয়ে সুন্দরী? রাণী তখনই বেরুল রাজপুত্রের বউ দেখতে। কত বন-বাদাড় পার হয়ে তেপান্তরের শেষে ভিন্‌দেশের

রাজবাড়ীতে এসে রাণী যখন রাজপুত্রের বউ দেখল, তখন তার মুখ থেকে আর কথা সরে না —এ যে তুষারকণা। কিন্তু এখন ত আর কিছু করার নেই। রাগে দুঃখে হিংসেয় সৎমা-রাণী সেইখানে পড়ল আর মরল।

এতদিনে তুষারকণার বিপদ কাটল। দিব্যি সুখে স্বচ্ছন্দে মনের আনন্দে তার দিন কাটতে লাগল, আর ভয় রইল না, আর ভাবনা রইল না।- -

নিজের ভাল হয় নাক' পরের হিংসা করে,
হিংসুকেরা নিজের মনে জ্বলে পুড়ে মরে।

ভাইবোন

ভাই ও বোন, মণি ও মায়া। মা নেই, সৎমা। সৎমা সব সময়েই বকেন, কিছু একটা হলেই মারেন, খেতে দেন না,. মিষ্টি কথা বলেন না একটিও। মনের দুঃখে মণি বলল—চল্ মায়া, এখানে আর থাকব না।

মায়ার হাত ধরে মণি বেরিয়ে পড়ল।

সারাদিন ধরে তারা চলল। কত পথ, কত মাঠ তারা পার হল, শেষে এসে পড়ল এক বনের ধারে। মণি বলল—আমার বড় তেষ্টা পেয়েছে।

ভাইবোনে এক ঝর্ণার ধারে গেল। ভাই জল খেতে গেল এমন সময় বোন শুনল কে যেন বলছে—

খেও না খেও না জল, যাদু করা আছে।
বাঘ হয়ে চলে যাবে অরণ্যের মাঝে॥

বোন বলল—দাদা, এ জল খেও না।

মণির জল খাওয়া হল না, দু'জনে এগিয়ে চলল।

আর একটু গিয়ে আর এক ঝর্ণা। মণি নামল জল খেতে, এমন সময় কে যেন বলল—

খেও না খেও না জল, যাহু করা আছে।
ভালুক হয়ে চলে যাবে অরণ্যের মাঝে॥

মায়া বলল—দাদা, এ জল খেও না।

মণির জল খাওয়া হল না, হু'জনে আবার এগিয়ে চলল।

আর একটু গিয়ে আর-এক ঝর্ণা। মণি নামল জল খেতে, এমন সময় কে যেন বলল—

খেও না খেও না জল, যাহু করা আছে।
হরিণ হয়ে চলে যাবে গভীর বনের মাঝে॥

মায়া বলল—দাদা, এ জল খেও না।

মণি বলল—আর আমি থাকতে পারছি না, যা হয় হোক, জল এবার আমি খাবই।

মণি জল পান করল। পরক্ষণেই দেখা গেল, সে একটি হরিণ হয়ে গেছে। মায়া তো কেঁদেই আকুল। কিন্তু তখন কেঁদে আর কি হবে, হরিণকে সঙ্গে নিয়ে মায়া বনের মধ্যে এগিয়ে চলল।

সন্ধ্যাবেলা তারা এসে পড়ল এক কুঁড়েঘরে। ঘরে কেউ ছিল না, মায়া বলল—আমরা ভাইবোনে এইখানেই থাকি।

হু'জনে সেখানে থাকে। মায়া বনের ফলমূল খায়। হরিণের জন্যে কচি কচি ঘাস তুলে আনে। সারাদিন হু'জনে খেলা করে। সন্ধ্যাবেলা দরজা বন্ধ করে ঘুমায়। দিন যায়।

দেশের রাজা বেরিয়েছিলেন মৃগয়া করতে। সঙ্গে কত লোকজন, শিঙা বাজছে, কুকুর ডাকছে। বনের মধ্যে হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যাপার। হরিণ বলল—কি হচ্ছে একবার দেখে আসি।

মায়া বলল—না না, বাইরে যাবার দরকার নেই।

হরিণ বলল—যেখানেই যাই সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসব।

মায়া বলল—বলবে 'মায়া দরজা খোল', তবে আমি দরজা খুলব।

হরিণ লাফাতে লাফাতে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

শিকারী কুকুরের দল হরিণকে দেখেই ঘিরে ধরল। রাজার শিকারীরা তেড়ে এল। হরিণ চোখের নিমেষে এক লাফে ঝোপঝাড়

পেরিয়ে বনের মধ্যে পালিয়ে গেল। রাজা সারাদিন অনেক ছুটাছুটি করেও হরিণকে আর দেখতে পেলেন না।

সন্ধ্যাবেলা হরিণ ফিরে এল কুটীরে। বলল—মায়া, দরজা খোল।

বোন দরজা খুলে দিলে। ঘাস খেয়ে হরিণ ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন রাজার লোকেরা আবার শিকারে মেতে উঠল। হরিণ বলল—কি হচ্ছে একবার দেখে আসি।

হরিণ লাফাতে লাফাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আজ আর কিন্তু হরিণের পালিয়ে যাওয়ার সুবিধা হল না। এক শিকারী তার উপর লক্ষ্য রাখল। শেষে এক তীর মেরে সে হরিণকে খোঁড়া করে দিলে। কোন রকমে খোঁড়াতে খোঁড়াতে হরিণ পলিয়ে এল কুটীরের দ্বারে, ডাকল—মায়া, দরজা খোল।

ভাইয়ের তীর-বেঁধা পা দেখে বোন কেঁদে ফেললে। রক্ত মুছিয়ে পাথরকুচির পাতা দিয়ে ক্ষত বেঁধে দিলে। কচি ঘাস খেয়ে হরিণ ঘুমিয়ে পড়ল।

এদিকে রাজার অনুচর হরিণটিকে তাড়া করেছিল, রক্তের দাগ দেখে সে কুটীরের দরজায় এসে পৌঁছাল। রাজাকে গিয়ে খবর দিলে—মহারাজ, হরিণটা পোষা হরিণ, বনের মধ্যে এক কুটীরে থাকে।

রাজা বললেন—চল, গিয়ে দেখি গে।

রাজা এলেন কুটীরের দরজায়, বললেন—কে আছ ভিতরে, দরজা খোল।

মায়ার ভয় হল, সে দরজা খুলল না।

রাজা বললেন—দরজা ভাঙব।

এবার মায়া দরজা খুলে দিলে।

মায়াকে দেখে রাজা ত অবাক, বললেন—তুমি কে? এখানে একা থাক কেন?

মায়া ভয়ে কেঁদে ফেললে।

রাজা বললেন—কাঁদছ কেন? ভয় নেই, আমি এই দেশের রাজা, বল কি হয়েছে।

মায়া তখন বললে সৎমায়ের কথা, ভাইয়ের হরিণ হওয়ার কথা।

রাজা বললেন—বেশ, চল তুমি আমার সঙ্গে, আমি তোমাকে রাণী করব।

রাজা মায়াকে আর হরিণকে নিয়ে রাজ্যে ফিরে এলেন।

মায়াকে রাজা বিয়ে করলেন। মায়া হল রাণী। রাণী এবার যত তন্ত্রমন্ত্র জানা গুণীন্‌দের ডাকলেন, বললেন—আমার হরিণ-ভাই কি করে মানুষ হবে, বল?

গুণীন্‌রা গুণে বলল—তোমার সৎমা ওকে হরিণ করেছে, সে যতদিনে বাঁচবে ততদিন ও হরিণ থাকবে।

রাজার লোক তখনই গিয়ে সৎমাকে ধরে আনল। রাজা বললেন—যে একটি মানুষকে হরিণ করে দিতে পারে সে কত বড় সাংঘাতিক মানুষ! সে কত লোকের কত ক্ষতি করেছে, কে জানে। ওকে এখনি হেঁটে-কাঁটা উপরে-কাঁটা দিয়ে পুঁতে ফেল।

দুষ্ট সৎমার উপযুক্ত সাজা হল। সৎমা যেই মরল, অমনি তার মন্ত্রও কেটে গেল। হরিণ আবার মানুষ হয়ে গেল। ভাইবোনের দিন আবার সুখে কাটতে লাগল।—

ডাইনী বুড়ী অকারণে ছোটদের ক্ষতি করে।
ডাইনী বুড়ী পরিণামে নিজের পাপে নিজে মরে॥

বারো বোনের গল্প

এক ছিল রাজা। রাজার বারোটি মেয়ে। বারোটি রাজকন্যা একই ঘরে শোয়। রাত্রে ঘরের দরজা বন্ধ থাকে, তবু সকালে উঠে দেখা যায় রাজকন্যাদের জুতোয় কাদা লেগে আছে, জুতোগুলি পুরানো হয়ে গেছে। রোজ সকালে উঠেই বারোজন রাজকন্যা নতুন বারো জোড়া জুতো চায়, আর পরদিন সকালেই দেখা যায় জুতোগুলি রাত্রের মধ্যে পুরানো হয়ে ছিঁড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। রাজা ত অবাক

হয়ে যান। ঘোষণা করলেন—এই জুতোর রহস্য যে বলতে পারবে তাকে তিনি এক রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে দিবেন, অর্ধেক রাজ্য দেবেন।

এক রাজপুত্র এল, বলল—আমি এই রহস্যের সন্ধান করব।

রাজা বললেন—তিন রাত্রি সময় দিলাম, তার মধ্যে কিছু না করতে পারলে তোমার গর্দান যাবে।

রাজপুত্র শুয়ে রইল রাজকন্যাদের পাশের ঘরে। রাত বারোটা অবধি রাজপুত্র জেগে বসে রইল, তারপর ঢুলে পড়ল ঘুমে। ভোর বেলা যখন তার ঘুম ভাঙল, উঠে দেখে রাজকন্যারা ঘুমুচ্ছে, জুতোগুলি পুরানো হয়ে গেছে, ছিঁড়ে গেছে।

রাজপুত্র পরপর তিন রাত্রি পাহারা দেবার চেষ্টা করল। তিন রাত্রেই সে ঘুমিয়ে পড়ল। রাজার হুকুমে তার মাথা কাটা গেল।

তারপর একে একে আরও কত রাজপুত্র এল। সকলেরই সেই এক অবস্থা, রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ে, শেষে মাথা কাটা যায়।

একদিন এক সৈনিক যুদ্ধ শেষ করে বাড়ী ফিরছিল। পথে এক বনের ধারে দেখে এক বুড়ী এক বোঝা কাঠ মাথায় নিয়ে কোন রকমে কাঁপতে কাঁপতে চলেছে। সৈনিক বলল—বুড়ী, তুই চলতে পারছিস্ নে, কাঠের বোঝাটা আমি তোর বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।



বুড়ীর কাঠের বোঝা সৈনিকটি তার বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এল।

বুড়ী বলল—তুই কোথা যাচ্ছিস্?

সৈনিক বলল—দেশে যাচ্ছি।

বুড়ী বলল—তুই আমার অনেক উপকার করলি, তোকে একটা জিনিস দিই, নিয়ে যা। এই চাদরখানা নে, গায়ে মুড়ি দিলে কেউ আর তোকে দেখতে পাবে না।

বুড়ীর চাদরখানি নিয়ে সৈনিক এল এই রাজ্যে। এখানে রাজকন্যার জুতোর ব্যাপার শুনে সৈনিক গেল রাজসভায়। বলল—মহারাজ, আমি তিন রাত পাহারা দোব।

রাজা তখনই সব ব্যবস্থা করে দিলেন। সন্ধ্যাবেলা সৈনিক এল রাজকন্যাদের পাশের ঘরে পাহারা দিতে। রাত্রে সৈনিকের খাবার এল। সৈনিক ভাবল রাত্রে ভাল করে খেলেই ঘুম পাবে, বলল—আমি কিছুই খাব না।

না খেয়ে সৈনিক জেগে রইল সারা রাত। কিন্তু বিছানায় শুয়ে রইল ঘুমের ভান করে।

রাজবাড়ীতে ঢং ঢং করে রাত বারোটার ঘণ্টা বাজল। রাজকন্যারা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। ভাল করে সাজগোজ করে জুতো পায়ে দিয়ে তারা এসে দাঁড়াল সৈনিকের দরজায়। সৈনিক চোখ বুঁজে চুপ করে পড়ে ছিল, বড় রাজকন্যা বলল—ও দিব্যি ঘুমুচ্ছে, চল।

নিজেদের ঘরে এসে রাজকন্যারা তালি দিল, তখনই বড় রাজকন্যার পালংকের নীচে মেঝে থেকে একখানি পাথর সরে গেল। দেখা গেল একটি সুড়ঙ্গ পথ। রাজকন্যারা একে একে সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে নেমে গেল।

সৈনিক বুড়ীর চাদরখানি গায়ে জড়িয়ে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিল, সে আর দেরী করল না, ছোটকন্যার পিছনে সে-ও নেমে গেল সুড়ঙ্গের মধ্যে। রাজকন্যারা কেউ তাকে দেখতে পেলে না।

সুড়ঙ্গ পথ শেষ হতেই তারা এসে পড়ল এক বাগানে। বাগানে সব সোনার গাছ, তাতে রূপার পাতা, হীরে-মুক্তার ফুল। সৈনিক একটা গাছের একটি ডাল ভেঙ্গে নিলে। ছোট রাজকন্যা ছিল সবার পিছনে, সে সেই শব্দ শুনে বললে—কিসের একটা শব্দ হল না?

সবাই পিছন পানে তাকাল, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলে না। বড় রাজকন্যা বলল—ও কিছু না, তোর মনের ভুল। চল্।

বাগান পার হয়ে তারা এক নদীর ধারে গিয়ে পৌঁছাল। নদীর তীরে বারোখানি নৌকা নিয়ে বারোজন রাজপুত্র বসেছিল। বারোজন

রাজকন্যা বারোখানি নৌকায় উঠে বসল। সৈনিক ছোট রাজকন্যার নৌকায় উঠে পড়ল। নৌকা নদীর ওপারে চলল। ছোট রাজকন্যা



বললে—আমার মনে হচ্ছে নৌকায় কে যেন আমার পাশে বসে আছে।

সবাই তাকাল তার নৌকার পানে, কাউকে দেখতে পেলে না।

রাজপুত্র বলল—ও তোমার মনের ভুল, চল।

নদী পার হয়ে সবাই ওপারে পৌঁছাল। সামনেই বিরাট রাজবাড়ী, হাজার হাজার বাতিদানে আলোয় আলো। ভিতরে প্রকাণ্ড নাচঘর। নাচঘরের ভিতরে ঢুকতেই চারিপাশ থেকে মিষ্টি বাজনা ভেসে এল। সুরু হল মধুর সুরে গান। বারোজন রাজকন্যা বারোজন রাজপুত্রের হাত ধরে সেই গানের তালে তালে নাচতে সুরু করে দিলে। দেখতে দেখতে নাচ গান ও বাজনা জমে উঠল। সৈনিক অদৃশ্য থেকে সব-কিছুই দেখতে লাগল, শুনতে লাগল।

দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে সময় কেটে গেল। ঢং ঢং ঢং করে বাজল রাত তিনটে। নাচ থামল। বারোজন রাজপুত্র বারোজন রাজকন্যার জন্য বারো গেলাস সরবৎ নিয়ে এল। সরবতের গেলাস টেবিলের উপর রাখতেই ছোট রাজকন্যার গেলাসটি তুলে নিয়ে অদৃশ্য সৈনিক সেটি এক চুমুকে শেষ করে দিলে। ছোট রাজকন্যা সরবৎ খেতে গিয়ে দেখে গেলাস খালি, বললে—আমার গেলাস খালি কেন?

অন্যান্য রাজকন্যা হেসে উঠল, বলল—আজ তোর কি হয়েছে বলত? সরবৎ খেয়ে ফেললে গেলাস খালি হবে না?

ছোট রাজকন্যা আর কিছু বললে না।

এবার রাজপুত্রেরা নৌকায় করে রাজকন্যাদের নদী পার করে

দিলে। বাগান পার হয়ে রাজকন্যারা ফিরে এল নিজেদের শোবার ঘরে। সবার আগে সুড়ঙ্গ পার হয়ে এসে সৈনিক গা থেকে চাদরখানি খুলে টুপ করে শুয়ে পড়ল বিছানার উপর, ঘুমের ভান করে নাক ডাকাতে লাগল।

রাজকন্যারা এসে একবার দেখল, সৈনিক ঘুমুচ্ছে, তার নাক ডাকছে। হেসে তারা শুতে চলে গেল নিজেদের ঘরে।

সৈনিক সেদিন রাজাকে কিছু বললে না, আরও দু'রাত সে দেখলে। প্রতি রাত্রেই সেই একই ব্যাপার। রাত বারোটার সময় রাজকন্যারা বেরিয়ে যায়, রাজপুত্রদের সঙ্গে নাচগান শেষ করে ফিরে আসে রাত তিনটের সময়।

চতুর্থ দিনে সকাল বেলা রাজসভায় সৈনিকের ডাক পড়ল। সৈনিক বলল—মহারাজ, রাজকন্যা নাচতে যায় রাত বারোটার সময়। নেচে ফিরে আসে রাত তিনটের সময়। তাই সকালে দেখা যায় নতুন জুতো পুরানো হয়ে গেছে, ছিঁড়ে গেছে।

সৈনিকের কথা শুনে রাজা ত অবাক। সৈনিক বলল—চলুন মহারাজ, রাজকন্যাদের শোবার ঘরের সুড়ঙ্গ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, আর, এই দেখুন সেই বাগানের গাছের ডাল আমি ভেঙ্গে এনেছি।

সৈনিক গাছের ভাঙা ডালটি দেখাল—সোনার ডাল, রূপার পাতা, হীরের ফুল।

রাজা শোবার ঘরের সুড়ঙ্গ দেখলেন। রাজকন্যাদের ডেকে বললেন—যা শুনছি এ সব কি সত্যি?

রাজকন্যারা দেখল ধরা পড়ে গেছে, আর লুকানো যাবে না, বলল—সত্যি!

রাজা তখন বললেন—সৈনিক, আমি তোমাকে অর্ধেক রাজ্য দিলাম, আর রাজকন্যাদের যাকে তোমার পছন্দ হয় বিয়ে করতে পার।

সৈনিক বলল—বড় মেয়ের আগে বিয়ে হওয়া উচিত। আমি বড় রাজকন্যাকেই পছন্দ করি মহারাজ।

বড় রাজকন্যার সঙ্গে সৈনিকের বিয়ে হয়ে গেল।

রাজার কোন ছেলে ছিল না। রাজার মৃত্যুর পর বড় জামাইকেই প্রজারা রাজা করল। রাজা হয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে সৈনিকের দিন কাটতে লাগল। আমার গল্পটিও ফুরুল—

বুদ্ধিমান সকল কাজেই বুদ্ধি খরচ করে।
সকল কাজেই সফল হয় বুদ্ধি যেবা ধরে॥

চার ভাইয়ের গল্প

এক ছিল সদাগর। সদাগরের তিন ছেলে। ছেলেরা বড় হলে সদাগর একদিন বলল—আমার টাকা-পয়সা নেই। চারজন চার রকম কাজ শিখে এসো, রোজগার করে খেতে হবে।

চার ভাই বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। কিছুদূর গিয়েই পথের চৌমাথায় এসে তারা থমকে দাঁড়াল। বড় ভাই বলল—চারদিকে চারটি পথ গেছে, এক্ একজন এক এক পথে যাই।

চার ভাই চার পথে গেল। কিছুদূর গিয়ে এক বনের ধারে বড় ভাইয়ের দেখা হল একটি লোকের সঙ্গে, সে বলল—কোথায় যাচ্ছ?

—একটা কোন বিদ্যে শিখতে যাচ্ছি।

—চুরি বিদ্যে শিখবে?

—না, ধরা পড়লে জেল খাটতে হবে।

—এমন কাজ শিখাব যে কখনও ধরা পড়বে না।

বড় ভাই তার কাছে চুরিবিদ্যে শিখল।

মেজো ভাইয়ের সঙ্গে পথে একটি লোকের সঙ্গে দেখা হল, সে বলল—কোথায় যাচ্ছ?

—একটা কোন বিদ্যে শিখতে যাচ্ছি।

—জ্যোতিষ-বিদ্যা শিখবে? জগতে কিছুই আর অজানা থাকবে না।

মেজো ভাই তার কাছে জ্যোতিষ-বিদ্যা শিখল।

সেজো ভায়ের সঙ্গে পথে একটি লোকের সঙ্গে দেখা হল, সে বলল—কোথায় যাচ্ছ ?

—একটা কোন বিদ্যে শিখতে যাচ্ছি।

—বেশ, আমি তোমাকে ধনুর্বিদ্যা শেখাব।

সেজো ভাই তার কাছে ধনুর্বিদ্যা শিখল।

ছোট ভায়ের সঙ্গে একটি লোকের সঙ্গে দেখা হল, সে বলল—কোথায় যাচ্ছ ?

—একটা কোন বিদ্যে শিখতে যাচ্ছি।

—সেলাইয়ের কাজ শিখবে, তাহলে আমি শেখাব।

ছোটভাই তার কাছে সেলাইয়ের কাজ শিখল।

চার বছর পরে চার ভাই ঘরে ফিরল। সদাগর বললে—কি শিখে এলে পরীক্ষা দাও। গাছের মাথায় ওই পাখীর বাসায় ক'টা ডিম আছে বল দেখি ?

জ্যোতিষী মেজোভাই দূরবীণে দেখে বলল—চারটে।

—এমনভাবে ডিম চারটে চুরি করে আন যে পাখী জানবে না।

চোর বড়ভাই সন্তর্পণে ডিমগুলি চুরি করে আনল।

—চারটে ডিম আধাআধি সমান করে কাটো।

অস্ত্রবিদ্ সেজোভাই তৎক্ষণাৎ ডিম চারটি কেটে ফেলল।

—এবার ডিমের খোলাগুলি সেলাই করে জুড়ে দাও।

সেলাই-কর ছোটভাই বেমালুম ডিম চারটে জুড়ে দিলে।

—আবার ডিমগুলি বাসায় রেখে এসো, পাখী না জানে

চোর বড়ভাই সন্তর্পণে ডিমগুলি রেখে এল।

দেখে শুনে সদাগর বলল—ভাল শিক্ষা হয়েছে।

দিন যায়। হঠাৎ একদিন কোথা থেকে এক দৈত্য এসে সে-দেশের রাজকন্যাকে ধরে নিয়ে গেল। রাজা ঘোষণা করলেন—রাজকন্যাকে যে উদ্ধার করবে তাকে অর্ধেক রাজ্য দেবেন ও রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে দেবেন।

চার ভাই ঠিক করলে রাজকন্যাকে তারা উদ্ধার করবে।

মেজো ভাই দূরবীণ দিয়ে দেখে বলল—দৈত্য সাগরের মাঝে এক পাহাড়ে রাজকন্যাকে বন্দী করে রেখেছে।

একখানি নৌকা নিয়ে চার ভাই বেরিয়ে পড়ল। পাহাড়ে এসে নৌকা ভিড়ল। পাহাড়ের উপর দৈত্য ঘুমুচ্ছিল। বড়ভাই রাজকন্যাকে চুরি করে আনল, দৈত্য টের পেলে না।

ঘুম ভাঙতেই দৈত্য রাজকন্যার খোঁজ করল। নৌকা তখন মাঝ সাগরে। দৈত্য নৌকাখানিকে তাড়া করল। সেজো ভাই এক তীর মেরে দৈত্যকে শেষ করল, কিন্তু মরার আগে দৈত্য নৌকাখানিকে ভেঙে দিলে। চার ভাই জলে ভাসতে লাগল।

নৌকার কাঠগুলি জলে ভাসছিল, ছোট ভাই এক একখানি কাঠ ধরে সেলাই করে ফেলল। আবার নৌকা নতুন তৈরী হল। সেই নৌকায় চড়ে চার ভাই রাজকন্যাকে নিয়ে ফিরে এল রাজার কাছে।

বড়ভাই বলল—আমি রাজকন্যাকে চুরি করে এনেছি।

মেজোভাই বলল—আমি আগে রাজকন্যার খবর দিয়েছি।

সেজোভাই বলল—আমিই দৈত্য মেরেছি!

ছোটভাই বলল—নৌকা না থাকলে সবাই তো ডুবে মরতো।

সব শুনে রাজা বললেন—চার জনে রাজকন্যাকে উদ্ধার করেছ। কিন্তু চারজনের সঙ্গে ত রাজকন্যার বিয়ে হবে না। একজনের সঙ্গে বিয়ে হবে। সে কে তা তোমরাই ঠিক কর।

চার ভাইয়ে তখন তর্ক বেধে গেল। প্রত্যেকেই বলে—আমি না হলে কিছুই হত না।

রাজা বললেন—তোমাদের ঝগড়া করার দরকার নেই। গুণে তোমরা সবাই সমান, কেউ বড় নয়, কেউ ছোট নয়। রাজকন্যার সঙ্গে কারও বিয়ে হবে না। তোমাদের চারজনকে চারটি জমিদারি দিচ্ছি, তোমরা চার ভাই মিলেমিশে থাক গে।

চারভাই খুসি হল। ঝগড়া মিটে গেল। চারভাই চার জমিদার হয়ে হাসতে হাসতে ফিরে গেল।—

বিবাদ নেই মনে,
মিলেছে চার জনে।
চার ভাই মিলেমিশে করে বাস,
সুখে-দুঃখে কেটে যায় বারো মাস॥

গোলাপ-সুন্দরী

একছিল রাজা! রাজার কোন ছেলেমেয়ে ছিল না। রাজার মনে ভারী কষ্ট। একদিন নদীর ধারে রাজা বসে বসে ভাবছেন, এমন সময় একটা প্রকাণ্ড বোয়াল মাছ মাথা তুলে রাজার মুখের পানে তাকাল, বলল—রাজা, তুই দুঃখ করিস্ না, তোর একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে হবে।

কিছুদিন পরেই সত্যিই রাজার একটি মেয়ে হল। পরমা-সুন্দরী কন্যা। গোলাপের মত রং। রাজা তার নাম রাখলেন—গোলাপ-সুন্দরী।

রাজকন্যার অন্নপ্রাশন হবে। রাজবাড়ীতে মহা ধুম পড়ে গেল। রাজা দেশশুদ্ধ লোককে নিমন্ত্রণ করলেন।

সে রাজ্যে তেরো জন পরী ছিল। বারো জনকে রাজা চিনতেন, তারা থাকত রাজার ফুল-বাগানে। রাজা তাদেরও নিমন্ত্রণ করলেন।

বারোজন পরী রাজকন্যাকে দেখতে এল। তারা রাজকন্যাকে আশীর্বাদ করল। একজন পরী বলল—রাজকন্যা অপূর্ব সুন্দরী হবে।

দ্বিতীয় পরী বলল—রাজকন্যা অত্যন্ত গুণবতী হবে।

তৃতীয় পরী বলল—রাজকন্যা অত্যন্ত দয়াবতী হবে।

চতুর্থ পরী বলল—রাজকন্যার টাকা-পয়সার অভাব হবে না।

একে একে এগারজন পরী যখন রাজকন্যাকে আশীর্বাদ করেছে, এমন সময় আরেকজন পরী এসে উপস্থিত, রাজা তাকে চিনতেন না,

তাকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি। সে এসেই চোখ লাল করে বললে—আমাকে নিমন্ত্রণ না করে রাজা আমাকে অপমান করেছে। আমি



শাপ দিচ্ছি, পনেরো বছব বয়সে রাজকন্যা হাতে ছুঁচ বিঁধে মারা যাবে।

শাপ দিয়েই সে ঠব ঠর কবে চলে গেল।

রাজা রাণী ত কেঁদে ফেললেন।

তখনও দ্বাদশ পরীব আশীর্বাদ করতে বাকি ছিল। দ্বাদশ পবী বললে—তোমরা কেঁদো না। আমি আশীর্বাদ করছি রাজকন্যা মরবে না। আঙুলে ছুঁচ বিঁধে সে একশো বছর ঘুমুবে। তারপর আবার সে বেঁচে উঠবে।

রাজা সেইদিনেই হুকুম দিলেন—বাজবাড়ীতে কেউ ছুঁচ রাখতে পারবে না, ছুঁচ নিয়ে কেউ রাজবাড়ীতে ঢুকবে না।

দিন যায়। দিনে দিনে রাজকন্যা বড হতে থাকে। রূপে গুণে রাজকন্যা হল সবার সেরা। রাজবাডীর সবাই তাকে ভালবাসে। রাজা রাণী তাকে এক দণ্ড চোখের আড়াল করেন না।

দেখতে দেখতে রাজকন্যার বয়স হল পনেরো বছর। একদিন রাজকন্যা একা একা ছাদে বেড়াচ্ছে, হঠাৎ তার নজর পড়ল চিলে-কোঠার পানে। ওই ঘরে সে ত একদিনও যায় নি। রাজকন্যা চিলে-কোঠার মধ্যে ঢুকল। দেখে ঘরের মধ্যে এক বুড়ী বসে কি

যেন সেলাই করছে রাজবাড়ীতে ছুঁচ ছিল না, রাজকন্যা কখনও কাউকে সেলাই করতে দেখেনি, বলল—তুমি কি করছ?

বুড়ী বলল—সেলাই করছি।

রাজকন্যা কাছে গিয়ে দেখল, অনেকক্ষণ ধরে দেখল, তারপর বলল—বাঃ, এ তো বেশ মজার কাজ। আমায় দাও না, আমি একটু সেলাই করি।



বুড়ী রাজকন্যার হাতে ছুঁচ-সুতা দিল। রাজকন্যা সেলাই করতে বসল। ছুঁচের দু' ফোঁড় সেলাই করতে না করতেই রাজকন্যার আঙুলে ছুঁচ বিঁধে গেল। রাজকন্যা জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল সেইখানে। বাজকন্যার উপর পরীর যে শাপ ছিল তা ফলে গেল, রাজকন্যা ঘুমিয়ে পড়ল।

রাজকন্যা ঘুমিয়ে পড়তেই রাজা রাণী, মন্ত্রী, কোটাল, সেনাপতি, দাসদাসী যে যেখানে ছিল সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, কুকুর, বেড়াল, খাঁচার পাখীটি অবধি ঘুমিয়ে পড়ল। যে রাজবাড়া সারাক্ষণ গম্‌গম্‌ করত, সেই রাজবাড়ী এক নিমেষে সব চুপচাপ থম্‌থমে হয়ে গেল।

একশো বছরের ঘুম! রাজকন্যা ঘুমুল, ঘুমুল রাজবাড়ী। দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। রাজবাড়ীর বাগান আগাছার জঙ্গলে ভবে ওঠে, রাজবাড়ীর ছাদে ঘাস গজিয়ে যায়। বছর কয়েকের মধ্যে রাজবাড়ী হয়ে ওঠে এক গভীর জঙ্গল।

লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে জঙ্গলবাড়ীর কথা। কত রাজপুত্র আসে সেই জঙ্গলে, কিন্তু কাঁটাবন পার হয়ে রাজবাড়ীতে কেউ পৌঁছায় না। রাজপুত্ররা ফিরে যায়। দিন যায়, মাস যায়, বছর কাটে।

দেখতে দেখতে একশো বছর কেটে গেল।

এক রাজপুত্র এল সেই বনে শিকার করতে। বনের মাঝে এক বুড়ীর সঙ্গে দেখা, সে রাজপুত্রকে বলল—জঙ্গলবাড়ীর কথা, ঘুমন্ত রাজকন্যার কথা। রাজপুত্র তখনই সেই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। একশো বছর তখন পূর্ণ হয়েছে, বনের গাছগুলি যেন নিজেই সরে গেল, রাজপুত্রকে পথ করে দিল। রাজপুত্র বরাবর গেল রাজবাড়ীতে। কুকুর ঘুমুচ্ছে, বিড়াল ঘুমুচ্ছে, পাখী ঘুমুচ্ছে, রাজারাণী ঘুমুচ্ছে, এমন কি রাজার নাকের উপর একটি মশা পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছে।

রাজপুত্র রাজকন্যাকে খোঁজে। ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ায়। রাজবাড়ীর একতলা দেখে দোতলায় গিয়ে ওঠে। দোতলা দেখে তিনতলায় গিয়ে ওঠে। তিনতলা দেখে, চারতলা দেখে পাঁচতলায় গিয়ে ওঠে। পাঁচতলা থেকে যায় ছ'তলায়। তারপর ওঠে সাত তলায়। কোনখানেই রাজকন্যাকে দেখতে পায় না।

শেষে রাজপুত্র সাত তলার ছাদে চিলে-কোঠায় উঠল। দেখে সেখানে রাজকন্যা একা পড়ে আছে, তার হাতে ছুঁচসুতা। রাজপুত্র ছুঁচ-সুতাটি টেনে নিলে রাজকন্যার হাত থেকে, রাজকন্যা চোখ মেলল। একশো বছর পূর্ণ হল।

রাজকন্যার ঘুম ভাঙল। রাজবাড়ীর ঘুম ভাঙল দাস-দাসীর ঘুম ভাঙল।

কুকুর উঠে বসে ডেকে উঠল-ঘেউ ঘেউ ঘেউ।

বিড়াল উঠে বসে ডাকল—মিউ মিউ।

পায়রাগুলি কার্ণিশের উপর সাড়া তুলল—বক্-বকম।

ঘোড়াশালে ঘোড়া জাগল, হাতী-শালে হাতী জাগল।

রাজবাড়ী আবার গমগম করে উঠল।

জঙ্গল কেটে সাফ় করা হল। ঘরের ধুলো ঝাড়া হল, ঝাড়লণ্ঠন জ্বলল, জঙ্গলবাড়ী আবার রাজবাড়ী হল।

তারপর শুভদিন দেখে রাজকন্যার সঙ্গে রাজপুত্রের বিয়ে হয়ে গেল। কত ঢাক ঢোল নহবৎ বাজল, কত ধূম-ধাম হল। দেশশুদ্ধ লোক কত লুচি-সন্দেশ খেল। তারপর একদিন এই রাজপুত্রেই হল

রাজা, গোলাপ-সুন্দরী হল তার রাণী। দিব্যি সুখে স্বচ্ছন্দে তাদের দিন কাটাতে লাগল। আমার কথাটিও ফুরুল।—

নিদ্‌মহলের রাজকন্যা ঘুমপরীর দেশে
শত বছর ঘুমিয়ে থেকে জাগল অবশেষে—
অচিনদেশের রাজারকুমার ঘুমভাঙানো গানে
নিদ্‌মহলের ঘুম ভাঙাল কবে কে তা জানে।

সুবর্ণপুরীর রাজকন্যা

এক ছিল রাজা। রাজার অসুখ করেছে। রাজবৈদ্য বললেন—রাজা আর বাঁচবেন না।

রাজা ডাকলেন তাঁর বিশ্বাসী চাকরকে, বললেন,—জীবন, তোমাকে আমি সবার চেয়ে বেশী বিশ্বাস করি। আমি তো চললাম। আমার ছেলে রইল। তাকে তোমার হাতে সঁপে দিয়ে গেলাম। দেখো তার যেন কোন অনিষ্ট না হয়।

রাজা মারা গেলেন। রাজার ছেলে রাজা হল। জীবন সব সময়েই তার পাশে পাশে থাকে। একদিন নতুন রাজা বললেন—রাজবাড়ীর কোথায় কি আছে সব আমি দেখব।

জীবন তাকে ঘরে ঘরে ঘুরে ঘুরে দেখায়। প্রকাণ্ড রাজবাড়ী, কত ঘর, কত বারান্দা, কত জিনিষ-পত্তর, কত সোনাদানা। সবার শেষে রাজপুত্র এল ছবিঘরে। কত রকমের কত ছবি টাঙানো আছে সেই ঘরে। একটি মেয়ের ছবি দেখে রাজপুত্র বলল—এ কে?

—এ সুবর্ণপুরীর রাজকন্যা।

—এই কন্যাকে আমি রাণী করব।

—কিন্তু এ যে মস্ত বড়লোকের মেয়ে। এদের সোনার বাড়ী, সোনার খাট-পালংক, সোনার সব-কিছু। তোমার মত গরীব রাজপুত্রকে এ ত বিয়ে করবে না।

—কেন, আমারও ত অনেক সোনা আছে। সেইসব সোনা নিয়ে আমি যাব।

—তাতে কিছুই হবে না।

—দেখি না, হয় কি না?

তখনই রাজপুত্রের হুকুম হল—একখানি জাহাজ সোনা দিয়ে মুড়ে দাও। জাহাজের যত জিনিসপত্র সব সোনা দিয়ে তৈরী করে দাও। আর তারই সঙ্গে সোনার সব খেলা-পুতুল তৈরী কর।

রাজ্যের বড় বড় স্যাকরারা দিন-রাত কাজ করতে লাগল। দেখতে দেখতে সব কিছুই তৈরী হয়ে গেল। জাহাজ সাজিয়ে নিয়ে রাজপুত্র একদিন ভেসে পড়ল সমুদ্রে।

কত দিন কত রাত পরে জাহাজ এসে লাগল সুবর্ণপুরীর ঘাটে। জীবন সোনার খেলা-পুতুলগুলি হাতে নিয়ে জাহাজ থেকে নামল। বরাবর গেল রাজবাড়ীর দরজায়। দরজায় দাঁড়িয়েছিল একটি মেয়ে, তাকে ডেকে বলল—আমি বিদেশী সদাগর, পুতুল বেচি। রাজকন্যা যদি পুতুল কেনেন তাহলে তাকে এইগুলি দেখাও গে।

মেয়েটি রাজকন্যার সহচরী। পুতুলগুলি নিয়ে সে বাড়ীর ভিতরে চলে গেল। একটু পরেই বেরিয়ে এসে বলল—রাজকন্যা আপনাকে ডাকছেন, ভিতরে আসুন।

জীবন ভিতরে গেল।

রাজকন্যা বলল—এই পুতুল আমি সব কিনব। আর কি আছে?

জীবন বলল—অনেক কিছু আছে, কত রকমের কত জিনিষ, জাহাজ ভর্তি।

—নিয়ে এস। সব দেখব।

—সে কি, আর আনা যায়? জাহাজ থেকে সবকিছু এখানে আনতে অনেক দিন লেগে যাবে। সে সময় আমাদের কোথা? তার চেয়ে আপনিই একবার চলুন না জাহাজে, দু'দণ্ডে সব ঘুরে দেখে আসবেন।

রাজকন্যা একটু ভাবল, তারপর বলল—বেশ, তাই চল।

সদাগরের সঙ্গে রাজকন্যা এল জাহাজে।

রাজকন্যা জাহাজে উঠে ঘুরে ঘুরে পুতুলগুলো দেখছে, এদিকে রাজপুত্র ইশারা করে দিল, জাহাজে পাল তুলে দিল, হেলেছুলে জাহাজ গিয়ে পড়ল মাঝ দরিয়ায়।

সব দেখা যখন শেষ হল তখন রাজকন্যা চমকে উঠল—এ কী? আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? এখনি জাহাজ তীরে ভেড়াও, না হলে আমি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে এখনি ডুবে মরব।

রাজপুত্র বলল—তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি আমার রাজ্যে। সেখানে আমি তোমাকে রাণী করব।

রাজকন্যা কাঁদে। রাজপুত্র তাকে বোঝায়। জাহাজ চলতে থাকে। জাহাজের ছাদে বসে জীবন বাঁশী বাজায়।

একদিন রাতে জীবন বাঁশী বাজাচ্ছে, এমন সময় পালের মাথায় এসে বসল দুই ব্যাংগমা-ব্যাংগমী। ব্যাংগমা বলল—এই জাহাজে রাজপুত্তুর রাজকন্যাকে নিয়ে যাচ্ছে।

ব্যাংগমী বলল—কিন্তু রাজকন্যাকে সে রাণী করতে পারবে না।

—কেন? দেশে গিয়ে বিয়ে করলেই ত রাজকন্যা রাণী হবে।

—বিয়ে হবে না, তার আগেই রাজপুত্র মারা পড়বে। জাহাজ থেকে নেমে যে ঘোড়ার পিঠে সে উঠবে, সেই ঘোড়া তাকে পিঠ থেকে ফেলে দেবে, তাতেই রাজপুত্র মারা যাবে।

—রক্ষে পাবার কোন উপায় নেই?

—রাজপুত্র সেই ঘোড়ার পিঠে ওঠার আগেই, সেই ঘোড়ার মুণ্ডু কেটে ফেলতে হবে। তবে তাতেও রক্ষা নেই। রাজপুত্রের জন্যে যে বরের পোষাক তৈরী হয়েছে সেই পোষাকে বিষ মাখানো আছে। পোষাক পরলেই রাজপুত্র গা জ্বালা করে মারা যাবে।

—রক্ষে পাবার কোন উপায় নেই?

—আছে, যদি কেউ সেই পোষাকটা পুড়িয়ে ফেলতে পারে। তবে তখনও সব বিপদ কাটবে না। আরও আছে। বিয়ের পরে রাজকন্যা বাসরঘরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে। খানিক পরেই সে মরে যাবে।

—রক্ষে পাবার কোন উপায় নেই ?

—আছে, যদি কেউ তখনই রাজকন্যার বুক চিরে তিন ফোঁটা রক্ত বের করে দিতে পারে তাহলে রাজকন্যা বেঁচে যাবে। কিন্তু যে এসব কাজ করবে সে যদি কোন রকমে কারও কাছে এইকথা প্রকাশ করে তাহলে সে পাষাণ হয়ে যাবে।

জীবন সব শুনল। ব্যাংগমা ব্যাংগমী উড়ে চলে গেল। জীবন বলল—যাই হোক, রাজপুত্রকে আমি রক্ষা করবই।

ক'দিন পরে জাহাজ এসে লাগল রাজপুত্রের রাজ্যে। রাজবাড়ীতে খবর গেল। রাজপুত্রকে নিয়ে যাবার জন্য এল ঘোড়া, রাজকন্যাকে নিয়ে যাবার জন্য এল ডুলি। রাজপুত্র জাহাজ থেকে নামল। কিন্তু সেই ঘোড়ার পিঠে চড়ার আগেই জীবন ছুটে গিয়ে তলোয়ারের এক কোপে ঘোড়াটিকে কেটে ফেলল। সবাই অবাক হল, বলল —এ কি ?

জীবন বলল—বেশ করেছি, যা !

রাজপুত্র কিছু বলল না, অন্য ঘোড়ায় চড়ে বাড়ী এল।

জীবন রাজপুত্রের পাশে পাশে আছে।

পরদিন রাজপুত্রের বিয়ে। বিয়ের পোষাক তৈরী হয়ে এল। লাল মখমলের পোষাক। জীবন পোষাকটা দেখেই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল। সবাই বলল—এ কি ?

জীবন বলল—বেশ করেছি, যা।

রাজপুত্র কিছু বলল না, অন্য পোষাক পরে বিয়ে করতে গেল।

বিয়ের শেষে বর-কনে এল বাসর জাগতে, জীবনও বসে রইল ঘরের এক কোণে। রাজকন্যা কথায় কথায় খানিক পরে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল।—কি হল ? এ কি হল ?

জীবন তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ছোরা বের করে অচেতন রাজকন্যার বুকে একটা খোঁচা মারল। কয়েক ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে এল; রাজকন্যাও জ্ঞান ফিরে পেল। সবাই বলল—এ কি ?

জীবন বলল—বেশ করেছি, যা

রাজপুত্র এবার বলল—বারবার তোমার পাগলামি সহেছি, কিন্তু অজ্ঞান রাজকন্যার বুকে ছুরি মারা আমি সইব না।

জীবন বলল—আমি যা ভাল বুঝেছি, করেছি।

রাজপুত্র রক্ষীকে বলল—একে কয়েদখানায় রাখ গে, কাল সকালে রাজসভায় এর বিচার করব।

রক্ষীরা তখনই জীবনকে ধরে নিয়ে গেল।

পরদিন সকালে রাজা সভায় বসলেন। রক্ষীরা জীবনকে নিয়ে এল। রাজপুত্র বলল—কাল তুমি রাজকন্যার বুকে ছুরি মেরেছ কেন? সেই অপরাধে তোমার প্রাণদণ্ড হল।

জীবন বলল—মরতে আমাকে হবেই। তবে সব কথা আপনাকে খুলে বলেই মরা ভাল, আপনি শুনুন—

জীবন ব্যাংগমা-ব্যাংগমীর কথা বলল, হাঁটু অবধি তার পাষাণ হয়ে গেল। ঘোড়া কেটে ফেলার কথা বলল, কোমর অবধি পাষাণ হয়ে গেল। পোষাকের কথা বলল, বুক অবধি পাষাণ হয়ে গেল। রাজকন্যার বুকে ছুরি মারার কথা বলল, মাথা অবধি পাষাণ হয়ে গেল।

রাজপুত্র সেই পাষাণমূর্তি যত্ন করে রেখে দিলে তার শোবার ঘরে।

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। রাণীর একটি ছেলে হল। ছেলেটি ধীরে ধীরে বড় হল। ছেলে খেলতে শিখল, চলতে শিখল, কথা বলতে শিখল। একদিন ছেলেটি জীবনের পাষাণমূর্তির পানে তাকিয়ে বলল—বাবা, এই পাষাণের মূর্তিটা শোবার ঘরে কেন? এটা বাগানে সাজিয়ে রাখ!

রাজপুত্র বলল—না, এ আমার একান্ত বিশ্বাসী অনুচরের পাষাণমূর্তি। ও এখানেই থাকবে। সারা জীবন ও আমার পাশে পাশেই ছিল, আজও আমার কাছে আমার চোখের সামনে থাকবে।

সেই সময়ে সহসা পাষাণমূর্তি কথা বলে উঠল—পাষাণ আবার রক্তমাংসের মানুষ হতে পারে মহারাজ, যদি আপনার পুত্রের রক্ত দিয়ে এই পাষাণকে স্নান করাতে পারেন।

রাজা চমকে উঠল, রাণী চমকে উঠল। ছেলেকে কেটে ফেলে তার রক্ত দেওয়া কি সহজ! কিন্তু তখনই আবার রাজার মনে হল জীবন ত তাদেরই জীবন রক্ষা করতে নিজের জীবন দিয়েছে, সেই ঋণ শোধ করা কি রাজার উচিত নয়? রাজা রাণী অনেক ভাবলে, অনেক আলোচনা করলে, শেষে স্থির করলে জীবনের ঋণ শোধ করতে হবে—তারা রাজকুমারকে কেটে সেই রক্তে পাষাণকে স্নান করাবে।

রাজা তৈরী হল রাজপুত্রকে কেটে ফেলার জন্য। রাজা যেই তলোয়ার তুলেছে অমনি পাষাণ আবার মানুষ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি রাজার হাত ধরে বলল—থাক্ থাক্ মহারাজ, আপনার সদিচ্ছাতেই আমার মুক্তি হয়েছে।

রাজারাণীর তখন ত ভারী আনন্দ!—

উপকার করেছে যে এই জীবনে
ঋণ তার শোধ দেবে বল কেমনে?
কি করিব তার লাগি, কি করিতে পারি?
সব দিব তারি তরে—সে যে উপকারী।

জেলে আর জেলেনী

এক ছিল জেলে। সমুদ্রে সারাদিন সে মাছ ধরত। একদিন তার জালে পড়ল প্রকাণ্ড এক মাছ। জাল টেনে মাছটিকে তুলতেই মাছটি মানুষের মত কথা বলে উঠল—বাবা, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি এক রাজপুত্র, এক ডাইনী আমাকে যাদু করেছে।

জেলে ত অবাক, মাছে কথা কয়! তাড়াতাড়ি সে মাছটিকে জলে ফেলে দিলে।

বাড়ী এসে জেলে স্ত্রীর কাছে বলল—আজ একটা মাছ ধরেছিলাম সে মাছ কথা কয়!

জেলে-বৌ বললে—সে তাহলে মাছেদের দেবতা। তাকে ছেড়ে দিলে? তার কাছ থেকে কোন বর চেয়ে নিলে না কেন?

জেলে বলল—কি বর চাইব?



জেলে-বৌ বললে—আমরা এই কুঁড়ে-ঘরে থাকি। আমাদের জন্যে একখানি বাড়ী চেয়ে নিলে পারতে। কাল যখন যাবে সেই মাছকে ডেকে একখানি বাড়ী চেয়ে নিও।

পরদিন মাছ ধরতে গিয়ে সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে জেলে বলল—

ওগো মাছ, ওগো মাছ, ওঠো জলে ভেসে
দেখা দাও জলের দেবতা, একটিবার এসে।
জেলে-বৌ বলে দিলে,—যদি কৃপা কর,
গরীব মোরা, দাও না তবে একটা কোন বর॥

মাছটি ভেসে উঠল, বলল—কি চাই বল?

জেলে বলল—আমাদের একখানি বাড়ী দাও।

মাছ বলল—বেশ কুঁড়ে-ঘরের জায়গায় একখানি বাড়ী করে দিলাম।

জেলে বাড়ী ফিরল। দেখে সত্যি কুঁড়ে-ঘরের জায়গায় একখানি বাড়ী হয়ে গেছে। বাড়ীর মধ্যে বৈঠকখানা, শোবার ঘর, উঠানে গরু, পিছনে ফুলের বাগান। জেলে ত ভারী খুসি, বলল—বাঃ, চমৎকার!

দিন যায় একদিন জেলে-বৌ বলল—এই বাড়ীটা নেহাৎ ছোট, বাগানটাও ছোট। তুমি আবার যাও, মাছকে ডেকে বলগে আমাদের একখানি বড় বাড়ী করে দিতে।

জেলে বলল—কেন, এ ত বেশ আছি।

জেলে-বৌ বলল—তুমি ত ভারী বোকা, গিয়ে একবার বল না।

কাজেই জেলেকে আবার যেতে হল। সাগরের তীরে গিয়ে সে ডাকল—

ওগো মাছ, ওগো মাছ, ওঠো জলে ভেসে,
দেখা দাও জলের দেবতা একটিবার এসে।
জেলে-বৌ বলে দিল, যদি কৃপা কর,
গরীব মোরা দাওনা তবে একটা কোন বর॥

মাছ ভেসে উঠল, বলল—জেলে-বৌ কি চায় বল?

জেলে বলল—যদি আমাদের একখানি অট্টালিকা দাও ত বেশ হয়।

মাছ বলল—বেশ, তোমাদের বাড়ীকে একটি অট্টালিকা করে দিলাম।

জেলে বাড়ী ফিরল। দেখে সত্যি প্রকাণ্ড এক অট্টালিকা, কত ঘর, কত দাসদাসী। কত বড় বাগান, কত ছাগল ভেড়া হরিণ খরগোস সেই বাগানে। জেলে বলল—বাঃ, চমৎকার!

দিন যায়। আবার একদিন জেলে-বৌ বলল—শুধু এতো বড় বাড়ী কি হবে? আমাদের জমিদারী চাই, আমরা রাজা হব। তুমি মাছকে গিয়ে বলগে আমাদের রাজা করে দিতে।

জেলে বলল—কেন, এ ত বেশ আছি, আমি রাজা হতে চাই না।

জেলে-বৌ বলল—তুমি রাজা হতে চাও না আমি রাজা হব, তুমি যাও।

কাজেই জেলেকে আবার যেতে হল সাগরের তীরে, ডাকল—

ওগো মাছ, ওগো মাছ, ওঠো জলে ভেসে,
দেখা দাও জলের দেবতা একটিবার এসে।
জেলে-বৌ বলে দিল, যদি কৃপা কর,
গরীব মোরা, দাও না তবে একটা কোন বর॥

মাছ ভেসে উঠল, বলল—জেলে-বৌ কি চায় বল?

জেলে বলল—আমার বউ রাজা হতে চায়।

মাছ বলল—বেশ, তোমার বউকে আজ থেকে রাজা করে দিলাম।

জেলে বাড়ী ফিরল। দেখে বিরাট রাজবাড়ী, ফটকে নহবৎ বাজছে, কত সৈন্য-সামন্ত, রাজসভায় সোনার সিংহাসনে বসে আছে জেলে-বৌ, মাথায় সোনার মুকুট, চারপাশে চারজন মেয়ে তাকে চামর দুলিয়ে বাতাস করছে। জেলে বলল—বাঃ, চমৎকার!

দিন যায়। আবার একদিন জেলে-বৌ বলল—না, রাজা হয়ে সুখ নেই, আমি সম্রাট হব।

জেলে বলল—কেন, এ ত বেশ আছি।

জেলে-বৌ বলল—ওসব বাজে কথা রাখো। আমি রাজা, আমার হুকুম মেনে চল। মাছের কাছে গিয়ে বলগে, 'সম্রাট করে দাও।'

জেলে বলল—আমি সম্রাট হতে চাই না।

জেলে-বৌ বলল—তুমি সম্রাট না হও আমি হব।

কাজেই জেলেকে আবার যেতে হল সাগরের তীরে, ডাকল—

ওগো মাছ, ওগো মাছ, ওঠো জলে ভেসে,
দেখা দাও জলের দেবতা একটিবার এসে।
জেলে-বৌ বলে দিল, যদি কৃপা কর,
গরীব মোরা, দাও না তবে একটা কোন বর।

মাছ ভেসে উঠল, বলল—জেলে-বৌ কি চায় বল?

জেলে বলল—জেলে-বৌ সম্রাট হতে চায়।

মাছ বলল—বেশ, তাকে আমি সম্রাট করে দিলাম।

জেলে বাড়ী ফিরল। দেখে রাজসভায় জেলে-বৌ বসে আছে, হীরা বসানো এক সিংহাসনে। চারপাশে খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে সিপাই-সান্ত্রী পাহারা দিচ্ছে। যত রাজা-মহারাজা বসে আছে তার সামনে। জেলে বলল—বাঃ, চমৎকার!

দিন যায়। আবার একদিন জেলে-বৌ বলল—আবার যাও মাছের কাছে, বলগে—'আমাকে পৃথিবীর রাজা করে দাও।'

জেলে বলল—মাছ কি করে তোমাকে পৃথিবীর রাজা করবে?

জেলে-বৌ বলল—ঠিক করবে, তুমি যাও না।

কাজেই জেলে আবার এল সমুদ্রের তীরে, ডাকল—

ওগো মাছ, ওগো মাছ, ওঠো জলে ভেসে
দেখা দাও জলের দেবতা একটি বার এসে।
জেলে-বৌ বলে দিল যদি কৃপা কর,
গরীব মোরা, দাওনা তবে একটা কোন বর॥

মাছ ভেসে উঠল, বলল—জেলে-বৌ আবার কি চায়?

জেলে বলল—জেলে-বৌ পৃথিবীর রাজা হতে চায়।

মাছ বলল—বেশ, আমি তাকে পৃথিবীর রাজা করে দিলাম।

জেলে বাড়ী ফিরল। দেখে দু'মাইল উঁচু এক পাহাড়ের মত সিংহাসনের উপর জেলে-বৌ বসে আছে। মাথায় তার তেমনি বড় এক মুকুট। মুকুটের মাণিকগুলি ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলছে। আর কত রাজা-মহারাজা যে দাঁড়িয়ে আছে চারপাশে কে তা গুণবে?

জেলে বলল—বাঃ, চমৎকার!

দিন যায়। আবার একদিন জেলে-বৌ বলল—সবই হল, এখন আর দুটি জিনিস পেলেই হয়।

জেলে বলল—কি কি?

জেলে-বৌ বলল—চাঁদ আর সূর্য। তুমি মাছের কাছে গিয়ে বলগে, সে যেন চাঁদ আর সূর্য আমাকে এনে দেয়। আমার ইচ্ছামত দিন রাত হবে।

জেলে বলল—তা কখনও হতে পারে?

জেলে-বৌ বলল—আমি পৃথিবীর রাজা আমার আদেশ মেনে চল, তর্ক করো না, যাও।

জেলে আবার এল সমুদ্রের তীরে, ডাকল—

ওগো মাছ, ওগো মাছ, ওঠো জলে ভেসে,
দেখা দাও জলের দেবতা একটিবার এসে।
জেলে-বৌ বলে দিল, যদি কৃপা কর,
গরীব মোরা, দাও না তবে একটা কোন বর॥

মাছ ভেসে উঠল, বলল—জেলে-বৌ এবার কি চায়?

জেলে বলল—জেলে-বৌ বলেছে চাঁদ আর সূর্যকে এনে দাও, তার ইচ্ছামত দিন রাত হবে।

মাছ বলল—ঠিক আছে, তুমি বাড়ী ফিরে যাও, জেলে-বৌ সেই কুঁড়ে-ঘরেই ফিরে যাক্, সেই কুঁড়ে-ঘরই তার ভাল।

জেলে বাড়ী ফিরে এল। দেখে কোথায় সেই অট্টালিকা আর কোথায়-বা সেই সিপাই-সান্ত্রী লোকজন। আগে যেমন কুঁড়ে-ঘর ছিল, সে-ই কুঁড়ে-ঘর। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জেলে-বৌ কাঁদছে।

জেলে বলল—এবার খুসি হলে ত!

আজ অবধি জেলে আর জেলেনী সেই কুঁড়ে-ঘরেই আছে।—

মানুষ যত পায়
ততই শুধু চায়—
আশার শেষ নেই, যতই দাও,
কোথায় সীমা তার
ভাবে না কোন বার,
যা নাই দরকার, চাহিবে তাও।

দৈত্য ও দরজী

এক দরজীর হঠাৎ সখ হল সে তীর্থে যাবে। বেরিয়ে পড়ল সে বাড়ী থেকে। সঙ্গে নেবার মত কিছুই তার ছিল না। যা ছিল সবই সে নিলে তাঁর কাঁধের ঝোলায়—দু'একটা জামা-কাপড়, একটু পনীর আর একটা মুরগী।

ঘাট-মাঠ বন-জঙ্গল পার হয়ে সে চলল। সারাদিন পথ চলে সে এসে পড়ল এক পাহাড়ের পাশে। পাহাড়ের মাথায় বসেছিল এক দৈত্য, দরজীকে দেখে বলল—তুমি কে গো? কোথা থেকে আসছ?

দরজী ভয় পেয়েছিল, কিন্তু তখন ত আর পালানর উপায় নেই,

মুখে সাহস দেখিয়ে বলল—নমস্কার দৈত্যমশাই, কেমন আছেন ?

—তুমি কে ? কোথা থেকে আসছ ?

—আমি সাধুসন্ন্যাসী মানুষ, তীর্থ করতে বেরিয়েছি।

—তুমি সাধু ? সাধুর পরণে এত জামাকাপড়, কাঁধে ঝোলা আর হাতে লাঠি থাকে ? সাধুরা ত কৌপীন পরে, গায়ে ছাই মাখে। আমি সাধু চিনি না ভাবছ ? তুমি ভণ্ড !

—বেশ, তবে তাই। তোমার সঙ্গে এখন আমার ঝগড়া করার ইচ্ছে নেই, আমি এখন এখানে বসে খানিক জিরুব।

দরজী বসে পড়ল দৈত্যের কাছে।

এতটুকু মানুষের এমন সাহস দৈত্য আর কখনও দেখেনি। বলল—তুমি বলছ তুমি সাধু, আমি যা করতে পারি তুমি তা পার ?

—কি পারতে হবে বল দিকি ?

—এই পাথরটা নিংড়ে আমি জল বের করব, দেখ—দৈত্য একটা বড় পাথর কুড়িয়ে নিয়ে দু'হাতের মধ্যে এমনভাবে চেপে ধরল যে, পাথরখানি হাতের মধ্যে চুপসে গিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়তে সুরু করল।

দরজী বলল—এই কথা ! এ ত অতি সামান্য ব্যাপার।

দৈত্যের সামনে সে একখানি ছোট পাথর কুড়িয়ে নিলে, তারপর চকিতে সেটাকে চোখের আড়ালে ফেলে দিয়ে, ঝোলার ভিতর থেকে পনীরটা কখন্ হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে নিলে। তারপর ধীরে ধীরে চাপ দেয়, আর পনীর থেকে টস্ টস্ করে জল পড়ে। বলল—কী ! ভারী কঠিন কাজ, না ?

দৈত্য নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। খানিক ভেবে সে বলল—বেশ, এবার আমি যা করছি কর দিকি ?

দৈত্য একখানি পাথর ছুঁড়ে দিলে বহুদূরে।

দরজী হেসে বলল—খুব হয়েছে। যা ছুঁড়লে তা ত মাটিতে পড়ে গেল, আমি যা ছুঁড়ব তা মাটিতে পড়বে না।

থলির ভিতর থেকে মুরগীটা বের করে সে ছুঁড়ে দিলে আকাশে।

মুরগী চকিতে গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। দরজী বলল—দেখলে ত?

দৈত্য বলল—বেশ, তুমি কেমন কাজ করতে পার দেখি, বনে চল।

দরজীকে সঙ্গে নিয়ে দৈত্য বনে এল। একটা প্রকাণ্ড অশথ গাছ উপড়ে ফেলে বললে—এটাকে নিয়ে চল।

দরজী বলল—তুমি গোড়াটা ধর, আমি আগাটা ধরি। আগাটাতেই ডালপালা বেশী, আগাটারই ভার বেশী।

দৈত্য গোড়া ধরে গাছটি টেনে নিয়ে চলল, দরজী আগার ডালপালার আড়ালে একটি ডালেব উপব চুপ কবে বসে বইল। বনের বাইরে এসে দৈত্য বলল—এইখানেই এখন থাক্, পরে বাড়ী নিয়ে যাব।

ডালপালার আড়াল থেকে দবজী বেরিয়ে এল, বলল—এতেই ক্লান্ত হয়ে পড়লে? অতবড় শবীবটা করেছ শুধু লোক দেখানো? কাজ কখনও ফেলে রাখতে আছে? যেটা করার এখনি শেষ কর। আমি নেহাৎ বেঁটে মানুষ তাই, নাহলে আমি একাই গাছটাকে টেনে নিয়ে যেতাম।

দৈত্য লজ্জা পেল, গাছটি টেনে নিয়ে চলল তার বাড়ীতে। বাড়ীর দরজায় এসে দৈত্য হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—এই আমার বাড়ী।

দরজী বলল—তুমি যে খুব কাজেব লোক তা ত বুঝলাম, এইটুকু কাজ করতেই তোমার জিভ্ বেরিয়ে গেল। যাক্, এখন কিছু খেতে দাও দিকি, আমার বড় খিদে পেয়েছে।

দৈত্য ঘরের ভিতর থেকে কিছু ফলমূল এনে দিলে। দরজী তৃপ্তি করে খেলে। সন্ধ্যা তখন হয়ে এসেছে। বলল—এবার আমাকে একটু শোবার জায়গা দাও, কাল সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমি চলে যাব।

দৈত্য তাকে শোবার ঘরে নিয়ে গেল। খাটের উপর বিছানা পাতা ছিল, দরজী বিছানার উপরে শুয়ে পড়ল।

এদিকে দৈত্য মনে মনে ভয়ানক চটেছে। একটা ক্ষুদে মানুষ এসে তাকে সব বিষয়ে হারিয়ে দিলে, এ ত সহ্য হয় না! এই মানুষটাকে এখনি শেষ করতে হবে। দুপুর রাতে একটা লোহার ডাণ্ডা নিয়ে সে ঘরে ঢুকল, অন্ধকারে তাগ্ বুঝে ডাণ্ডার এক ঘা বসিয়ে দিলে বিছানার উপর। এবার আর দেখতে হবে না, ব্যাটা খতম হয়ে গেল। মনের আনন্দে দৈত্য ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। এদিকে দরজী ভারী চালাক, সে ভেবেছিল দৈত্য যদি রাতে কোন রকম শয়তানি করে, বিছানার উপর না শোয়াই ভাল, কার মনে কি আছে জানা ত নেই। সে খাটের নীচে শুয়েছিল। দৈত্য যখন খাটের উপর ডাণ্ডা মেরে গেল, সেই শব্দে দরজীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। দৈত্য ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই দরজীও ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। চাঁদের আলোয় মাঠের উপর দিয়ে সে এগিয়ে চলল যেদিকে দু'চোখ যায়।

সকালে সে এসে পড়ল এক নগরে। নগরের পথে তখন রাজার লোক ঢেঁড়া পিটছে—যে দৈত্য মারতে পারবে, রাজা তাকে অর্ধেক রাজ্য বক্‌শিষ দেবেন।

দরজী শুনল, বলল—আমি দৈত্য মারব, নিয়ে চল আমাকে রাজার সভায়।

রাজার সভায় এসে দরজী বলল—আমি দৈত্য মারব।

রাজা বললেন—বেশ, তোমার কত সৈন্য চাই, ক'টা হাতী ঘোড়া চাই, কি কি অস্ত্র চাই, বল? দৈত্যরা এখানে বড় অত্যাচার করছে, আজই তাদের মারতে হবে।

দরজী বলল—আমার কিছুই চাইনে মহারাজ, যদি মারতে পারি ত একাই মারতে পারব। শুধু আমাকে একখানি ভাল তলোয়ার দিন।

তলোয়ার কোমরে ঝুলিয়ে, ঝোলায় রুটি-জল নিয়ে দরজী আবার রওনা হল বনের দিকে।

বনের মধ্যে এসে সব চেয়ে উঁচু একটা তালগাছের মাথায় সে চড়ে

বসল। সেখান থেকে চারিপাশে তাকিয়ে দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে হঠাৎ তার চোখে পড়ল এক গাছেব নীচে দুটি দৈত্য শুয়ে আছে। একটিকে সে ত চেনে, আরেকটি বোধ হয় তারই সঙ্গী। দরজী এবার গাছ থেকে নেমে এল। কাঁধের ঝুলিটা ছোট ছোট নুড়িতে ভর্তি করে আবার গাছে গিয়ে উঠল। তারপর সেই গাছের উপর থেকে একটিব পর একটি পাথর ছুঁড়ে মারতে লাগল একজন দৈত্যকে তাগ্ করে।

কয়েকটি পাথর গায়ে পড়তেই সেই দেত্যটি ত' উঠে বসল, পাশের ঘুমন্ত সঙ্গীকে ধাক্কা দিয়ে বলল—আমাকে পাথর মারছিস্ কেন?

—তুই কি স্বপ্ন দেখছিস্ নাকি? আমি তোকে পাথর মারব কেন?

আবার দু'জনে শুয়ে পড়ল।

এবার দরজী দ্বিতীয় দৈত্যকে তাগ্ কবে পাথর ছুঁড়তে লাগল। কয়েকটি পাথর গায়ে লাগতেই দ্বিতায় দৈত্য লাফিয়ে উঠল, বলল—এবার তুই আমাকে মাবছিস্ কেন?

—আমি কেন তোকে পাথর মারব, তুই এবার স্বপ্ন দেখছিস্।

দু'জনে আবার শুয়ে পড়ল।

দরজী এবার প্রথম দৈত্যকে তাগ্ করে পাথর ছুঁড়ল। কয়েকটা পাথর লাগতেই প্রথম দৈত্য লাফিয়ে উঠল, বলল—এ ভারি খারাপ, এ আমি কিছুতেই সইব না, কেন তুই আমাকে ঘুমুতে দিবি না?

ঠাস্ করে দ্বিতায় দৈত্যের গালে সে এক চড় বসিয়ে দিলে।

দ্বিতীয় দৈত্য লাফিয়ে উঠল,—একি? মারলি কেন?

—বেশ করেছি।

—বটে!

দুই দৈত্যে মারামারি বেধে গেল। সে ভীষণ মারামারি—কিল চড় লাথি, শেষে পাথর ছোঁড়া, গাছের ডাল ভেঙ্গে নিয়ে ঠেঙানো, —কিছুই বাকি রইল না। মারামারি করে দুই দৈত্যই মারা পড়ল।

এবার দরজী গাছ থেকে নামল। রাজসভায় এসে বলল—মহারাজ, দুই দৈত্যকে মেরেছি, বনে গিয়ে দেখে আসুন।

রাজা ত অবাক। বললেন—দৈত্য মারলে তা তোমার ত কোথাও কোন চোট্ লাগেনি?

—আমাকে স্পর্শ করবে সে সাধ্য কোন দৈত্যের নেই।

রাজা তবু বিশ্বাস করতে পারলেন না। দরজীর সঙ্গে বনে গেলেন। নিজের চোখে দেখে তবে তাঁর বিশ্বাস হল। দরজী বলল—এবার অর্ধেক রাজ্য আমায় দিন।

এক কথায় অর্ধেক রাজ্য দিয়ে দেওয়া সহজ নয়। রাজা বললেন—রাজ্য চালান ত সহজ নয়, তোমার শক্তি ও সাহসেব একটা পরীক্ষা করতে চাই।

—কি বলুন?

—আমার বাগানে একটা ভালুক আছে, সেই ভালুকের কাছে তোমাকে এক রাত থাকতে হবে। কাল সকালে যদি বেঁচে ফিরে আসতে পার, তাহলে তোমাকে অর্ধেক রাজ্য দেব।

দরজী বলল—বেশ, তাই থাকব, আপনি শুধু আমাকে একটি বেহালা আর খানিকটা দড়ি দিন।

সন্ধ্যাবেলা দড়ি আর বেহালা নিয়ে দরজী গেল রাজার বাগানে। বাগানের একপাশে বসে দরজী বেহালা বাজাতে সুরু করল। বাজনার শব্দ শুনে ভালুক দৌড়ে এল। মানুষটাকে মারার কথা ভুলে গেল। চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে অনেকক্ষণ শুনল। তারপর বাজনার তালে তালে সুরু করল নাচতে। দরজী যত জোরে বেহালা বাজায় ভালুক তত নাচে। সারা রাত বেহালা বাজিয়ে ভোরের দিকে দরজীর হাত টনটন করতে লাগল। তখন সে বাজনা থামাল। ভালুকও তখন নেচে নেচে ক্লান্ত। ধুপ্ করে সে বসে পড়ল দরজীর পাশে, বলল—তুমি ত ভাই চমৎকার বাজনা বাজাতে পার, আমাকে শেখাবে?

—কেন শেখাব না? তবে তোমার নখগুলি আগে কেটে ফেলতে হবে, নখে লাগলে বেহালার তার ছিঁড়ে যাবে।

—বেশ, নখ আমি কেটে ফেলব।

দরজী বসল ভালুকের নখ কাটতে। একটু একটু নখ কাটে আর দড়িটা ভালুকের পায়ে জড়ায়। দেখতে দেখতে ভালুকের চারটি পা-ই দড়িতে বাঁধা পড়ল। ভালুক বলল—এ কী?

দরজী বলল—নখ কাটার এই নিয়ম।

তারপর সকালবেলা রাজবাড়ীতে গিয়ে দরজী খবর দিলে—ভালুককে আমি বেঁধে রেখে এসেছি, মহারাজ!

দেখে-শুনে রাজা আর কি বলবেন, অর্ধেক রাজ্য দিতে হল দরজীকে। দরজী রাজা হল।—

বুদ্ধিমানের সর্বক্ষেত্রে জয় হয়।
খ্যাতি-সাফল্য বুদ্ধিমানেই করে জয়॥

বুড়ো-আংলা

এক ছিল কাঠুরে। কাঠুরের কোন ছেলেমেয়ে ছিল না। কাঠুরের বৌ একদিন দুঃখ করে বলল—আমাদের যদি একটি ছেলে থাকত—সামান্য বুড়ো আঙুলের মত ছোট্ট একটি ছেলে তাহলেও আমরা কত সুখী হতাম।

কাঠুরে বলল—সত্যি কথা, ছেলেমেয়ে না থাকলে বাড়ীঘর কেমন যেন খা-খা করে।

কিছুদিনের মধ্যেই কাঠুরের বৌ-এর ইচ্ছা পূর্ণ হল। কাঠুরের এক ছেলে হল। ছোট্ট ছেলেটি, মাত্র বুড়ো আঙুলের মত লম্বা। কাঠুরে বলল—তা হোক্, এখন ছোট আছে, ভালমত খাওয়ালেই লম্বা-চাওড়া হবে।

কিন্তু অনেক খাইয়েও ছেলেটির শরীর আর বাড়ল না। বাপ-মা তার নাম রাখল—বুড়ো আংলা।

একদিন বুড়ো-আংলা বলল—বাবা, আমিও তোমার সঙ্গে বনে যাব।

কাঠুরে গরু নিয়ে যাচ্ছিল বনে। গরুর পিঠে কাঠ বোঝাই করে সে ফিরবে। কাঠুরে বলল—তুই যাবি কি করে? গরুর পিঠ থেকে যদি পড়ে যাস্?

বুড়ো-আংলা বলল—তুমি আমাকে গরুব কানেব মধ্যে বসিয়ে দাও, আমি ঠিক গরুগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব।



কাঠুরে বলল—বেশ, দেখি!

কাঠুরে গরুর কানের মধ্যে বুড়ো-আংলাকে বসিয়ে দিলে। বুড়ো-আংলা গরুর কানের মধ্যে বসে হাঁক দিলে—হট্ হট্ হট্। গরু চলতে সুরু করল। সামনের গরুটা যে পথে যায়, পিছনের গরুটাও সেই পথে যায়। কাঠুরে আগে চলল, বুড়ো-আংলা পিছু পিছু হাঁকিয়ে নিয়ে চলল।

পথ দিয়ে আসছিল দুটি লোক। ব্যাপার দেখে তারা ত অবাক। কাঠুরে অনেকটা পথ এগিয়ে গেছে। গরু দুটি চলেছে। সঙ্গে কোন লোক নেই। অথচ শোনা যায়—ডি হট্ হট্ হট্। একজন বলল—ব্যাপারটা কি? গরু দুটি হাঁকাচ্ছে কে বলত? লোক নেই, অথচ গলা শোনা যাচ্ছে।

অপর জন বলল—আমি ত তাই ভাবছি। শেষ অবধি গিয়ে দেখতে হবে ব্যাপারটা কি।

লোক দুটি বরাবর গরু দুটির পিছু পিছু বনে এসে পড়ল। বনের মাঝে এসে বুড়ো-আংলা বলল—বাবা, এবার আমাকে নামিয়ে নাও।

কাঠুরে গরুর কানের ভিতর থেকে বুড়ো-আংলাকে নামিয়ে দিলে। বুড়ো-আংলা ঘাসের উপর লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করতে লাগল।

লোক দুটি খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর একজন বলল—একে যদি কোন রকমে সহরে নিয়ে যাওয়া যায়,

তাহলে একে দেখার জন্য খুব ভীড় হবে, আমরা যদি টিকিট বিক্রি করি, তাহলে লাখপতি হয়ে যাব।

অপর জন কাঠুরের কাছে গিয়ে বলল—ওই ছেলেটিকে তুমি বেচবে? আমি কিনব।

কাঠুরে বলল—ছেলে কি কেউ বেচে?

লোকটি বলল—আমি তোমাকে অনেক টাকা দেব।

বুড়ো-আংলা কাঠুরের কাঁধে উঠে কানের কাছে চুপিচুপি বলল—কেন বাবা 'না' বলছ, টাকা নাও, আমি আবার ক'দিন পরেই ঠিক ফিরে আসব।

কাঠুরে বলল—কি দাম দেবে?

লোকটি একতাল সোনা দেখিয়ে বলল—এই সোনা দেব।

কাঠুরে বলল—বেশ, দাও।

কাঠুরে বুড়ো-আংলাকে বেচে দিলে। লোক দুটি বুড়ো-আংলাকে বলল—তুমি কোথায় বসবে বল?

বুড়ো-আংলা বলল—আমাকে কাঁধে বসিয়ে দাও, আমি সব দেখতে দেখতে যাব।

বুড়ো-আংলা একজনের কাঁধে বসে চলল।

সারাদিন চলতে চলতে সন্ধ্যাবেলা দু'জনে এসে পৌঁছাল এক মাঠের ধারে। দু'জনে বলল—এখানে একটু বসে জিরিয়ে নেই, তারপর আবার যাব।

দু'জনে এক গাছতলায় বসল।

বুড়ো-আংলাকে তারা বসিয়ে দিলে ঘাসের উপর। কাছেই ছিল একটা ইঁদুরের গর্ত, বুড়ো-আংলা গিয়ে ঢুকে পড়ল সেই গর্তের মধ্যে, বলল—আমি চললুম বন্ধু, নমস্কার!

লোক দুটি চারিপাশে তাকিয়ে দেখল, কোথাও বুড়ো-আংলাকে দেখতে পেলে না। অনেক খোঁজাখুঁজি করে তাকে না পেয়ে হতাশ হয়ে তারা চলে গেল।

বুড়ো-আংলা এবার গর্ত থেকে বেরুল কি করে আবার বাপের

কাছে ফিরে যাবে, এই হল তার ভাবনা। একটা বড় শামুকের খোলা পড়েছিল, তারই উপর বসে বসে সে ভাবতে লাগল।

সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল দু'জন চোর। একজন বলল—ওই বড়লোকের বাড়ীতে আজ চুরি কবব, ওর অনেক সোনা-দানা আছে।

আরেকজন বলল—কিন্তু কি করে চুরি কবব?

বুড়ো-আংলা বলল—আমি সব ব্যবস্থা কবে দোব।

চোর দু'জন চমকে উঠল—তাই ত, কে কথা বললে?

বুড়ো-আংলা বলল—আমি গো আমি।

চোর বলল—কে তুমি? কোথায় তুমি?

বুড়ো-আংলা বলল—এই যে আমি, ঘাসের উপর।

এবার চোর দু'জন বুড়ো-আংলাকে খুঁজে পেলে। একটি চোর বুড়ো-আংলাকে হাতে তুলে নিয়ে বলল—তুই ত এতটুকু মানুষ, তুই কি করবি?

বুড়ো-আংলা বলল—আমি জানালা দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে যাব, তোমরা যা চাইবে তাই ছুঁড়ে দেব তোমাদের হাতে।

চোব বলল—তা মন্দ নয়, তুই চল।

চোর দু'জন এল গাঁয়ের এক বাড়ীতে। জানালা দিয়ে বুড়ো-আংলা ভিতরে গিয়ে নামল। তারপর চেঁচিয়ে বলল—এ ঘরে যা কিছু আছে সব কি তোমাদের চাই?

তার চীৎকার শুনে চোর দু'জন ভয় পেয়ে গেল, বলল—আস্তে, চুপিচুপি কথা বল।

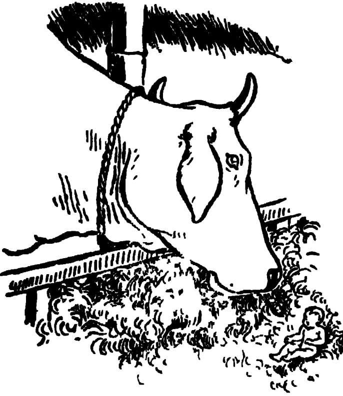
বুড়ো-আংলা আরো চেঁচিয়ে বলল—এই ঘরের সব-কিছুই কি আমি তোমাদের দোব? বেশ, হাত বাড়াও, ধর।

বারান্দায় চাকর ঘুমুচ্ছিল, চীৎকাব শুনে তার ঘুম ভেঙে গেল, সে ছুটে এল। চোর দু'জন বেগতিক দেখে সরে পড়ল। চাকর আলো জ্বাললে, কিন্তু কাউকে ঘরের মধ্যে দেখতে পেলে না। সে ভাবল—ভবে কি স্বপ্ন দেখলাম। সে আবার গিয়ে বারান্দায় শুয়ে পড়ল।

বুড়ো-আংলা এবার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। সামনেই ছিল

খড়ের গাদা। এই খড়ের মধ্যে লুকিয়ে দিব্যি রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যাবে, এই ভেবে বুড়ো-আংলা সেই খড়ের মধ্যে ঢুকে শুয়ে পড়ল।

ভোর হতে না হতেই বুড়ো-আংলা চমকে উঠল। একটা গরু খড় টেনে খেতে সুরু করেছে। সে পালাবার পথ পেলে না, গরুটি খড় শুদ্ধ তাকে মুখে তুলে নিলে। কোন রকমে গরুর দাঁতের ফাঁক দিয়ে বুড়ো-আংলা সুরুৎ করে পিছলে গেল গরুর পেটের মধ্যে। উঃ, সেখানে কী অন্ধকার! তা হোক, গরুর পেটের মধ্যে এক কোণে সে একটু জায়গা করে নিলে। কিন্তু সেখানে থাকবার জো কি! গরু যত খড় খায়, তত পেট বোঝাই হয়ে ওঠে, বুড়ো-আংলার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। শেষে সে চীৎকার করতে সুরু করল—আর খড় দিও না, আর খড় খাব না।



গোয়ালিনী এসেছিল গরু দুইতে, সে চমকে উঠল—গরু বলছে 'আর খড় দিও না, আর খড় খাব না।' দুধের বালতি ফেলে দিয়ে সে হাঁউমাঁউ করে উঠল। বাড়ীর লোকেরা ছুটে এল, তারাও শুনল—গরু কথা বলছে—'আর খড় দিও না, আর খড় খাব না।' তাহলে ত নিশ্চয়ই গরুকে দানোয় পেয়েছে। তখনই তারা গরুটাকে মেরে ফেললে। মরা গরু তারা ফেলে দিয়ে গেল ভাগাড়ে।

বুড়ো-আংলা গরুর পেট থেকে বেরুবার জোগাড় করছে এমন সময় একটা নেকড়ে বাঘ এসে গরুর ঘাড়ের খানিকটা মাংস খেয়ে ফেললে, বুড়ো-আংলাও সেই সঙ্গে চলে গেল নেকড়ে বাঘের পেটের মধ্যে। গরুর পেটের মধ্যে যে বিপদ ঘটেছিল, বাঘের পেটের মধ্যেও তেমনি বিপদ ঘটতে পারে ভেবে, বুড়ো-আংলা বলল—ও বাঘ, বাঘ, আমার একটা কথা শুনবে?

বাঘ বলল—কি বল ?

বুড়ো-আংলা বলল—এই মরা গরু খাও কেন ? আমার সঙ্গে চল, আমি তোমাকে জ্যান্ত ছাগল আর মুরগী খাওয়াব।

বাঘ বলল—কোথায় যেতে হবে ?

বুড়ো-আংলা বলল—চল, আমি সেই বাড়ী দেখিয়ে দোব।

বুড়ো-আংলা বাঘকে নিয়ে এল বরাবর তার নিজের বাড়ীতে। বলল—বাড়ীর পিছনে একটা ছোট নালা আছে, সেখান দিয়ে ঢোকো, তারপর যত ইচ্ছে খাও।

বাঘ নালা দিয়ে ঢুকে পড়ল। তারপর একটা জ্যান্ত ছাগল ধরে খেল। বুড়ো-আংলা এবার চীৎকার জুড়ল—বাঘ এসেছে গো, বাঘ এসেছে !

বাড়ীর লোক জেগে উঠল, বাঘ পালাতে গেল, কিন্তু ছাগল খেয়ে তার পেটটি তখন মোটা হয়ে গেছে, নালার ছোট ফুকর দিয়ে সে আর পালাতে পারল না। কাঠুরে এসে কুড়ুলের এক কোপে বাঘের মুণ্ডু কেটে ফেলল। বুড়ো-আংলা এবার বাঘের পেট থেকে বেরিয়ে এল। বলল—বাবা, আমি ফিরে এসেছি।

কাঠুরে বলল—কি করে এলি ?

বুড়ো-আংলা সব কথা বলল।

মা ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে চুমু খেয়ে বললেন—আর তোকে কখনও অন্য লোকের কাছে ছাড়ব না, বাবা।

নতুন জামা-কাপড় পরে সেজে-গুজে বুড়ো-আংলা আবার মা'র কাছে খেলা করতে বসল।—

বাইরে দেখে ছোট বড় বল যে,
বড় ছোট যায় না চেনা সহজে।

রামদাসের বেহালা

এক চাষীর একটি চাকর ছিল। তিন বছর কাজ করেও চাকরটি একটি পয়সা মাইনে পায়নি। একদিন তার মনে হল যে, মাইনে না পেলে সে আর কাজ করবে না। কর্তার কাছে গিয়ে সে বললে—আপনার কাছে তিন বছর কাজ করেছি, আমার যা মাইনে হয় দিন।

চাষী ছিল বেজায় কৃপণ, সে জানত চাকরটি খুব ভাল মানুষ, টাকা-পয়সার হিসাব ভাল বোঝে না। তিনটি আনি বের করে চাষী চাকরটিব হাতে দিয়ে বলল—এই নাও, এক এক বছরের মাইনে এক এক আনা করে।

চাকবটি ভাবল—এই তিন আনা পয়সাই অনেক, সে এবার রীতিমত বড়লোক হয়ে গেছে। বলল—কর্তা, আমি এবার দিন কতক দেশ-বিদেশ ঘুরে আসি।

তিনটি আনি ট্যাঁকে গুঁজে চাকরটি বেরিয়ে পড়ল। মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে সে পথ দিয়ে চলল। কিছুদূর যাবার পর মাঠের ধারে এক গাছতলায় এক বামনের সঙ্গে দেখা। বামন বলল—কি গো রামদাস, খুব ত গান গাইতে গাইতে চলেছ, এত আনন্দ কিসের?

চাকরটির নাম রামদাস। রামদাস হেসে বলল—কেন আনন্দ করব না, ট্যাঁকে পয়সা আছে, মেজাজ ভাল আছে। তিন বছরের মাইনে একসঙ্গে পেয়েছি তা জান?

বামন বলল—কত পয়সা আছে?

রামদাস বলল—নগদ তিন আনা।

বামন বলল—ওই তিন আনা পয়সা তুমি আমাকে দিয়ে যাও, আমি বড় গরীব, আমার দিন চলা ভার, খেতে পাই না।

—তুমি খেতে পাও না? বেশ, নাও তিন আনা পয়সা—বলে রামদাস তখনই বামনকে তিন আনা পয়সা দিয়ে দিলে।

বামন বলল—বাঃ, তোমার মনটা ত খুব ভাল, তিন বছরের

রোজগার তুমি এক কথায় আমাকে দিয়ে দিলে? বেশ, তুমি কি চাও বল, তোমাকে আমি তিনটি বর দোব। এক এক আনার জন্য এক একটি বর।

রামদাস বলল—টাকা পয়সা আমার দরকার নেই, তুমি আমাকে দাও একটি তীর-ধনুক, সেই ধনুক থেকে যাকেই আমি তীর মারব তাকেই বিঁধবে।

বামন বলল—বেশ, আর কি?

রামদাস বলল—একটি বেহালা দাও, সেটি যখনই আমি বাজাব, যে শুনবে সেই নাচবে।

বামন বলল—বেশ, আর কি?

রামদাস বলল—আর, আমি যার কাছ থেকে যা চাইব তাকে তাই দিতে হবে।

বামন বলল—বেশ, তাই হবে।

বামন তখন রামদাসকে তীরধনুক আর বেহালা এনে দিলে। রামদাস আবার মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে চলল।



তেপান্তরের মাঠ পার হয়েই এক বুড়োর সঙ্গে দেখা। দাড়ীওলা বুড়ো তাকিয়েছিল একটি গাছের মাথায়। রামদাসকে দেখেই সে বলল—দেখছ কেমন সুন্দর পাখীটি! কেমন মিষ্টি ডাকছে! ওই পাখীটি আমাকে ধরে দিতে পার?

রামদাস বলল—পাখীটা ধরে দিলে আমায় কি দেবে?

দাড়ীওলা বলল—টাকা দোব।

রামদাস তখনই তার ধনুক ধরে একটি তীর ছুঁড়ল। তীরটি পাখীর গায়ে লাগল, পাখীটি নীচের একটি ঝোপের মধ্যে পড়ে গেল।

দাড়ীওলা বুড়ো গেল পাখীটিকে ধরার জন্য।

রামদাস সেই সময় বেহালা বাজাতে সুরু করল। বেহালা বাজল আর বুড়ো নাচতে শুরু করল। বেহালা যত বাজে, বুড়ো তত নাচে। পাখীটি সেই ফাঁকে উড়ে গেল। নাচতে নাচতে বুড়োর কাপড়-জামা ঝোপের ডালপালায় লেগে ছিঁড়ে গেল। বুড়োর কপালে ঘাম দেখা দিল। বুড়ো বলল—দোহাই বাবা, তোর বেহালা থামা।



রামদাস বলল—বনের পাখী আপন মনে গান গাইছিল, তুমি তাকে ধরতে চাইলে কেন?

বুড়ো বলল—অন্যায় হয়েছে বাবা, তুই যা চাইবি তাই দোব, বেহালা থামা।

রামদাস বলল—কত টাকা দেবে?

বুড়ো বলল—দশ টাকা দোব।

রামদাস বলল—না। আরো চাই।

বুড়ো বলল—কিশ টাকা? ত্রিশ টাকা? চল্লিশ টাকা? পঞ্চাশ টাকা?

রামদাস বলল—না না, আরও চাই।

শেষ অবধি বুড়ো একশো টাকা দিতে রাজী হল।

রামদাস বেহালা থামাল। বুড়োর কাছ থেকে একশোটি টাকা গুনে নিয়ে আবার মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে চলল।

এদিকে সেই দাড়ীওলা বুড়ো নগরে গিয়ে রাজার কাছে নালিশ করল—এক বেহালা-বাজিয়ে ভিখারী আমার একশো টাকা চুরি করেছে, মহারাজ বিচার করুন।

রাজা তখনই আদেশ দিলেন—ধরে আনো সেই বেহালা-বাজিয়েকে।

তখনই সিপাই-সান্ত্রী ছুটল, পথ থেকে ধরে আনল রামদাসকে।

রাজা বললেন—রামদাস, তুমি এর টাকা চুরি করেছ কেন?

বামদাস বলল—মহারাজ, আমার বেহালা বাজানো শুনে খুসি হয়ে সে আমাকে একশো টাকা পুরস্কার দিয়েছে।

রাজা বললেন—বেহালা বাজানো শুনে একশো টাকা পুবস্কার? এও হয় নাকি কখনও? তুমি চুরি কবেছ। চুরিব শাস্তি ফাঁসী। তোমার ফাঁসী হবে।

সিপাই-সান্ত্রীবা রামদাসকে তখনই ধরে নিয়ে চলল মশানে। সেখানে তার ফাঁসী হবে। রাজাও চললেন ফাঁসী দেখতে। সঙ্গে চলল যত পাত্র-মিত্র।

ফাঁসীর মঞ্চে উঠে বামদাস বলল—মহারাজ, আর একটু পরেই ত আমি মরে যাব, আপনি আমাব একটা শেষ মিনতি রাখবেন?

মহারাজ বলল—কি বল?

রামদাস বলল—আমি শেষবারের মত জীবনের সাধ একবার বেহালাটা বাজাতে চাই, আপনারা শুনুন।

দাড়ীওলা বুড়ো বলল—মহাবাজ, ও কাজটি করবেন না।

মহারাজ বললেন—মবাব আগে একবার বেহালা বাজাতে চায়, বাজাক্। কতক্ষণ আর বাজাবে!

বামদাস বেহালা ধবল। বেহালাব সুব উঠতেই সবাই দুলতে সুরু কবল, তাবপব সুরু হল নাচ। বেহালা বাজে, আর বাজা পাত্র-মিত্র সিপাই-সান্ত্রী ও দাড়িওলা বুড়ো নাচে। বেহালাব সুর যত চড়ে, নাচ তত বাড়ে। নাচতে নাচতে কপালে ঘাম দেখা দিল, তবু নাচ থামে না। রাজা বললেন —দোহাই বাবা, নাচ থামাও।



রামদাস বলল—আমার ফাঁসীর হুকুম মাপ করুন।

রাজা বললেন—আমি কথা দিচ্ছি তোমার ফাঁসী হবে না।

রামদাস বলল—আর আমায় কিছু বকশিষ দেবার ব্যবস্থা করুন।

রাজা বললেন—তোমাকে একশো মোহর বকশিষ দোব।

রামদাস বলল—আর ওই দাড়ীওলা বুড়োর বিচার করুন। ও আমাকে মিছামিছি চোর বলেছে, ও আমাকে নিজে হাতে একশো টাকা বকশিষ দিয়েছে।

রাজা বললেন—এখনই এখানেই বিচার করব।

রামদাস বেহালা থামাল।

রাজা তখনই দাড়ীওলা বুড়োকে বললেন—তুমি নিজে হাতে ওকে একশো টাকা দিয়েছ?

বুড়ো এবার ভয়ে ভয়ে বলল—হ্যাঁ, মহারাজ।

রাজা বললেন—এত টাকা তুমি কোথায় পেলে?

দাড়ীওলা বলল—এক বড়লোকের বাড়ী থেকে চুরি করেছিলাম মহারাজ।

রাজা বললেন—বটে, নিজে চুরি করে অন্য লোককে চোর বলছ? তোমারই ফাঁসী হবে। তুমি চোর।

দাড়াওলা বলল—আমায় ক্ষমা করুন মহারাজ।

রাজা বললেন—না। তুমি চোর আবার মিথ্যাবাদী, তোমার ফাঁসী হবে।

তখনই রাজার হুকুমে সিপাই-সান্ত্রী এসে দাড়ীওলাকে ধরে ফাঁসী দিয়ে দিলে।

রাজার কাছ থেকে একশো মোহর বকশিষ নিয়ে মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে রামদাস আবার পথ চলতে সুরু করল।—

দুষ্ট লোক চলে দুষ্ট ম(?)লবে
নিজের তরে করে বহু অন্যায়।
জানে না সে বিচার যেদিন হবে
করতে হবে সেদিন—শুধুই হায়, হায়॥

গাঁয়ের পাশেই পাহাড়, তারপরেই গভীর বন। গাঁয়েব লোক বলে—ওই বনে যত পরী আর বামন থাকে, তাদের রাজা রাজত্ব করেন ওখানে। পরাণ নামে এক রাখাল সেখানে রোজ ছাগল চরাতে যায়।

বনের ধারে খোলা মাঠে ছাগলগুলোকে ছেড়ে দিয়ে একটি গাছের ছায়ায় বসে সে ঘুমিয়ে নেয়। সন্ধ্যাবেলা ঘুম থেকে উঠে ছাগল-গুলিকে ডাকে, তারপর ছাগলের পাল নিয়ে নেমে আসে পাহাড় থেকে। এই তার নিত্যকর্ম। পূজা-পার্বণ নেই, ছুটিছাটা নেই।

একদিন বিকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে পরাণ সব ছাগল ডেকে জড়ো করছে, কিন্তু সাদা রঙের রামছাগলটা ত নেই। সেটা আবার কোথায গেল? পরাণ কতবার ডাকল, কোন সাড়া নেই। ছাগলটাকে কি তাহলে বাঘে নিয়ে গেল নাকি? কিন্তু এ বনে ত বাঘ নেই। তাহলে?

পরাণ বনের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। এদিক ওদিক ঘুবতে ঘুবতে হঠাৎ তার নজরে পড়ল, পাহাড়ের মাঝে এক গুহা। পবাণ গুহাব মধ্যে উঁকি মেবে দেখে, বামছাগলটি ছোলা খাচ্ছে। গুহাব মধ্যে এখানে এত ছোলা এল কোথা থেকে? পবাণ গুহাব মধ্যে ঢুকল।

গুহার মধ্যে একটি দরজা। দরজার পাশে দাঁডিযেছিল একজন লোক, পবাণকে দেখে বলল—ভিতরে এস।

পরাণের আরো ভিতবে যাবাব ইচ্ছা ছিল না তবু কেন জানি না সে ভিতরে ঢুকে পড়ল। ভিতরে সুন্দর ফুলের বাগান। চাঁদেব আলো। বাগানের মাঝখানে ক'জন লোক বসে পাশা খেলছে। পরাণকে দেখেই তারা কাছে ডাকল, বলল—বস, এক হাত খেলে যাও।

খেলবে কি, পরাণ তখন ভয় পেয়েছে, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসার জন্য সে বলল—আমার বড় খিদে পেয়েছে, বাড়ী যাই।

—খিদে পেয়েছে, তার জন্য কি? এ-ই সরবৎ লাও—!

একটি লোক এক ঘটি সরবৎ এনে দিলে পরাণের হাতে। কর্তা বলল—খাও!

পরাণ সরবৎ পান করল। ভারী মিষ্টি সরবৎ। খেয়েই পরাণের শরীর চনমন করে উঠল। মনে ফুর্তি লাগল। কর্তা বলল—নাও, এবার খেলতে বস।

পরাণ বসে গেল খেলতে।

খেলা চলল অনেকক্ষণ। রাত গভীর হল। শেষে খেলা যখন শেষ হল, পরাণের তখন ভারী ঘুম পেয়েছে, বলল—এইখানেই শুয়ে একটু ঘুমিয়ে নিই, কাল সকালে বাড়ী ফিরব।

কর্তা বলল—বেশ ত, ঘুমোও না।

পরাণ শুল আর ঘুমাল।

ঘুম যখন ভাঙল, তখন সকাল হয়েছে। চোখ মেলে পরাণ দেখে, কোথায় বা ফুলের বাগান আর কোথায় বা কি! গভীর বনের মাঝে সে ঘুমুচ্ছে, তার চারিপাশে দু'হাত-তিনহাত করে ঘাস তাকে ঢাকা দিয়ে দিয়েছে। তাড়াতাড়ি সে উঠে পড়ল। বন থেকে বেরিয়ে এসে দেখে, মাঠে একটাও ছাগল নেই, কোথায় গেল সব?

পরাণ টুকটুক করে পাহাড় থেকে নেমে এল। পাহাড়ের নীচেই ত গ্রাম। কিন্তু গাঁয়ের বাড়ীঘর ত একখানাও চেনার উপায় নেই, গাঁয়ের মানুষও সব নতুন। এক রাতে সব বদলে গেল নাকি?

হন হন করে পরাণ গেল নিজের বাড়ীতে। ফটক পার হতেই একটা কুকুর খ্যাঁক্ করে তার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ল। পরাণ বলল—আরে বাঘা!

বাঘা কিন্তু পরাণকে চিনল না, বাড়ী ঢুকতে দিলে না।

এদিকে বাড়ীর লোক বেরিয়ে এল, বললে—কাকে চাই? কোথা থেকে আসছ?

—আমি যে এখানকারই লোক। এই ত সোনারপুর।

—হ্যাঁ। কোন্ বাড়ীর মানুষ তুমি? কাকে চাও?

কাকে চাই?—চট্ করে পরাণের মাথায় একটা নাম এল—হরি কামার?

—হরি কামার? সে আবার কে?

পরাণের চারিপাশে তখন ভীড় জমে গেছে। সবাই ত অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তার কথা শুনে। পরাণ বলল—হরি কামার এখানে থাকে না?

এক বুড়ী এবার এগিয়ে এসে বলল—হ্যাঁ হ্যাঁ, হরি কামার এখানে থাকত, সাত বছর আগে সে মারা গেছে।

—সাত বছর আগে মারা গেছে?—পরাণ থতিয়ে গেল, বললে—তিনকড়ি তাঁতী?

—তিনিও গত হয়েছেন দশ বছর হল।

পরাণের মুখে আর কথা জোগাল না, চুপ করে তাকিয়ে রইল।

বুড়ী জিজ্ঞাসা করলে—তা তুমি কে বাপু, কতদিন আসনি এই গাঁয়ে?

—আমি এখানকারই লোক, আমার নাম পরাণ মালী।

—পরাণ মালী, যে ছাগল চরাত?

—হ্যাঁ, আমিই সে-ই।

—সে ত বিশ বছরের কথা। সে একদিন ছাগল চরাতে গিয়ে আর ফিরল না। কত লোক তাকে খুঁজে এল, কোথাও পেলে না। তা কোথায় ছিলে তুমি এদ্দিন?

বিশ বছর! সহসা একটা দম্‌কা হাওয়ায় পরাণের সাদা দাড়িগুলো উড়তে থাকে, দাড়িতে হাত দিয়ে পরাণ দেখে, এক হাত লম্বা পাকা দাড়ি গজিয়ে গেছে তার মুখে। পরাণ দাড়িতে হাত বুলায় আর ভাবে—তাইত!

ভীড়ের ভিতর থেকে একটি মেয়ে ভাল করে পরাণের মুখের পানে তাকিয়ে বলল—বাবা? এতদিন কোথায় ছিলে বাবা? এস এস, ভিতরে এস।

বিশ বছর পরে মেয়ের হাত ধরে পরাণ বাড়ী ঢুকল।—

দিন চলে যায়, সময় বহে যায়,
লাভ-লোকসান সুখ-দুঃখের ধারা—
হিসাব রেখে যা কিছু যে পায়
জানে না সে কোথায় হয় তা হারা।

নীল আলো

এক ছিল সিপাই। রাজার কাছে সে কাজ করত। অনেকদিন কাজ করল, রাজা কিন্তু মাইনে দিলেন না। একদিন চাকরি ছেড়ে দিয়ে সৈনিক রওনা হল বাড়ীর দিকে।

নানা কথা ভাবতে ভাবতে সিপাই চলেছে। চলতে চলতে এসে পড়ল এক বনের মাঝে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। অন্ধকারে বনের মাঝে দেখে এক জায়গায় নীল আলো দেখা যাচ্ছে। আলোটা আসছিল এক কুঁড়ে ঘরের ভিতর থেকে। সে ঘরে থাকত এক ডাইনী। সিপাই সেখানে এসে বলল—একটা রাত থাকাব মতো একটু জায়গা দেবে?

ডাইনী বুড়ী কোন সাড়া দিলে না। সিপাই কিন্তু নাছোড়বান্দা। শেষে ডাইনী বলল—বাতটুকু তোমাকে আমি থাকতে দিতে পারি, তবে কাল সকালে উঠে আমার বাগানে গাছের গোড়াগুলি খুঁড়ে দিতে হবে।

সিপাই বলল—বেশ, তাই দোব।

পরদিন সকালে সিপাই বাগানের গাছ খুঁড়তে সুরু রল। সব বাগানটা পবিষ্কার করতে তার লাগল সারাদিন। সন্ধ্যাবেলা সে এত ক্লান্ত হয়ে পড়ল যে আর নড়তে ইচ্ছা করে না। ঘরে ফিরে এসে বলল—আজ রাতেও আমি এখানে থাকব।

ডাইনী বলল—তা থাকতে পার, কিন্তু এর জন্য কাল আমাকে এক গাড়ী কাঠ কেটে দিতে হবে।

সিপাই বলল—বেশ, তাই দোব।

পরদিন সকালে সিপাই গেল কাঠ কাটতে। জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে একখানি গাড়ী বোঝাই করতেই তার দিন কেটে গেল। সন্ধ্যাবেলা সে এত ক্লান্ত হয়ে ফিরে এল যে আর নড়তে ইচ্ছা করে না। ডাইনীকে বলল—আজ রাতেও আমি এখানে থাকব।

ডাইনী বলল—তা থাকতে পার, কিন্তু এর জন্য কাল সকালে কূয়া থেকে আমার নীল আলোটা তুলে দিতে হবে।

সিপাই বলল—বেশ, তাই দোব।

পরদিন সকালবেলা ডাইনী সিপাইকে নিয়ে গেল কূয়াতলায়। কোমরে একটি দড়ি বেঁধে সিপাইকে নামিয়ে দিলে কূয়ার মধ্যে। শুকনো কূয়া, নীচে একটি নীল বাতি জ্বলছিল। বাতিটি নিয়ে সিপাই দড়ি ধরে টানল, বলল—আমাকে উপরে তুলে নাও।

ডাইনী সিপাইকে উপরে টেনে তুলল। কূয়ার মুখের কাছে যখন সে এসেছে তখন ডাইনী বলল—দাও, বাতিটা আমাকে দাও।

সিপাই বলল—আগে আমি কূয়ার উপরে উঠি, তারপর দোব।

ডাইনী বলল—না, তুমি আগে দাও।

সিপাই বলল—না, উপরে না উঠে আমি দোব না।

ডাইনী রেগে গেল, বলল—ঠিক আছে, তাহলে কূয়ার মধ্যেই থাকো।

ডাইনী দড়ি ছেড়ে দিলে। সিপাই ঝুপ করে একেবারে কূয়ার নীচে গিয়ে পড়ল। নীচে জল ছিল না, শুধুই পাঁক। সিপাই পাঁকের উপর বসে পড়ল। ভাবল, এই কূয়ার মধ্যেই তাকে মরতে হবে। চুপ করে সে বসেই রইল।

এভাবে বসে থাকতে ভাল লাগে না। কূয়ার মধ্যে বড় অন্ধকার। পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে সে ধরাল। বিড়ির ধোঁয়ায় অন্ধকার আরো জমাট বাধল। তখন নীল বাতিটা সে জ্বেলে দিলে।

বাতিটা জ্বালাতেই ধোঁয়ার মধ্যে থেকে একটি বামন বেরিয়ে এল। কালো কুচকুচে তার গায়ের রং, মুখে এক মুখ দাড়ি, অন্ধকারে তাকাতে ভয় করে। বামন বলল—তুমি আমাকে ডাকলে কেন?

সিপাই বলল—আমি ত তোমাকে ডাকিনি।

বামন বলল—এই নীল বাতি যার, আমি তার চাকর। বাতি জ্বাললেই আমাকে আসতে হয়। আমায় কি করতে হবে বল?

সিপাই বলল—তাহলে ভাই, একটা কোন উপায় কর দিকি, যাতে আমি কূয়া থেকে উপরে উঠতে পারি।

চোখের নিমেষে বামন সিপাইর একখানি হাত ধরে তাকে উপরে তুলে আনল।

সিপাই নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। তারপর বলল—আমার আর একটা কাজ কর ভাই, ওই ডাইনী বুড়ী আমাকে কূয়ার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল, তুমি ওকে আমার জায়গায় বসিয়ে দাও গে।

চোখের নিমেষে বামন ডাইনী বুড়ীকে ধরে এনে কূয়ার মধ্যে নামিয়ে দিলে।

ডাইনী বুড়ীর ঘরে অনেক সোনা-দানা ছিল। সিপাই যত পারল পকেটে বোঝাই করল। তারপর বামনকে বলল—ভাই, এবার আমাকে বন পার করে দাও।

চোখের নিমেষে বামন সিপাইকে বনের বাইরে নিয়ে এল।

সিপাই বলল—এবার ভাই তোমার ছুটি।

বামন বলল—দরকার হলেই বাতি জ্বালবে, আমি আসব।

সৈনিক ত মহা খুসি। নগরে গিয়ে ভাল ভাল জামা কাপড় কিনলে। সরাইখানায় গিয়ে সবচেয়ে ভাল ঘরখানি ভাড়া নিলে। রাজার হালে সে কয়েকদিন দিব্যি ঘুরে-ফিরে বেড়াল। তারপর একদিন নীল বাতি জ্বেলে ডাকল সেই বামনকে। বামন বলল— বলুন কি করতে হবে?



সিপাই বলল—দেখ ভাই, এই রাজার কাছে আমি অনেক দিন চাকরি করেছিলাম, কিন্তু আমাকে একটি পয়সাও মাইনে দেয়নি। তাই ঠিক করেছি এই রাজাকে খানিক জব্দ করতে হবে। রাজার একটা মেয়ে আছে, তাকে ধরে নিয়ে এসো আমার কাছে। যেমন—তখন আমাকে মাইনে দেয়নি, এখন তেমনি অর্ধেক রাজ্য নেব তবে ছাড়ব।

বামন তখনই হাওয়ায় মিশে গেল, চোখের নিমেষে রাজকন্যাকে

নিয়ে এল সরাইখানার সেই ঘরে। রাজকন্যা ঘুমুচ্ছিল, ঘুম ভেঙ্গে গেল, চোখ মুছে উঠে বসল, বলল—আমি কোথায়?

সিপাই বলল—তোমাকে ধরে এনেছি, তোমার বাবা আমাকে টাকা দেয়নি, অর্ধেক রাজ্য দিলে তোমাকে ছেড়ে দোব।

রাজকন্যা কাঁদতে স্থুরু করল।

বামন বলল—রাজকন্যাকে তুমি কোথায় লুকিয়ে রাখবে? কাল সকালেই ত রাজার সিপাই নগরময় খোঁজ করবে, তখন?

সিপাই বলল—সত্যি ত, তাহলে রাজকন্যাকে রেখে এস।

চোখের নিমেষে বামন আবাব রাজকন্যাকে নিয়ে গেল।

পরদিন সকালে রাজকন্যা রাজাকে বলল—রাত্রিব সব ঘটনা।

রাজা বললেন—কোন্ বাড়ী, কোন্ লোক তা ত কিছুই বুঝা গেল না। বাড়ীটা ত খুঁজে বের করতে হবে।

সেই রাত্রে বাজকন্যা জামাব পকেটে একটি ফুটো কবলে, তাবপব সেই পকেটে ভরে রাখলে যত ছোলা।

রাত্রে সৈনিক নীল বাতি জ্বেলে ডাকল বামনকে, বলল—বাজ-কন্যাকে আবার নিয়ে এস।

বামন চোখের নিমেষে রাজকন্যাকে নিয়ে এল। তারপর বামন বলল—কাজটা কিন্তু ভাল হচ্ছে না, রাজা জানতে পাবলে তুমি খুব বিপদে পড়বে।



সিপাই বলল—রাজা আমাকে মাইনে দেয়নি, এখন অর্ধেক রাজ্য আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। তবে রাজকন্যাকে ছাডব।

বামন বলল—রাজকন্যাকে লুকিয়ে রাখবে কোথায়?

সিপাই বলল—সে কথা সত্যি, তাহলে রাজকন্যাকে রেখে এস

বামন চোখের নিমেষে আবার রাজকন্যাকে রেখে এল

এদিকে যে পথ দিয়ে রাজকন্যা এসেছিল, সে পথে পকেটের সব ছোলা ছড়িয়ে দিয়েছিল। ভোর হতে না হতেই পাখীর ঝাঁক এসে সব ছোলা খেয়ে গেল।

রাজকন্যা সকালে রাজাকে সবকথা বলল। রাজা তখনই লোক পাঠালেন। কিন্তু সে লোক পথের উপর একটাও ছোলা খুঁজে পেলে না।

রাজা বললেন—বেশ, আজ রাত্রে জুতো পরে শুয়ে থাকবি। যদি আজ রাতেও তোকে বামন ধরে নিয়ে যায় তাহলে আসার সময় এক পাটি জুতো খুলে রেখে আসবি সেই ঘরে।

সে রাত্রে রাজকন্যা জুতো পরেই শুয়ে রইল।

রাত্রে সিপাই নীল বাতি জ্বেলে বামনকে ডেকে বলল—রাজকন্যাকে আবার নিয়ে এস।

চোখের নিমেষে বামন রাজকন্যাকে নিয়ে এল। তারপর বামন বলল—এবার তুমি সত্যি বিপদে পড়বে।

সিপাই বলল—রাজা আমাকে মাইনে দেয়নি, এখন অর্ধেক রাজ্য আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। তবে রাজকন্যাকে ছাড়ব।

বামন বলল—রাজকন্যাকে লুকিয়ে রাখবে কোথায়?

সিপাই বলল—সে কথা সত্যি, তাহলে রাজকন্যাকে রেখে এস।

চোখের নিমেষে বামন রাজকন্যাকে রেখে এল।

যাবার সময় রাজকন্যা একপাটি জুতো ফেলে রেখে গেল।

সকালবেলাই রাজা সৈন্য পাঠালেন নগরের ঘরে ঘরে খুঁজে দেখতে—কোথায় রাজকন্যার জুতো আছে। খুঁজতে খুঁজতে রাজার লোকেরা সরাইখানার ঘর থেকে রাজকন্যার জুতো বের করল। তারপর সিপাইকে বেঁধে নিয়ে গেল রাজার কাছে। রাজা বললেন—আজ একে জেলখানায় রাখ, কাল বিচার করব।

সিপাইকে জেলখানায় রাখা হল। নীল বাতিটা সিপাই ঘরে ফেলে রেখে এসেছিল। জেলখানার জানালায় বসে সে ভাবতে লাগল, কি করা যায়? এখন কি করে এখান থেকে ছাড়া পাবে?

জানালার সামনেই পথ। হঠাৎ দেখা গেল পথে তার চেনা একটি ছেলে চলেছে। সিপাই তাকে ডাকল, বলল—কি ভাই, চিনতে পার?



ছেলেটি হেসে বলল—নিশ্চয়ই, কতবার দেখেছি চিনব না?

সিপাই বলল—আমার একটা উপকার করবে ভাই?

—কি বল?—ছেলেটি বলল।

সিপাই বলল—তামাক খেতে ভারী ইচ্ছে করছে। সরাইখানায় আমার ঘরে হুঁকো, কল্‌কে. তামাক, কাঠকয়লা, দেশলাই আর নীল রঙের একটা বাতি আছে, এনে দেবে? তোমাকে একটা টাকা দোব।

ছেলেটি বলল—এখনই এনে দিচ্ছি।

সিপাই বলল—কোন জিনিষটি কিন্তু ভুলো না, তাহলে আবার যেতে হবে। হুঁকো, কল্‌কে, তামাক, কাঠকয়লা, দেশলাই আর নীল বাতি।

ছেলেটি চলে গেল। খানিক পরে সব-কিছু এনে দিল সিপাইকে। সিপাই তাকে একটি টাকা বকশিষ দিল।

নীল বাতিটা হাতে পেয়ে সিপাই মনে জোর পেলে। বসে বসে সে তামাক খেতে স্বরু করল।

পরদিন সকালে রাজসভায় সিপাইর বিচার হল।

রাজকন্যা বলল—এই সেই লোক।

রাজা বললেন—রাজকন্যাকে চুরি করে নিয়ে যায় এতো বড় সাহস! সিপাইর ফাঁসী দাও।

সিপাই হাত জোড় করে বলল—মহারাজ, আমার একটা নিবেদন আছে।

—বল কি বলবে?—রাজা বললেন।

সিপাই বলল—ফাঁসী যাবার আগে আমি শেষ এক কল্‌কে তামাক খেতে চাই।

রাজা হুকুম দিলেন—বেশ, তামাক খেয়ে নাও।

সিপাই টিকে ধরানোর ছল করে নীল বাতিটি জ্বালল। তখনই বামন এসে বলল—কি করতে হবে বল ?

সিপাই বলল—এই রাজা আমাকে মাইনে দেয়নি, ওকে তুলে আছাড় দাও। আর রাজসভার এই লোকগুলোকে আচ্ছা করে পেটাও।

বামন তখনই রাজাকে সিংহাসন থেকে তুলে মাটিতে ফেলে দিলে। আর রাজসভার লোকদের উপব স্নুরু হল কিল চড়। হুড়োহুড়ি হে চৈ পড়ে গেল।

রাজা উঠে বসলেন।

সিপাই বলল—রাজাকে আরেকটা আছাড় দাও।

রাজা হাত জোড় করে বললেন—দোহাই বাবা, আর মেরো না, কি করতে হবে বল ?

সিপাই বলল—তখন আমাকে মাইনে দাও নি, এখন আমাকে অর্ধেক রাজ্য দিতে হবে।

রাজা বললেন—শুধু রাজ্য কেন, রাজকন্যারও বিয়ে দেব তোমার সঙ্গে, আর মেরো না বাবা।

সিপাই বামনকে নিরস্ত করল।

সেইদিনই রাজকন্যার সঙ্গে সিপাইর বিয়ে হয়ে গেল। সিপাই অর্ধেক রাজ্যের রাজা হল। তার আর কোন দুঃখ রইল না।—

রাজা—তা সে বড় যতই হোক, মানুষ ছাড়া আর কিছু সে নয়।
খুসিমত করে যদি অন্যায়, চিরদিন সবাই কি তা সয়॥

সিপাই-রাজা

অনেকদিন কাজ করে এক সিপাই অনেক টাকা জমিয়েছিল। সেই টাকা নিয়ে সে দেশে চলল। তার সঙ্গী হল আব দু'জন সিপাই, তারা জানত এই সিপাই অনেক টাকা নিয়ে ফিবছে, সেই টাকাটা চুরি করাই ছিল তাদের মতলব।

তিনজনে একসঙ্গে চলল। • কত ক্ষেত, কত গ্রাম, কত মাঠ পাব হয়ে সন্ধ্যাবেলা তিনজনে এসে পৌঁছাল এক বনে। বন্ধু দু'জন বলল —চল, বনের ভিতর দিয়েই যাই, সোজা পথ আছে।

সিপাই বলল—না, রাতে বনেব ভিতব দিয়ে যাব না।

দুই বন্ধু বলল—কেন যাবে না, আমবা দু'জন যখন সঙ্গে যাচ্ছি?

কথায় কথায় বন্ধু দু'জন সিপাইয়েব সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিলে। এমনি একটা ছুতাই তাবা চাইছিল। ঝগড়াব মুখে তাবা সিপাইকে ধবে রীতিমত মাব দিলে। তাব দুটি চোখ কাণা কবে দিলে। তারপব তার টাকাব থলিটা কেড়ে নিয়ে, তাকে একটি গাছেব সঙ্গে বেঁধে বেখে, হাসতে হাসতে চলে গেল।



সিপাই বেচাবা বাঁধন খোলাব চেষ্টা কবল—কিন্তু পাবল না। শেষে সে মনে মনে ভগবানকে ডাকতে লাগল—হে ভগবান, তুমি আমার কপালে এতো দুঃখ লিখেছিলে। নিজের রোজগারের পয়সা নিয়ে বাড়ী ফিরছিলাম, তাও আমার সইল না। কবে কি পাপ করেছি জানি না, তুমি আমায় ক্ষমা কর।

এদিকে রাত বাড়তে থাকে।

সেই গাছের মাথায় থাকত এক কাক আর কাকী। রাতে কাক আর কাকী কথা বলছিল। কাকী বলল—আজকের খবর কি বলত?

কাক বলল—রাজকন্যার অসুখ করেছে, কোন ওষুধেই কোন কাজ হচ্ছে না। রাজা বলেছেন, যে রাজকন্যাকে সুস্থ করতে পারবে রাজা তারই সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দেবেন, আর দেবেন অর্ধেক রাজ্য। কিন্তু কিসে যে রাজকন্যা সারবে তা কেউ জানে না।

কাকী বলল—কিসে সারবে তা কিন্তু আমি জানি। ওই যে সামনে কালো কালো ফুলগুলি ফুটে আছে, ওই ফুল পুড়িয়ে ওর ছাই খেলে যে অসুখই হোক সেরে যাবে।

কাক বলল—সত্যি আমরা যা জানি, মানুষ যদি তা জানত! এই যে আজকে শেষ রাতে যে শিশির পড়বে, ঘাসের পাতা থেকে সেই শিশির তুলে যদি কেউ চোখে লাগায় তাহলে যতদিনেরই অন্ধ হোক্ সে চোখের দৃষ্টি ফিরে পাবে।

কাকী বলল—মানুষ তো কিছুই জানে না। এই যে এ বছর অনাবৃষ্টির জন্য নগরের লোকেরা হাহাকার করছে, কোথাও এতটুকু জল নেই। নদীটা অবধি শুকিয়ে এসেছে। কিন্তু বাজারের মাঝখানে যে পুরানো বটগাছটা রয়েছে তার গোড়াটা যদি কেউ খোঁড়ে, তাহলে ওখানে একটা ভাল জলের ঝরণা পায়, আর জলকষ্ট থ ক না।

কাকেরা কথা বলে, গাছের নীচে সিপাই সব কথা শুনতে পায়। নানাভাবে সে চেষ্টা করতে থাকে বাঁধনটা খুলে ফেলতে। অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পর সে বাঁধনটা খানিকটা আল্‌গা করতে পারে, তখন বাঁধনটা খুলে ফেলতে তার আর দেরী হয় না। তারপর ভোর হওয়া পর্যন্ত সেই গাছের নীচেই সে চুপ করে বসে থাকে।

বনের মাঝে পাখীর কিচিমিচি শুনে সে বুঝতে পারল ভোর হয়েছে। তাড়াতাড়ি ঘাসের পাতা থেকে একটু শিশির তুলে নিয়ে সে চোখে লাগাল। তখনই তার দৃষ্টি ফিরে এল। চোখ মেলেই সে দেখতে পেলে সামনে কালো ফুলে বন ছেয়ে গেছে। কয়েকটি ফুল তুলে নিয়ে কাঠকুটোর আগুনে সে পুড়িয়ে ফেলল, সেই ছাইগুলি

একটা কাগজের পুরিয়া করে রাখল পকেটে। তারপর ঘাসের উপর থেকে যতটা পারে শিশির কুড়িয়ে নিয়ে একটি বোতলে ভর্তি করল। তারপর চলল নগরের দিকে।

রাজসভায় এসে সিপাই বলল—রাজকন্যার অসুখ আমি সারাব।

সিপাই রাজকন্যাকে ওষুধ দিলে। ভস্ম খেয়ে রাজকন্যা সুস্থ হয়ে উঠল। সিপাই বলল—রাজামশাই, আমার পুবস্কার ?

সামান্য একটা সিপাইয়ের সঙ্গে মেয়েব বিয়ে দিতে কে চায় ? রাজামশাই বললেন—অর্ধেক রাজ্য নিয়ে তুমি করবে কি ? নগরে যা জলকষ্ট, নগরে আগে জলের ব্যবস্থা কর দিকি।

সিপাই নগরের পথে বেরিয়ে পড়ল। বরাবর চলে গেল বাজারে। বাজারের মাঝখানে অনেকদিনের পুরাণো একটি বটগাছ ছিল। সিপাই বলল—এই গাছের গোড়াটা খুঁড়লে জল পাওয়া যাবে।

নগরের লোকেরা তখনই গাছের গোড়া খুঁড়ে ফেললে। ঝর ঝর করে বেরিয়ে এল একটি ঝরণা।

সিপাই এসে বলল—মহারাজ, আমার পুরস্কার ?

রাজার আর কিছু বলার রইল না। রাজকন্যার সঙ্গে সিপাইর বিয়ে হয়ে গেল। রাজা অর্ধেক রাজ্য দিলেন। সিপাই রাজা হল। দিব্যি সুখে-স্বচ্ছন্দে তার দিন কাটতে লাগল।

দিন যায়। একদিন বিকালে সিপাই-রাজা বেড়াতে বেরিয়েছে, এমন সময় দেখে পথ দিয়ে তার সেই দু'জন বন্ধু যাচ্ছে। তারা সিপাই-রাজাকে চিনতে পারেনি। কিন্তু সিপাই-রাজা তাদের দেখেই চিনেছে। দুই বন্ধুকে কাছে ডেকে সিপাই-রাজা বলল—দেখ তো, আমাকে চিনতে পার কি না ?

বন্ধু দু'জন বলল—কে ? আপনি কে ?

সিপাই-রাজা বলল—আমি তোমাদের পুরানো বন্ধু। মনে নেই, আমাকে ঠেঙ্গিয়ে অন্ধ করে দিয়ে, গাছে বেঁধে রেখে চলে গিয়েছিলে। তখন আমার সব টাকা-পয়সা নিয়ে চলে গেলে, এখন আমাকে চিনতে পারছ না ?

এবার দু'বন্ধু সিপাই-রাজাকে চিনতে পারল। তাদের ভারী ভয় হল, তাড়াতাড়ি হাত জোড় করে বলল—আমাদের ক্ষমা করুন মহারাজ, আমাদের অন্যায় হয়েছে।

সিপাই-রাজা বলল—মানুষের বরাত কেউ কেড়ে নিতে পারে না। দেখ, আমার টাকা নিয়ে তোমরা আর ক'দিন সুখে রইলে, তোমাদের তো সেই আগের অবস্থাই দেখছি। আর দেখ, আমি পথের ভিখারী হয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু আজ আমি রাজা।

বন্ধু দু'জন আবার বলল—আমাদের ক্ষমা করুন মহারাজ, আমাদের অন্যায় হয়েছে।

সিপাই-রাজার দয়া হল। সে বন্ধু দু'জনকে ক্ষমা করল। তাদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এল রাজবাড়ীতে। তাদের ভাল করে খাওয়াল, ভালো জামা-কাপড় দিল। তারপর কথায় কথায় গল্প করল কি করে সে সিপাই থেকে রাজা হয়েছে।

বন্ধু দু'জন সব শুনল। তারপর নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করল—চল, আমরা দু'জনে যাই সেই বনের মাঝে, সেই গাছতলায়। সেখানে রাত জেগে বসে থাকব, কাক কি বলে শুনব। দেখি না, আমাদের বরাত ফেরে কি না?

সেই রাত্রেই দু'বন্ধু রাজবাড়ী থেকে বেরিয়ে বরাবর চলে গেল সেই বনের মধ্যে। চুপ করে তারা দু'জনে বসে রইল সেই গাছতলায়।

রাত দুপুরে কাক আর কাকীর মধ্যে কথা হল। কাকী বলল—আজ নতুন খবর কি?

কাক বলল—আমরা যে কথা বলি, গাছের নীচে থেকে কেউ তা শোনে। একজন সিপাই রাজকন্যাকে ফুলের ভস্ম খাইয়ে সুস্থ করেছে। এখন সেই হয়েছে রাজার জামাই আর অর্ধেক রাজ্যের মালিক। ওই ঘাসের শিশিরও সে নিয়ে গেছে। কাণা লোক এলেই সে তার চোখ ভাল করে দেয়। বাজারের বটগাছের নীচে খুঁড়ে সে ঝরণাও বের করেছে।

কাকী বলল—দেখ না, নীচে কোন মানুষ আছে কি না?

কাক নীচে তাকিয়ে বলল—ছুটো লোক বসে আছে।

কাকী বলল—আমরা কিছু খেতে গেলেই মানুষ আমাদের তাড়া করে, আর আমাদেরই কথা শুনে তারা চালাক হয়ে যাবে? এ হয় না। ওদেরকে রীতিমত সাজা দাও, যাতে আর কখনও না এই গাছতলায় আসে।



কাক আর কাকী তখনই নীচে নেমে এল, অন্ধকারে দু'বন্ধুকে ঠুকরে ঠুকরে মেরে ফেললে।

সকালবেলা দু'বন্ধুকে দেখতে না পেয়ে সিপাই-রাজা তাদের খোঁজ করল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেল, তারা দু'জন বনের মাঝে গাছতলায় মরে পড়ে আছে। যেমন কাজ তারা করেছিল, শাস্তি পেল তার চেয়েও অনেক বেশী। অন্যায়ের সাজা এমনি হয়।—

সত্য ন্যায় ধর্ম যে বা মানে হবেই ভাল শেষকালে একদিন।
ক্ষতি তার হয় না কিছুতেই, নিজ গুণে ধর্ম শোধে ঋণ॥

দুষ্ট পরীর গল্প

এক ছিল কাঠুরে। একদিন বনে কাঠ কাটতে গিয়েছে, হঠাৎ শোনে গাছের মাথায় ছোট ছেলে কাঁদছে। গাছের উপরে ছোট ছেলে! কাঠুরে গাছে উঠল। গাছের ডালে শকুনির বাসা, বাসার মধ্যে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। কাঠুরে ছেলে-মেয়ে দুটিকে নামিয়ে আনল। তার ছেলেমেয়ে ছিল না। নিজের ছেলেমেয়ের মত মানুষ করতে লাগল তাদেরকে।

দিন যায়। ভাই বোন বড় হতে থাকে। এমন সময় দেশে

দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। কাঠ আর কেউ কেনে না। কাঠুরের দিন চলে না। কাঠুরে-বউ বলল—না খেয়ে আমরা মরব। এখন আর পরের ছেলে ঘরে রেখে লাভ কি? ওদেরকে বনে ছেড়ে দিয়ে এস।

—সে কি? ওরা ত এখন আমাদেরই ছেলেমেয়ে।

—যা বলছি তাই কর, নাহলে ওরা দু'জনও এখানে না খেয়ে মরবে, বনের মধ্যে তবু ফলমূল খেয়ে দু'দিন বাঁচবে। বনের ছেলেমেয়ে বনেই রেখে এস।

ভাইবোন আড়াল থেকে মায়ের কথা শুনল, বোন ভয়ে কেঁদে ফেলল, বলল—দাদা, কি হবে?

ভাই বলল—কোন ভয় নেই, আমি এখনি ব্যবস্থা করছি।

তখনই সে বেরিয়ে গিয়ে যত নুড়ি পাথর পেলে কুড়িয়ে নিয়ে, দু'পকেটে বোঝাই করে বাড়ী ফিরল।

বোন বলল—ওগুলো কি হবে?

ভাই বলল—কাল কাজে লাগবে।

পরদিন সকালে কাঠুরে বলল—চল্, তোদেরকে বনের মধ্যে বেড়িয়ে আনি।

ভাইবোনকে নিয়ে কাঠুরে চলল বনে। কাঠুরে আগে আগে যায়, ভাইবোন যায় পিছু পিছু। ভাই যত যায় এক এ খানি পাথর ফেলতে ফেলতে যায়। শেষে গভীর বনের মধ্যে গিয়ে কাঠুরে বললে—তোরা এখালে খেলা কর, আমি ততক্ষণ কাঠ কাটি।

কাঠুরে কাঠ কাটে। ভাইবোনে খেলা করে। খেলতে খেলতে কখন্ তারা ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম থেকে উঠে দেখে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। তাদেরকে ফেলে কাঠুরে কখন্ চলে গেছে। বোন বলল—কি করে বাড়ী ফিরব দাদা?

ভাই বলল—কোন ভয় নেই, আগে চাঁদ উঠুক।

চাঁদ উঠল। সেই চাঁদের আলোয় সাদা নুড়িগুলি চিক্‌চিক্ করতে লাগল। সেই পাথর দেখে দেখে ভাইবোন বন পার হয়ে এল। বাড়ী এসে বলল—মা, আমরা ফিরে এসেছি।

কাঠুরে তাদের দেখে ভারী খুসি হল। বলল—আয়! আয়!

কাঠুরে-বউ বলল—কিন্তু তোরা খাবি কি?

কাঠুরে বলল—আমরা যা খাব ওরাও তাই খাবে।

চাল ছিল না, ভাত হয়নি, ঘরে মুড়ি ছিল, কাঠুরে-বউ তাই ধরে দিলে কাঠুরের সামনে। কাঠুরে তাই অর্ধেক নিজে খেলে আর বাকি অর্ধেক দিলে দুই ছেলেমেয়েকে। ভাই কিন্তু সব মুড়ি খেলে না, কিছু পকেটে ভরল। বোন বলল—ওগুলো কি হবে?

ভাই বলল—কাল সকালে খাব।

পরদিন সকালে কাঠুরে আবার তাদের বলল—চল, বনে যাই।

ভাইবোনকে নিয়ে কাঠুরে এবার আরও গভীর বনে চলে গেল। আজও যাবার সময় ভাই পথের নিশানা রাখার জন্য পকেটের মুড়িগুলি ফেলতে ফেলতে গেল। আজও কাঠুরে তাদের খেলাতে বলল। খেলতে খেলতে কোন এক সময় ক্লান্ত হয়ে যখন তারা ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন কাঠুরে তাদেরকে বনের মধ্যে ফেলে রেখেই চলে এল।

ভাইবোনের ঘুম ভাঙ্গল সন্ধ্যাবেলা। দেখে কাঠুরে নেই। বোন বলল—কি করে বাড়ী ফিরব দাদা।

ভাই বলল—দাঁড়া, আগে চাঁদ উঠুক।

চাঁদ উঠল। চাঁদের আলোয় ভাই মুড়ি দেখে পথের নিশানা খুঁজতে লাগল। কিন্তু মুড়ি আর খুঁজে পেলে না। বনের পাখী সারাদিনে সে সব মুড়ি খেয়ে গেছে। ভাই আর পথের নিশানা খুঁজে পেলে না, বোনের হাত ধরে ঘুরতে লাগল বনের মধ্যে।

দু'দিন দু'রাত তারা বনে বনে ঘুরল। তৃতীয় দিন বিকাল বেলা তারা এসে পড়ল এক নদীর তীরে এক কুটিরের সামনে। অদ্ভুত কুটির। রুটি দিয়ে তৈরী ঘরের ছাদ, সন্দেশ দিয়ে তৈরী তার দেয়াল, জানালা-দরজাগুলি লজেঞ্চুসের। ভাই বলল—এই সন্দেশ লজেঞ্চুস আমরা খাব, বড় খিদে পেয়েছে।

ভাইবোনে ঘরের দেয়াল খানিকটা ভেঙ্গে নিয়ে চিবুতে সুরু করে দিলে।

—কে এল রে, কে ?—যত দুষ্টু ছেলে মেয়ে।
বাড়ীর দেয়াল ভেঙ্গেচুরে ফেললে রে খেয়ে॥

কুটিরের দরজা খুলে এসে দাঁড়াল এক পরী। ভাইবোনকে দেখে, হেসে বলল—ওঃ, তোরা এসেছিস্? আয়, ভিতরে আয়।

দু'জনে বাড়ীর ভিতর গেল। পরী তাদের আদর করে খাওয়াল, বিছানা পেতে শোয়াল, গান গেয়ে ঘুম পাড়াল।

সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গল। পরী তখন ভাইকে ধরে একটি ঘরের মধ্যে তালা বন্ধ করে দিলে, বলল,—তোকে এখন আটক রাখলাম। তুই আটক থাকলে তোর বোনও আর পালাতে পারবে না। আমি এখন দিনের কাজ সারি গে, আবার ফিরে আসব সেই সন্ধ্যাবেলা।

পরী চলে গেল। বোন কাঁদতে কাঁদতে বলল—দাদা, কি হবে?

ভাই ঘরের ভিতর থেকে বলল—পরীর হাতে একটা মন্ত্রপড়া লাঠি থাকে দেখেছিস্ ত, সেটা পরী নিয়ে গেল, না রেখে গেল?

—লাঠি ত নিয়ে যায় নি।

—সেই লাঠিটা খুঁজে বের কর ত।

বোন এঘর সেঘর খুঁজে শেষে পরীর লাঠিগাছটা বের করল। বলল—লাঠি ত পেয়েছি।

ভাই বলল—ওই লাঠিকে যা বলবি তাই হবে।

বোন বলল—লাঠি, তালা খোল।

লাঠি দিয়ে তালাটা স্পর্শ করতেই তালা খুলে গেল। ভাই বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বোনের হাত ধরে বলল—চল্, আমরা এখান থেকে পালাই।

দু'জনে বনের মধ্যে দৌড় দিল।

সন্ধ্যাবেলা পরী বাড়ী ফিরল। ভাইবোনকে না দেখে সে ব্যাপার বুঝে নিলে। আজব চশমা চোখে দিয়ে তাকাল সে বনের পানে। চোখে পড়লে ভাইবোন চলে গেছে অনেক দূরে। তখনই আজব খড়ম পায়ে দিয়ে পরী বেরিয়ে পড়ল। এক এক পায়ে এক এক মাইল এগিয়ে চলল। দেখতে দেখতে এসে পড়ল ভাইবোনের সামনে।

বোন তখনই লাঠিকে বলল—লাঠি, আমাকে দীঘি করে দাও, আমার ভাইকে করে দাও রাজহাঁস।

চোখের নিমেষে সেখানে এক সরোবর হয়ে গেল, একটি রাজহাঁস ভাসতে লাগল সেই সরোবরের মাঝে। পরী দীঘির ধারে বসে রইল সারারাত। কত চেষ্টা করল হাঁসটাকে ধরার জন্য, কিন্তু কিছুই করতে পারল না। সকালবেলা পরী ফিবে গেল, বলে গেল—আজ সন্ধ্যাবেলা আবার আসব। দেখি তোরা কোথায় যাস্।

ভাইবোন আবার মানুষ হয়ে হাঁটতে সুরু করল। সারাদিন হেঁটে হেঁটে সন্ধ্যাবেলা তারা এসে পড়ল বনের কিনাবায়। লাঠিকে এবার বোন বলল—লাঠি, আমাকে ফণীমনসার ঝোপ করে দাও, আর আমার ভাইকে করে দাও তার মাঝে একটি গোলাপ ফুল।

চোখের নিমেষে বিরাট এক মনসা গাছেব ঝোপ হয়ে গেল। তার মাঝে ফুটল এক গোলাপ ফুল। কিন্তু পরীর চোখেব আজব চশমাকে তারা ফাঁকি দিতে পারল না। পরী এসে ঠিক তাদের চিনল। মনসার কাঁটা ডিঙ্গিয়ে সে ফুলটিকে তুলে নিতে গেল। কিন্তু কিছুতেই সেই ঝোপের মধ্যে সে ঢুকতে পারল না। সারারাত ধরে বার বার এই চেষ্টা করতে গিয়ে কাঁটায় তার জামা-কাপড় ছিঁড়ল, গায়ে হাতে পায়ে কত কাঁটা বিঁধল। কিছুতেই সে সুবিধা কবতে পাবল না। সকাল-বেলা সে আবার ফিরে চলে গেল।

ভাইবোন আবার মানুষ হয়ে হাঁটতে সুরু করল।

হাঁটতে হাঁটতে তারা এসে পড়ল এক নগরে। বোন বলল—দাদা, আমি এই বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকি, তুমি নগর ঘুরে দেখে এস, কিছু খাবার নিয়ে এস।

ভাই নগরে চলে গেল।

দিন গেল, সন্ধ্যা হল, ভাই তখনও ফিরল না। বোনের বড় ভয় হল, বোন কি করবে ভেবে পেলে না। শেষে লাঠিকে বলল—লাঠি তুমি আমাকে ফুল করে দাও, আমি গাছে উঠে বসে থাকি।

তখন বোন গাছের উপর একটি কনক চাঁপা ফুল হয়ে গেল।

রাত কাটল, ভোরবেলা এক রাখাল এল বনে গরু চরাতে। গাছের মাথায় প্রকাণ্ড একটা কনক-চাঁপা ফুল দেখে সে অবাক হয়ে গেল। গাছে উঠে ফুলটিকে পেড়ে নিয়ে সে ঘরে ফিরে গেল। এক বাটি জলে ভিজিয়ে রাখল ফুলটিকে।

রাতে রাখাল ঘুমায়। কনকচাঁপা তখন মানুষ হয়, বেড়ায়, খায়-দায়, তারপর ভোরবেলা আবার ফুল হয়ে যায়। দিন কাটে।

রাখাল ত অবাক, ফুলটা ত শুকায় না। কথায় কথায় গাঁয়ের এক বুড়ীকে সে বললে অবাক ফুলের কথা। বুড়ী বলল—ঐ ফুলের মধ্যে ভূত আছে। রাত জেগে একদিন বসে থাকিস্ তাহলেই সব বুঝতে পারবি।

রাখাল সেদিন জেগে রইল। রাতে ফুল যেই মানুষ হয়েছে, অমনি রাখাল তাকে ধরল। বলল—তুমি কে?

ফুল তখন সব কথা বলল।

রাখাল বলল—তোমার ভাই ত এখন রাজার জামাই। রাজা বলেছিলেন,—দেশের সবচেয়ে সুন্দর ছেলে দেখে মেয়ের বিয়ে দেব। কত ছেলে তিনি দেখেছিলেন, তোমার ভাই তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুপুরুষ তাই তারই সঙ্গে রাজার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে।

বোন তখনই চলল রাজার বাড়ী। রাজবাড়ীর দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে বোন করুণ সুরে গাইল—

দাদা গো দাদা, ভুলে গেলে ছোট্ট বোনটিকে,
আমি এখন যাব বল একলা কোন্‌দিকে?

ঘরের মধ্যে ভাইয়ের ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি সে বেরিয়ে এল। বোনকে দেখে, বোনের হাত ধরে সে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গেল। ভাইবোনের আর কোন দুঃখ রইল না। দিব্যি সুখে তাদের দিন কাটতে লাগল।—

ভাইবোনের ভালবাসা ভগবানের দান,
সারাজীবন কোনভাবেই হয়না কভু ম্লান।

সোনার পাখী

এক ছিল রাজা। রাজার একটি অতি সুন্দর বাগান ছিল। সেই বাগানে গাছে গাছে সোনালী রঙের আপেল ফলত। রাজা আপেল গুনে রাখতেন। আপেল পাকতে সুরু করলেই, পাকা আপেলগুলি আর গাছে দেখা যেত না। রাজা মালীকে বললেন— সারা রাত ধরে বাগানে পাহাবা দিবি।

মালী বড় ছেলেকে পাঠাল রাতে বাগানে পাহারা দেবার জন্য। রাত বারোটার সময় ছেলেটি আর জেগে থাকতে পারল না, ঘুমিযে পড়ল। সকালে উঠে দেখে পাকা আপেল একটাও আব গাছে নেই।

মালী পরদিন মেজো ছেলেকে পাঠাল রাতে বাগানে পাহাবা দেবার জন্য, সে-ও রাত দুপুরে ঘুমিয়ে পড়ল। সকালে উঠে দেখে পাকা আপেল একটাও আব গাছে নেই।

মালীর ছোট ছেলে পরদিন গেল বাগানে পাহারা দিতে। সে ঠিক সারারাত জেগে বসে রইল। দুপুর রাতে হঠাৎ সে শুনতে পেল একটা পাখীর ডানার শব্দ। দেখল একটি সোনার পাখী এসে বসেছে একটি আপেলের গাছে, একটি সোনালী আপেল সে খেতে সুরু কবল; ছেলেটি তখনই তীর-ধনুক নিয়ে একটি তীর ছুঁড়ল। কিন্তু পাখীটির গায়ে তীরটি বিঁধল না, গায়ে লেগে একটি পালক খসে পডল মাত্র। পাখীটি উড়ে গেল। যে পালকটি পড়ল সেটি সোনার পালক।



সকালে ছেলেটি সেই পালকটি নিয়ে এল রাজার কাছে। পালকটি দেখে রাজামশাই বললেন—এই একটি পালক নিয়ে কি করব? গোটা পাখীটা আমার চাই।

রাজার পাখী চাই। মালীর বড় ছেলে বেরিয়ে পড়ল সোনার পাখীর সন্ধানে। তেপান্তরের মাঠ ছাড়িয়ে, বনবাদাড় ঝোপঝাড়

জলাজঙ্গল পার হয়ে সে চলল। চলতে চলতে পথের মাঝে এক বনের ধারে এক শিয়ালের সঙ্গে দেখা। শিয়াল বলল—কোথায় চলেছ, সোনার পাখীর সন্ধানে? তা যাও, কিন্তু একটা কথা মনে রেখ, এই পথ ধরে গেলে তুমি সন্ধ্যাবেলা এক গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছাবে, সেখানে পথের উপর মুখোমুখি দু'টি সরাইখানা দেখতে পাবে, একটি সরাইখানা খুব জমকালো, আর একটি অতি সাধারণ। রাত্রে থাকার জন্য জমকালো সরাইখানাতে যেও না, সাধারণ সরাইখানাতে গিয়ে থেকো।

বড় ছেলে বলল—সে আমি যেখানেই থাকি, তা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। তোমাকে এখনি এক তীর মারবো।

বড়ভাই তীর-ধনুক বাগিয়ে ধরল। আর শিয়াল লেজ তুলে দৌড় দিল বনের মাঝে।

বড়ভাই হাঁটতে হাঁটতে বন পার হয়ে গিয়ে পৌঁছাল গাঁয়ে। গাঁয়ের মাঝে দুটি সরাইখানা। জমকালো সরাইখানায় নাচগান চলছে। সাধারণ সরাইখানাটি চুপচাপ। বড়ভাই ভাবল—পয়সা যখন খরচ করব তখন ভাল জায়গায় থাকব না কেন? বড় ভাই জমকালো সরাইখানায় গিয়ে উঠল। সেখানে নাচ দেখে, গান শুনে, সে ভুলে গেল বাড়ীর কথা, সোনার পাখীর কথা।

এদিকে দিন যায়, বড় ছেলে তো আর ফিরে এল না। কোন খবরও পাওয়া গেল না। মালীর মেজো ছেলে তখন বেরুল বড় ভাইয়ের খোঁজে, আর সোনার পাখীর সন্ধানে। পথে বনের ধারে তার সঙ্গেও সেই শিয়ালের দেখা হল। শিয়াল তাকেও সরাইখানার কথা বলল। পথ চলতে চলতে যখন সে সরাইখানার সামনে এসে দাঁড়াল, তখন দেখে জমকালো সরাইখানার জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার দাদা। তাকে দেখেই দাদা ডাকল—আয় আয়, এখানে আয়।

মেজো ছেলে জমকালো সরাইখানায় গিয়ে ঢুকল, সেখানকার নাচ দেখে আর গান শুনে সে ভুলে গেল বাড়ীর কথা, সোনার পাখীর কথা।

এদিকে দিন যায়, মেজো ছেলে ত আর ফিরল না। কোন খবরও পাওয়া গেল না। ছোট ছেলে এবার বলল—আমি যাব দাদার খোঁজে।

কিন্তু দু'ভাই গেল আর ফিরল না, এখন কোলের ছেলেটিকে ছেড়ে দিতে বাপ-মায়ের মন চায় না। বাবা-মাকে অনেক বলে বুঝিয়ে শেষে একদিন ছোটভাই পথে বেরিয়ে পড়ল। পথের মাঝে বনেব ধারে ছোটভাইয়ের সঙ্গে সেই শিয়ালের দেখা। শিয়ালের কথা শুনে সে বলল—তোমাব এই উপদেশ আমি ঠিক মেনে চলব। তোমাকে ধন্যবাদ!

বড় ও মেজো ভাইয়েব মত শিয়ালকে সে তীব-ধনুক নিয়ে মাবতে গেল না। শিয়াল খুসি হল, বলল—তুমি আমাব পিঠেব উপর উঠে বস, আমি তোমাকে এক-দিনেব পথ এক দণ্ডে নিয়ে যাব।



ছোটভাই শিয়ালের পিঠের উপর উঠে বসল। শিয়াল ছুটল ঝড়ের বেগে। বনবাদাড় ঝোপঝাড় পাব হয়ে শিয়াল ছোটভাইকে পৌঁছে দিল গাঁয়ে, সেই সবাই-খানাব সামনে। শিয়াল ত চলে গেল। ছোট ভাই কোন দিকে আব তাকাল না, সাধাবণ সবাইখানাটিব মধ্যে সোজা ঢুকে পড়ল।

বাতটা সেখানে কাটিয়ে পরদিন সকালে ছোটভাই আবাব বেরিয়ে পড়ল পথে। কিছুদূর যেতে না যেতেই বনেব ধাবে আবার সেই শিয়ালেব সঙ্গে দেখা। শিয়াল বলল—আমাব পিঠে উঠে বস, আমি তোমাকে নিয়ে যাই।

ছোটভাই শিয়ালের পিঠে উঠে বসল, শিয়াল ছুটল ঝড়ের বেগে। একদিনের পথ শিয়াল এক দণ্ডে পার কবে দিলে। ছোট-ভাইকে এনে পৌঁছে দিলে এক রাজবাড়ীর দরজায়। শিয়াল বলল—বরাবর চলে যাও ওই বাড়ীর মধ্যে। সোজা গেলেই সামনে দেখতে পাবে একটা কাঠের খাঁচার মধ্যে একটি সোনার পাখী বসে আছে। দেখবে পাশেই একটা সোনার খাঁচা খালি পড়ে আছে। সেই কাঠের

খাঁচা থেকে সোনার পাখীটিকে নিয়ে সোনার খাঁচায় রাখতে যেও না, তাহলে তুমি বিপদে পড়বে। যাও, সাবধানে বাড়ীব মধ্যে চলে যাও। বরাবর কাঠের খাঁচাশুদ্ধ সোনার পাখীটিকে নিয়ে এস। আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

ছোটভাই ত রাজবাড়ীর মধ্যে ঢুকল। কেউ কোথাও নেই। ববাবর সে ভিতবে চলে গেল। সামনেই এক কাঠের খাঁচার মধ্যে একটি সোনার পাখী। পাশেই একটি সোনাব খাঁচা ঝুলছে। খাঁচাটি খালি। ছোট ভাই ভাবল—এ কেমন কথা। সোনাব পাখী থাকবে কাঠেব খাঁচায় আর সোনাব খাঁচা খালি পড়ে থাকবে? যখন নিয়েই যাব তখন সোনাব পাখী সোনার খাঁচায় ভবে নিয়ে যাই।

যেম ' ভাবা তেমন কাজ। ছোট ভাই কাঠেব খাঁচা থেকে সোনাব পাখীটি বেব কবে সোনাব খাঁচায় ভবে দিল। আব যায় কোথা, সোনার পাখী এমনভাবে ডাকতে সুরু কবল যে সেই বাজবাড়ীতে যেখানে যত লোক ছিল সবাই ছুটে এল, ছোট ভাইকে বেঁধে নিয়ে গেল রাজার সামনে, বলল—মহারাজ, এই ছেলেটা পাখী চুবি করতে এসেছিল।

রাজা বললেন—চোবের সাজা শিরশ্ছেদ। ওর মুণ্ড কেটে ফেলা হবে, তবে যদি ও সোনার ঘোড়া এনে দিতে পারে তাহলে ওকে ছেড়ে দেওয়া হবে, আর সোনার পাখীটি ওকে পুবস্কাব দেওয়া হবে।

ছোটভাই বলল—আমি সোনার ঘোড়া এনে দোব।

ছোটভাই তখনই বেরিয়ে পড়ল।

বনের ধাবে এসে সেই শিয়ালের সঙ্গে দেখা। শিয়াল বলল—দেখলে ত ভাই, আমার কথা না শুনে তুমি কি অনর্থ ঘটালে। এখন আমার পিঠে উঠে বস, আমি তোমাকে নিয়ে যাই যেখানে সোনার ঘোড়া আছে।

ছোটভাই শিয়ালের পিঠে উঠে বসল। শিয়াল ছুটল ঝড়ের বেগে, বাতাসেব আগে। একদিনের পথ পৌঁছে দিলে এক দণ্ডে।

প্রকাণ্ড এক রাজবাড়ীর সামনে এসে শিয়াল থামল। বললে—

বরাবর চলে যাও এই রাজবাড়ীর ভিতরে। ওখানে ঘোড়াশালায় সোনার ঘোড়াটিকে তুমি দেখতে পাবে। দেখবে সহিস ঘুমুচ্ছে। পাশে পড়ে আছে দুটি জিন, একটি চামড়ার আর একটি সোনার। চামড়ার জিনটি ঘোড়ার মুখে লাগিয়ে তুমি চুপি চুপি ঘোড়াটিকে বের করে আনবে। কিন্তু সাবধান, সোনার জিনটা যেন লাগিও না।

ছোটভাই বরাবর রাজবাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেল। সবাই ঘুমুচ্ছিল, কেউ বাধা দিলে না। ঘোড়াশালায় গিয়ে সে সোনার ঘোড়াটি দেখতে পেলে। জিন পরাতে গিয়ে সে ভাবল সোনার ঘোড়ায় সোনার জিন লাগালেই ত ভাল মানাবে। সে সোনার জিনটি সোনার ঘোড়াকে পরিয়ে দিলে। আর যায় কোথা, ঘোড়া এমন ডাকতে সুরু করল যে সহিস জেগে উঠল, সিপাই-সান্ত্রীরা ছুটে এল। ছোটভাইকে তারা ধরে নিয়ে গেল রাজার কাছে।

রাজা বললেন—চোরের শাস্তি শিরশ্ছেদ, তবে তুমি যদি সুন্দরী রাজকন্যাকে এনে দিতে পার, তাহলে তোমাকে আমি মারব না, বরং সোনার ঘোড়াটি তোমাকে আমি পুরস্কার দোব।

ছোটভাই বলল—সুন্দরী রাজকন্যাকে আমি এনে দোব।

তখনই ছোটভাই বেরিয়ে পড়ল সেখান থেকে। বনের ধারে এসে দেখে শিয়াল দাঁড়িয়ে আছে। শিয়াল বললে—তুমি আমার কথা না শুনে আবার এই অনর্থ ঘটালে। এখন আমার পিঠে উঠে বস, আমি তোমাকে নিয়ে যাই যেখানে সুন্দরী রাজকন্যা আছে।

ছোটভাই শিয়ালের পিঠে উঠে বসল। শিয়াল ছুটল ঝড়ের মতো, বাতাসের আগে। একদিনের পথ পৌঁছে দিল এক দণ্ডে।

বনের শেষে শিয়াল ছোটভাইকে নামিয়ে দিলে, বললে—বরাবর চলে যাও এই পথ ধরে। সন্ধ্যাবেলা গিয়ে পৌঁছাবে এক রাজবাড়ীতে। রাজবাড়ীর পাশেই দেখবে পুকুর, সেই পুকুরের ধারে চুপ করে অপেক্ষা করবে। রাজকন্যা যখন আসবে স্নান করতে তখন তুমি তার হাত ধরে তাকে নিয়ে আসবে এই বনের ধারে, তার কোন কথা শুনবে না।

ছোটভাই হাঁটতে সুরু করল। বরাবর গিয়ে সন্ধ্যাবেলা পৌঁছাল রাজবাড়ীর পাশে পুকুরের ধারে। চুপ করে বসে রইল এক গাছতলায়। খানিক পরেই রাজকন্যা এল স্নান করতে। ছোট ভাই রাজকন্যার হাত ধরল। রাজকন্যা কেঁদে ফেলল, বললে—আমায় ছেড়ে দাও, আমি বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা করে আসি।

ছোটভাই রাজকন্যার চোখে জল দেখে তাকে ছেড়ে দিলে। রাজকন্যা যেই রাজবাড়ীতে ফিরে গেল, অমনি সিপাই-সান্ত্রীরা এসে ধরল ছোট ভাইকে, বেঁধে নিয়ে গেল রাজার কাছে। রাজা বললেন —তুমি আমার মেয়েকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিলে, তোমার শাস্তি শিরশ্ছেদ। তবে তোমাকে আমি ছেড়ে দিতে পারি যদি, আমার জানালার সামনে যে পাহাড়টি আছে, ওর জন্য আমার ঘরে বাতাস ঢোকে না, ওই পাহাড়টা ওখান থেকে সরিয়ে দিতে হবে, পারবে?

ছোটভাই বলল—আমায় সাতদিন সময় দিন।

রাজা সময় দিলেন। ছোটভাই পাহাড় খুঁড়তে সুরু করল। দিনের পর দিন সে খুঁড়ে চলে। সাতদিন খুঁড়বার পর সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল, অথচ পাহাড়ের তখন কিছুই খোঁড়া হয় নি। হতাশ হয়ে ছোটভাই সেই পাহাড়ের গোড়ায় শুয়ে পড়ল। সন্ধ্যাবেলা শিয়াল এসে বলল—কাল ত রাজার সভায় তোমার ডাক পড়বে, এদিকে তুমি ত কিছুই করতে পার নি, দেখি আমি কিছু করতে পারি কি না।

সারারাত ধরে শিয়াল কাজ করল। সকাল বেলা দেখা গেল, পাহাড়ের চূড়া আর নেই। ছোটভাই এবার রাজসভায় গিয়ে দাঁড়াল। রাজা খুসি হলেন, রাজকন্যাকে সঁপে দিলেন ছোটভাইয়ের হাতে।

রাজকন্যার হাত ধরে ছোট ভাই এল বনের ধারে। শিয়াল সেখান দাঁড়িয়েছিল, বললে—চল, তোমাদের আমি নিয়ে যাই।

ছোটভাই দ্বিতীয় রাজবাড়ীর দরজার কাছে এসে পড়ল। শিয়াল বললে—তুমি রাজার কাছে রাজকন্যাকে পৌঁছে দেবে, তারপর রাজা যখন সোনার ঘোড়া তোমাকে পুরস্কার দেবেন, তখন সেই ঘোড়ায় চড়ে রাজকন্যার কাছে এসে বিদায় নেবার ভাণ করে, টুপ করে

রাজকন্যাকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দেবে। কেউ তোমায় ধরতে পারবে না, সোনার ঘোড়া ও রাজকন্যা—দুই তুমি পাবে।

ছোটভাই রাজবাড়ীর মধ্যে ঢুকল। সভার মাঝে রাজকন্যাকে পৌঁছে দিয়ে বলল—মহারাজ, আমার পুরস্কার দিন।

রাজা তখন সোনার ঘোড়াটি ছোটভাইকে দিলেন। ছোট ভাই ঘোড়ার পিঠে চড়ে রাজকন্যার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।—আমি চললাম —বলেই রাজকন্যার একটি হাত ধরে রাজকন্যাকে টেনে তুলে নিলে ঘোড়ার পিঠে, ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল, সোনার ঘোড়া ছুটল ঝড়ের বেগে, চোখের পলক ফেলবার আগেই ঘোড়া উধাও হয়ে গেল রাজসভা থেকে।



বনের ধারে সোনার ঘোড়া এসে থামল। শিয়াল সেখানে অপেক্ষা করছিল। শিয়াল বললে—চল, এবার প্রথম রাজবাড়ীতে যাই।

তিনজনে ঘোড়ার পিঠে চড়ে চোখের নিমেষে গিয়ে পৌঁছাল প্রথম রাজবাড়ীর দরজায়। শিয়াল বললে—রাজকন্যাকে নিয়ে বনের ধারে আমি অপেক্ষা করছি, তুমি সোনার ঘোড়া নিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করগে। রাজার সামনে ঘোড়ার পিঠ হতে তুমি নেমো না। রাজাকে বলবে—এবার সোনার পাখী আমায় পুরস্কার দিন। রাজা যখন সোনার পাখী এনে দেবে তখন পাখীটা হাতে নিয়ে দেখার ভাণ করে একেবারে ঘোড়া ছুটিয়ে দেবে।

ছোটভাই শিয়ালের কথামত রাজসভায় গিয়ে দাঁড়াল, বলল—মহারাজ, এই সোনার ঘোড়া এনেছি, এই সোনার ঘোড়া রেখে এবার আমাকে সোনার পাখী পুরস্কার দিন।

রাজা সোনার পাখী এনে দিলেন।

—এটা কি সত্যি সেই আসল পাখী?—বলে পাখীটাকে দেখার

ভাণ করে ছোটভাই পাখীর খাঁচাটা হাতে তুলে নিলে, তারপর ঘোড়ার রাশ ধরে টান দিলে, চোখের নিমেষে ঘোড়া উধাও হয়ে গেল রাজসভা থেকে।

শিয়াল বনের ধারে অপেক্ষা করছিল। সন্ধ্যাবেলা তিনজনে এবার এসে পড়ল সেই সরাইখানার কাছে। শিয়াল বললে—বরাবর সোজা চলে যাও, কারও উপকার করতে যেও না, বিপদে পড়বে। কাল সকালে আবার বনের ধারে আমার সঙ্গে দেখা হবে।

শিয়াল চলে গেল। ছোটভাই সেই সরাইখানার সামনে এসে দেখে সেখানে খুব গোলমাল, অনেক লোকের ভিড়। বলল—ব্যাপার কি?

সরাইখানার মালিক বলল—আজ এখানে ছটি লোকের ফাঁসী হবে।

আরেকটু কাছে গিয়ে ছোটভাই দেখল, সিপাইরা যে ছটি লোককে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে, সে ছটি লোক তার ছ'ভাই—বড়-দা আর মেজ-দা। তাড়াতাড়ি সিপাইদের ডেকে বলল—এদের ছ'জনকে বাঁচান যায় না?

সিপাই বলল—যদি কেউ ন্যায্য দাম দিয়ে এদেরকে রাজার কাছ থেকে কিনে নেয়, তাহলে এরা বেঁচে যাবে।

ছোটভাই বলল—আমি এদের কিনে নোব।

রাজকন্যার গায়ে যত গহনা ছিল সব দিয়ে ছোটভাই বড় ছ'ভাইকে কিনে নিলে। তারপর তাদের ছ'জনকে সঙ্গে নিয়ে চলল বাড়ীর পথে।

পথে নদীর তীরে বনের ধারে এসে বড় ছ'ভাই বলল—চমৎকার জায়গা, এখানে একটু বসে জিরিয়ে নিই।

তিন ভাই নদীর তীরে বসল। বসে বসে গল্প হচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ বড় ছ'ভাই ছোট ভাইকে ধরে নদীর জলে ফেলে দিলে। তারপর রাজকন্যা, সোনার ঘোড়া ও সোনার পাখী নিয়ে বাড়ী এসে পৌঁছাল। রাজসভায় গিয়ে ছ'ভাই বলল—আমরা সোনার পাখী নিয়ে এসেছি।

রাজা ভারী খুসি হলেন। তু'ভাইকে অনেক টাকা পুরস্কার দিলেন।



এদিকে পাখী আর ডাকে না, ঘোড়া আর ঘাস খায় না, রাজকন্যা বসে বসে কাঁদে।

ওদিকে ছোটভাই নদীর জলে ভাসতে ভাসতে চলল। জল থেকে সে আর উঠতে পারে না। শিয়াল এসে নামল নদীর জলে, বললে—আমার লেজ ধর।

শিয়ালের লেজ ধরে ছোটভাই তীরে এসে উঠল।

শিয়াল বলল—এবার চল, তোমার বাপ-মায়ের কাছে।

যেতে যেতে শিয়াল বললে—তোমার তু'ভাই তোমাকে সেখানে দেখতে পেলেই মেরে ফেলবে। তারা পথে পাহারা দিচ্ছে। ভিখারীর মতো সেজে ভিক্ষে করার ভাণ করে রাজবাড়ীর দরজায় যাবে, তারপর রাজা মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে সব কথা বলবে।

ছোটভাই ছেঁড়া জামা-কাপড় পরে ভিখারী সাজল। ধূলোমাটি গায়ে মাখল। তারপর ভিক্ষা চাইতে চাইতে বরাবর এসে পৌঁছাল রাজবাড়ীর সামনে। রাজা তখন সভায় বসেছেন। ভিখারী বরাবর সামনে গিয়ে বলল—মহারাজ, বিচার চাই।

রাজা বললেন—কিসের বিচার?

ছোটভাই সব কথা বলল।

ছোটভাইকে দেখেই সোনার পাখী শিষ্ দিয়ে উঠল, সোনার ঘোড়া ঘাস খেতে সুরু করল, রাজকন্যা চোখের জল মুছে বলল—একে আমি চিনি।

রাজা তখনই বড় দু'ভাইয়ের মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে, দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেন। আর ছোট ভাইকে অর্ধেক রাজ্যের রাজা করে দিলেন। রাজকন্যার সঙ্গে ছোটভায়ের বিয়ে হয়ে গেল।

ছোটভাই ত রাজা হল। নতুন রাজা একদিন বনের ধারে বেড়াচ্ছেন এমন সময় সেই পুরানো শিয়ালের সঙ্গে দেখা। শিয়াল বলল—কি ভাই, চিনতে পার?

ছোটভাই ত শিয়ালকে আনন্দে জড়িয়ে ধরল, বলল—তোমার জন্যই আজ আমি রাজা হয়েছি। তুমি কোথায় ছিলে এতদিন?

শিয়াল বলল—তুমি যদি আমায় বন্ধু বলে মনে কর, তাহলে আমার একটা উপকার কর, আমার লেজ আর মাথাটা কেটে ফেল।

ছোটভাই বলল—তা কি হয়? সে আমি পারব না।

শিয়াল বলল—যা বলি তাই কর বন্ধু আমি তোমার পায়ে পড়ি।

শিয়াল কেঁদে ফেললে। ছোটভাই তার চোখের জল দেখে আর 'না' বলতে পারল না। তার মাথা আর লেজ তলোয়ারের এক এক কোপে কেটে ফেলল। শিয়াল তখনই হয়ে গেল এক সুন্দর রাজপুত্র। রাজপুত্র হেসে বলল—আমি ওই রাজকন্যার ভাই, এক ডাইনী আমাকে যাদু করেছিল। আজ আবার আমি মানুষ হলাম।

তারপর দিব্যি সুখে স্বচ্ছন্দে দুই বন্ধুর দিন কাটতে লাগল। আমার কথাটিও ফুরুল—

সত্যিকারের বন্ধু লোকের অনেক ভাগ্যে মেলে।
জীবন তোমার ধন্য হবে সৎবন্ধু পেলে॥

ডুমুর গাছ

অনেক অনেকদিন আগের কথা। এক গাঁয়ে এক মস্ত বড়লোক ছিল। তার বাড়ীর পিছনে ছিল এক বাগান। বাগানে ছিল এক ডুমুর গাছ। একদিন পৌষ মাসের দুপুর বেলা তার বৌ ডুমুর গাছের নীচে বসে রোদ পোহাচ্ছিল আর পশম বুনছিল। ঝির ঝির করে তুষার পড়ছিল। বুনতে বুনতে হঠাৎ স্ূঁচটা বিঁধে গেল তার আঙুলে। এক ফোঁটা রক্ত পড়ল সাদা তুষারের উপর। বৌ ভাবল, আমার যদি একটি ছেলে হয় এই রক্তের মত লাল আর এই তুষারের মত শাদা, তাহলে আমি তার নাম রাখব—'তুষারকুমার'।

কিছুদিন পরে তার একটি ছেলে হল, রক্তের সঙ্গে তুষার মিশলে যেমন গোলাপী হয় তেমনি তার গায়ের রং। মা ছেলের নাম রাখলেন—তুষারকুমার।

কিন্তু বছর খানেকের মধ্যে মায়ের খুব অসুখ করল। মা মারা গেলেন। ডুমুর গাছের নীচে মাকে কবর দেওয়া হল।

দিন যায়। পাঁচজন বললে—ঘরে বৌ না থাকলে ছেলেকে মানুষ করবে কে?

তুষারকুমারের বাবা আবার একটা বিয়ে করলেন।

সৎমা এল। সৎমা তুষারকুমারকে ভাল চোখে দেখত না, যেটুকু না করলে নয়, সেটুকুই সে তার জন্য করত।

দিন যায়। সৎমা'র একটি মেয়ে হল। সেই মেয়েকে নিয়েই সৎমা সারাদিন ব্যস্ত, তুষারকুমারকে আর চোখেই দেখে না, সদাই তাকে খিটখিট করে। তুষারকুমার সদাই চেষ্টা করে সৎমায়ের চোখের আড়ালে থাকার জন্য। যতটা পারে সে দূরে-দূরেই থাকে। সদাই তার ভয়, কখন্ সৎমা কি বলেন। বাড়ীতে তাই সে খুব কমই থাকে, সময় পেলেই সে চলে যায় বাগানে। ডুমুর গাছের নীচে গিয়ে বসে। মায়ের কবরের পানে তাকিয়ে বসে বসে ভাবে মায়ের কথা।

দিন যায়। বাবা তুষারকুমারকে ইস্কুলে ভর্তি করে দিলেন। তুষারকুমার ইস্কুলে যায়, লেখাপড়া করে।

একদিন ইস্কুল থেকে বাড়ী ফিরেছে। দরজায় দাঁড়িয়ে ছোট বোন আপেল খাচ্ছে, বললে—আপেল খাবি ?

—খাব।

—যা, মায়ের কাছ থেকে চেয়ে নিগে যা।

তুষারকুমার সৎমায়ের কাছে গিয়ে বলল—মা, আমাকে আপেল দেবে ?

—ওই যে বাক্সটার মধ্যে আছে নিগে যা।

তুষারকুমার কাঠের বাক্সের ডালা খুলে আপেল নেবার জন্য যেই ভিতরে ঝুঁকে পড়েছে, অম্‌নি মা বাক্সের ডালাটা ফেলে দিলে তার উপর। মস্ত বড় বাক্স, ডালা খুব ভারী। গলার উপর পড়তেই তুষারকুমার ঘাড় ভেঙ্গে মারা গেল।

ছেলেটা মরে যাবে মা তা ভাবেনি। বড় ভয় হল। তাড়াতাড়ি তার গলায় একখানি রুমাল জড়িয়ে তাকে ঘরের দরজার পাশে বসিয়ে দিলে, আর হাতে দিলে একটা আপেল।

বোন ঘরে এল, দাদাকে যত কথা বলে কোন সাড়া পায় না। মায়ের কাছে এসে বললে—মা, দাদা কথা বলছে না, আপেল খাচ্ছে না, কি হল বল ত ?

—হবে আবার কি ? কথা না বলে, কানটা ধরে আচ্ছা করে মলে দিবি।

বোন আবার এল ভাইয়ের কাছে, বললে—কি, আমার সঙ্গে কথা বলবি নে ? মা বলেছে তোর কান মলে দিতে, তাহলে তোর কান মলে দিই।

বোন যেই ভাইয়ের কান মলতে গেছে অমনি ঘাড়ভাঙা মাথা একপাশে ঢলে পড়েছে। ভাই টলে পড়ল মেঝের উপর। বোন হাউ-মাউ করে উঠল—মা, মা, দাদা কেমন হয়ে গেল, দেখ—

মা দৌড়ে এল। বলল—সর্বনাশ! করেছিস্ কি, এ যে মরে গেছে রে!

বোন বলল—আমি ত কিছু করিনি ?

—কি করেছিস্ তা ত জানি না। এখন চুপ কর, লোকে জানলে এখনি তোকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে, ফাঁসি দেবে। চুপ কর, কাউকে কিছু বলিস্ নে।

সৎমা তাড়াতাড়ি তুষারকুমারকে নিয়ে গেল ডুমুর গাছের নীচে। একটা গর্ত খুঁড়ে তুষারকুমারকে পুঁতে দিলে। সবে মাটি চাপা দিয়েছে এমন সময় চারিপাশ অন্ধকার হয়ে এল। আকাশে ঘন মেঘ দেখা দিল, ঝড় উঠল, বিদ্যুৎ চমকাল। মনে হল ডুমুর গাছের ডালগুলো যেন নাচছে। পরক্ষণেই কবরের মাটি ফেটে গেল, তুষারকুমার উঠে দাঁড়াল সেই কবর থেকে, তার পরেই একটি পাখী হয়ে উড়ে গেল আকাশে। লাল মাথা, সবুজ ডানা, সাদা লেজ— অতি সুন্দর একটি পাখী।

পাখী উড়ে গেল। গিয়ে বসল এক স্যাকরার বাড়ীর ছাদে। বসেই পাখী গান ধরল—

সৎমা মারল সতীন-ছেলে, বাবা জানে না,
ছোট্ট বোন খুকুমণির কান্না থামে না।
গাছের নীচে পুঁতে দিলে লুকিয়ে রাখার তরে,
পাখী হয়ে উড়ে এলাম আমি মেঘের 'পরে।
বন-প্রান্তর গিরি-পর্বত উড়ে বেড়াই আমি,
ঘরে ঘরে গান গেয়ে মোর কাটে দিবস-যামী।

স্যাকরা ত অবাক। পাখীতে কথা বলে? ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বললে—ও পাখী, কি গাইছ গাও ত শুনি।

—আর ত আমি গাইব না। তোমার হাতের ওই সোনার হারগাছি যদি আমাকে দাও ত আবার গাই।

স্যাকরা হারছড়া দিয়ে দিলে, পাখী আবার গাইল—

সৎমা মারল সতীন-ছেলে, বাবা জানে না,
ছোট্ট বোন খুকুমণির কান্না থামে না।

গাছের নীচে পুঁতে দিলে লুকিয়ে রাখার তরে,
পাখী হয়ে উড়ে এলাম আমি মেঘের 'পরে।
বন-প্রান্তর গিরি-পর্বত উড়ে বেড়াই আমি,
ঘরে ঘরে গান গেয়ে মোর কাটে দিবস-যামী।

গান শুনিয়ে, হারছড়া নিয়ে পাখী উড়ে গেল।

এক মুচির ঘরের সামনে গিয়ে পাখী গান ধরল।

পাখী কথা বলে ? মুচি ঘর থেকে বেরিয়ে এল, বললে—কি গাইছ আবার গাও।

পাখী বলল—যদি একজোড়া নতুন লাল জুতো আমায় দাও, তবে আবার গাই।

মুচি একজোড়া নতুন লাল জুতো এনে দিলে, জুতো জোড়া নিয়ে পাখী আবার গাইল—

সৎমা মারল সতীন-ছেলে, বাবা জানে না,
ছোট্ট বোন খুকুমণির কান্না থামে না।
গাছের নীচে পুঁতে দিলে লুকিয়ে রাখার তরে,
পাখী হয়ে উড়ে এলাম আমি মেঘের 'পরে।
বন-প্রান্তর গিরি-পর্বত উড়ে বেড়াই আমি,
ঘরে ঘরে গান গেয়ে মোর কাটে দিবস-যামী।

গান শুনিয়ে, জুতোজোড়া নিয়ে পাখী উড়ে গেল।

পাখী উড়ে এল এক যাঁতাওয়ালার ঘরের সামনে। যাঁতায় ডাল ভাঙা হচ্ছে, গম পেষাই হচ্ছে, ছাতু তৈরী হচ্ছে। পাখী সেইখানে গান ধরল। যারা যাঁতা পিষছিল সবাই ত অবাক, পাখী কথা বলে! যাঁতা থেমে গেল। সবাই বললে—পাখী কথা বলে, কি বলছ পাখী, বল ত আবার শুনি!

—একটা যাঁতা যদি আমাকে দাও ত গাই।

—এত বড় যাঁতা নিয়ে তুমি কি করবে ?

—যা আমার খুসি।

—বেশ, তাই দোব, তুমি গাও।

পাখী গান ধরল।

গান শেষ করে, যাঁতার পাথরখানি গলায় ঝুলিয়ে উড়ে গেল।

এবার পাখী উড়ে এসে বসল ডুমুর গাছের ডালে।

ওদিকে ঘরে তখন বাবা মা বোন বসে আছে। বোন বসে কাঁদছে। বাবা বললেন—খুকি, কাঁদছিস্ কেন?

মা বলল—কাঁদছে ওর ভাইয়ের জন্য। তুষারকুমার সেই যে মাসীর বাড়ী বেড়াতে গেল আর ফিরছে না। ওর খেলার সাথী নেই, তাই কান্না।

বাবা বললেন—আজই আমি যাচ্ছি। মাসীর বাড়ী থেকে খোকাকে নিয়ে আসছি।

মা বললেন—না না, তার কোন দরকার নেই। দু'একদিনের মধ্যে সে নিজেই ফিরে আসবে।

এমন সময় গাছের ডালে পাখী গাইল—

সৎমা মারল সতীন-ছেলে, বাবা জানে না,
ছোট্ট বোন খুকুমণির কান্না থামে না।
গাছের নীচে পুঁতে দিলে লুকিয়ে রাখার তরে,
পাখী হয়ে উড়ে এলাম আমি মেঘের 'পরে।
বন-প্রান্তর গিরি-পর্বত উড়ে বেড়াই আমি,
ঘরে ঘরে গান গেয়ে মোর কাটে দিবস-যামী।

বাবা বললেন—বাঃ রে, পাখীতে গান গায়!

ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। পাখী টুপ করে গলার সোনার হারছড়া ফেলে দিলে। বাবা বললেন—দেখ, দেখ, পাখীটা আমাকে একছড়া সোনার হার দিলে।

বোন দৌড়ে এল ঘর থেকে। পাখী দু'পাটি লাল জুতো ফেলে দিলে তার সামনে। বোন পায়ে পরে দেখে, দিব্যি মানিয়েছে। বললে—বাঃ বাঃ, পাখী আমায় নতুন লাল জুতো দিলে।

মা আর ঘরে বসে থাকতে পারল না। পাখীর গান সে শুনেছিল, তার ভয় হয়েছিল। তবু সে বেরিয়ে এল। যেই সে গাছের নীচে

এসেছে অমনি পাখী তার মাথার উপর যাঁতার পাথরখানি ফেলে দিলে। মাথা থেঁতলে গেল, সৎমা মরে গেল। পাখী এবার গাইল—

সৎমা মারল সতীন-ছেলে, বাবা জানে না,
ছোট্ট বোন খুকুমণির কান্না থামে না।
গাছের নীচে পুঁতে দিলে লুকিয়ে রাখার তরে,
পাখী হয়ে উড়ে এলাম আমি মেঘের 'পরে।
বন-প্রান্তর গিরি-পর্বত উড়ে বেড়াই আমি,
ঘরে ঘরে গান গেয়ে মোর কাটে দিবস-যামী।
সৎমা ম'ল পাথর চাপা, পেলে পাপের ফল,
পাপ কখন রয় না চাপা, এম্‌নি ধর্মের কল।

গান থামল। বাবা বললেন—একি হল!

পাখী বলল—পাপের কভু হয় না জয়।
এম্‌নি করেই পাপের ক্ষয়॥

পরক্ষণেই চারিপাশ অন্ধকার হয়ে গেল। খালি ধোঁয়া আর ধোঁয়া। সেই ধোঁয়ার মাঝে বিদ্যুৎ চম্‌কে উঠল। সেই আলোয় দেখা গেল ধোঁয়ার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে তুষারকুমার।

ধোঁয়া মিলিয়ে গেল, তুষারকুমার এগিয়ে এসে বোনের হাত ধরল। বাবা ত অবাক!—

মিথ্যা দিয়ে কি সত্য ঢাকা যায়,
সত্য কথা ঠিকই প্রকাশ পায়।

হারা-গিরি

॥ এক ॥

হারাধনের বউ গিরিবালা বাবুদের বাড়ী রাঁধুনীর কাজ করত। সে ভাবত, তার মতো রাঁধতে আর কেউ জানে না। বলত—আমার রান্না খেলে কেউ ভুলতে পারবে না।

বাবু পৌষ-পার্বণের দিন বলল—গিরি, আজ এক বন্ধুকে নেমন্তন্ন করেছি, ভাল করে রাঁধিস্, বিকালে সে আসবে।

গিরিবালা বলল—বেশ।

গিরিবালা সারা দুপুরটা বসে বসে নানারকম পিঠেপুলি তৈরী করল। বিকালে বলল—বাবু, বন্ধুকে ডেকে আনুন, রান্না সব তৈরী।

বাবু তখনই বেরিয়ে পড়ল।

এদিকে সন্ধ্যা হয়ে এল। বাবু তখনও ফেরে না। গিরি পিঠের থালার পানে তাকিয়ে বসে আছে। বসে থাকতে থাকতে তার মনে হল, বাবুর ত দেরী হচ্ছে, কেমন পিঠে হল, দেখি। একখানি রসের পিঠে নিয়ে সে মুখে ফেলল। বাঃ, বেশ ত হয়েছে, আরেকটা খাই। গিরিবালা আরেকখানি পিঠে মুখে দিল। তারপর গিরিবালা একখানি মাংসের পিঠে খেলে।

গিরিবালা লোভ সামলাতে পারে না, বাবুর আসতে দেরী হয়, আর গিরিবালা এক একখানি করে পিঠে খেতেই থাকে। দেখতে দেখতে এক থালা রসের পিঠে শেষ হয়ে গেল।

তখনও বাবু আসে না। একটা একটা করে আরেক থালা মাংসের পিঠেও গিরি খেতে সুরু করল। অর্ধেক যখন খাওয়া হয়ে গেছে, এমন সময় বাবুর গলা পাওয়া গেল,—গিন্নি, পিঠে সাজা, বন্ধু আসছে।

গিরিবালা বলল—আসুক না, আসবে আর দোব। আপনিও মুখ হাত ধুয়ে আসুন। মাংসের পিঠে খাবেন ত দু'চারটে পেঁয়াজ কুচিয়ে নিন, আমি থালা সাজাই।

বাবু কুয়াতলায় গেল মুখ হাত ধুতে। এমন সময় বাবুর বন্ধু এসে পড়ল। গিরিবালা ছুটে গেল তার কাছে, বলল—আপনি এসেছেন, করেছেন কি? এখনই পালান, বাবু আপনার দু'খানি কান কেটে নেবেন। বাবু ছুরি শানাচ্ছেন।

বন্ধু বলল—সত্যি?

গিরি বলল—শিগ্গীর পালান। দেখলে আর রক্ষে নেই।

বন্ধু ভয় পেয়ে দৌড় দিল। গিরি চেঁচিয়ে উঠল—বাবু, বাবু!

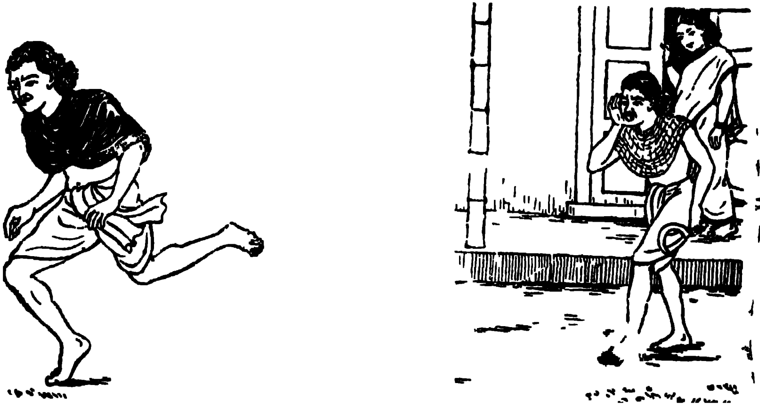
বাবু ছুটে এল, হাতে তার পেঁয়াজ কাটার ছুরি, বলল—কি হল?

গিরিবালা বলল—আপনার বন্ধু দু'বাটি পিঠে তুলে নিয়ে পালাচ্ছে। আমি কি করি?

বাবু ত অবাক, তারপর হাঁক দিল—ও হরিদাস, হরিদাস—শোন—শোন—

গিরিবালা বলল—আপনি খাবেন কি? আপনার জন্য একটা বাটি ফেরৎ দিয়ে যেতে বলুন।

বাবু হাঁক দিল—ও হরিদাস, একটা দিয়ে যাও—একটা দিয়ে যাও।



বন্ধু ভাবল, সর্বনাশ, দুটো কান কেটে নিত এখন বলে 'একটা দিয়ে যাও।' পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে বাবুর হাতে ছুরি ঝক্ ঝক্ করছে। সর্বনাশ!

গিরিবালা বলল—আপনি না হয় একবার ছুটে যান।

বাবু ছুটল বন্ধুর পিছনে।

বাবুকে ছুরি নিয়ে ছুটে আসতে দেখে হরিদাস প্রাণপণে দৌড় দিল। বাবু কিছুক্ষণ পরে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল।

সেদিন বাবুর আর পিঠে খাওয়া হল না।

॥ দুই ॥

গিরিবালার বিয়ে হয়েছিল হারাধনের সঙ্গে। হারাধন মাঝে মাঝে যেত বাবুদের বাড়ী গিরিবালার সঙ্গে দেখা করতে। গিরিবালা বাবুর বাড়ী থেকে ভাল-মন্দ জিনিষ চুরি করে লুকিয়ে রাখত, হারাধন গেলে তার হাতে দিত।

হারাধন ছিল হাবা-গোবা ধরণের মানুষ। একদিন যাবার আগে বলল—মা, গিরিকে দেখতে যাচ্ছি।

মা বললেন—বেশ বাবা, বুদ্ধি খরচ করো, বোকামি করো না। আসবার সময় এক তল্‌পা খড় এনো।

হারাধন বেরিয়ে পড়ল। বাবুদের বাড়ী গিয়ে হাঁক দিলে—গিরি, আমি এসেছি।

গিরিবালা বললে—আমার জন্য কি এনেছ?

হারাধন বলল—কিছু না। তুমি আমাকে কি দেবে দাও?

গিরিবালা একটি ছুঁচ দিলে, বললে—মাকে দিও, কাঁথা সেলাই করার ভাল ছুঁচ।

হারাধন ছুঁচ নিয়ে ফিরল। পথে দোকান থেকে এক তল্‌পা খড় কিনল। এখন দু'হাত দিয়ে ত খড় ধরতে হবে, ছুঁচ নেবে কোথায়? হারাধন ছুঁচটা গেঁথে রাখল একটি খড়ের গায়ে।

বাড়ী আসতেই মা বললেন—গিরি কি দিলে?

হারাধন বলল—একটা কাঁথা সেলাই করার ছুঁচ দিয়েছে।

মা বললেন—কই ছুঁচ দে?

হারাধন খড়ের গাদার মধ্যে থেকে ছুঁচ আর বের করতে পারে না।

মা বললেন—খড়ের মধ্যে ছুঁচ রাখে? তোর বুদ্ধি ত খুব!

হারাধন বলল—ছুঁচ কোথায় রাখব?

মা বললেন—জামার হাতায় বিঁধে রাখবি।

হারাধন বলল—বেশ, এবার তাই করব।

ক'দিন পরে হারাধন আবার বলল—মা, গিরিকে দেখতে যাচ্ছি।

মা বললেন—বেশ বাবা, বুদ্ধি খরচ করো, বোকামি করো না।

হারাধন বেরিয়ে পড়ল। বাবুদের বাড়ী গিয়ে হাঁক দিলে—গিরি, আমি এসেছি।

গিরিবালা বললে—আমার জন্যে কি এনেছ ?

হারাধন বললে—কিছু না। তুমি আমাকে কি দেবে দাও ?

গিরি একটি ছুরি দিলে। বললে—মাকে দিও। মা আনাজ কুটবেন।

হারাধন ছুরিখানি নিয়ে জামার হাতায় গুঁজে দিল। জামা ছিঁড়ে গেল, তা যাক্, মা বলে দিয়েছেন জামার হাতায় গুঁজে নিতে।

বাড়ী ফিরতেই মা বললেন—গিরি কি দিলে ?

হারাধন বলল—একখানা ছুরি।

মা বললেন—কই দে ?

হারাধন জামার হাতা থেকে ছুরি খুলে দিলে।

মা বললেন—জামার হাতা যে ছিঁড়ে গেল। পকেটে নিস্‌নি কেন ?

হারা বলল—তুমি বলেছিলে 'জামার হাতায় গুঁজে রাখবি।'

মা বললেন—সে কি ছুরির কথা বলেছিলাম, না ছুঁচের কথা ? তোর বুদ্ধি ত খুব ! ছুরি ত পকেটে নিবি।

হারাধন বলল—বেশ, এবার পকেটে করে আনব।

ক'দিন পরেই হারাধন বলল—মা, গিরিকে দেখতে যাচ্ছি।

মা বললেন—বেশ, ভদ্রভাবে চলো, বুদ্ধি খরচ করো।

হারাধন বেরিয়ে পড়ল। বাবুদের বাড়ীতে গিরির সঙ্গে দেখা করতেই গিরিবালা বললে—আমার জন্য কি এনেছে ?

হারাধন বলল—কিছু না। তুমি কি দেবে দাও ?

গিরিবালা একটা ছাগল-ছানা দিলে।

হারাধন পথে নেমেই ভাবল, মা তো বলে দিয়েছেন পকেটে করে নিয়ে যেতে। হারাধন ছাগল-ছানাটিকে জোর করে পকেটে ভরল। পকেটে ভরতে গিয়ে পকেট ছিঁড়ে গেল। যাক্, হারাধন যে-কোনমতেই হোক, ছাগল-ছানাটি পকেটের মধ্যে নিয়ে বাড়ী ফিরল।

মা বললেন—কই, গিরি কি দিলে?

হারাধন বলল—গিরি দিয়েছে একটা ছাগল-ছানা।

মা বললেন—ছাগল-ছানাটি কোথায়?

হারাধন পকেট থেকে ছাগল-ছানাটি বের করে দিলে। ছানাটি তখন মরে গেছে। মা বললেন—এ কি করেছিস্?

হারাধন বলল—তুমি যে বলেছিলে পকেটে করে আনতে।

মা বললেন—সে ত ছুরির কথা, তোর বুদ্ধি ত খুব! ছাগলের গলায় ত দড়ি বেঁধে টেনে আনবি।

হারাধন বলল—বেশ, এবার তাই করব।

ক'দিন পরেই হারাধন বলল—মা, গিরিকে দেখতে যাচ্ছি।

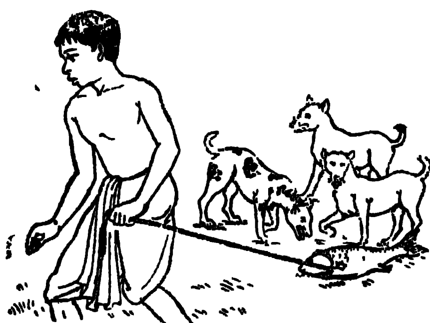
মা বললেন—বেশ, ভদ্রভাবে চলো, বুদ্ধি খরচ করো।

হারাধন বেরিয়ে পড়ল। বাবুদের বাড়ীতে গিয়ে গিরিবালার সঙ্গে দেখা হতেই গিরিবালা বললে—আমার জন্যে কি এনেছ?

হারাধন বলল—কিছু না। তুমি কি দেবে দাও?

গিরিবালা একটা বড় মাছ দিলে।

হারাধন পথে নেমেই ভাবল, মা তো বলেছেন গলায় দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যেতে। বড় মাছ, হারাধন তার গলায় দড়ি বেঁধে পথের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে চলল। পথের কুকুরগুলো দেখতে পেয়ে কামড়ে দু'এক টুকরো কেটে নিয়ে গেল, হারাধন জানল না।



বাড়ী ফিরতেই মা বললেন—গিরি কি দিলে?

হারাধন বলল—গিরি দিয়েছে একটা বড় মাছ।

মা বললেন—মাছটা কোথায়?

হারাধন বলল—এই যে দড়িতে বাঁধা।

মাছের তখন কিছুই আর নেই। খানিক খানিক কুকুরে কামড়ে

খেয়েছে আর বাকি যা ছিল পথের ধুলো-বালি মিশে তাকে আর মাছ বলে চেনার উপায় নেই। মা বললেন—এ কি ?

হারাধন বলল—তুমি যে বলেছিলে গলায় দড়ি বেঁধে টেনে আনতে।

মা বললেন—সে ত ছাগল-ছানার কথা। তোর বুদ্ধি ত খুব! বড় মাছ হাতে ঝুলিয়ে আনতে হয়।

হারাধন বলল—বেশ, এবার তাই করব।

ক'দিন পরে হারাধন বলল—মা, গিরিকে দেখতে যাচ্ছি।

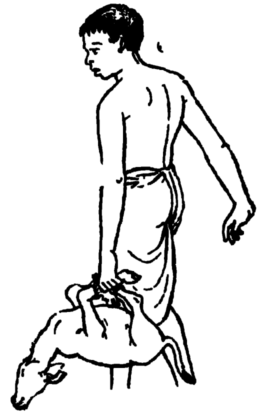
মা বললেন—বেশ, ভদ্রভাবে চলো, বুদ্ধি খরচ করো।

হারাধন বেরিয়ে পড়ল। বাবুদের বাড়ীতে গিরিবালার সঙ্গে দেখা হতেই গিরিবালা বললে—আমার জন্যে কি এনেছ ?

হারাধন বলল—কিছু না। তুমি কি দেবে দাও ?

গিরিবালা একটি বাছুর দিলে।

হারাধন পথে নেমেই ভাবল, মা বলেছেন হাতে ঝুলিয়ে নিতে। বাছুরের চারটি পা বেঁধে সে হাতে ঝুলিয়ে নিলে। বাছুরটা এমন জোরে লাথি মারল যে হারার হাত কেটে গেল, তারপর বাছুরটা পা ছুঁড়ে অনর্থ বাধিয়ে দিলে। হারাধনের দেহে কত জায়গায় যে কেটে-কুটে গেল! কিন্তু তবু বাছুরটিকে সে ধরে রাখতে পারল না। পায়ের বাঁধন খুলে সে দৌড় দিলে মাঠের উপর দিয়ে। হারাধন খানিকক্ষণ তাকিয়ে দেখল, তারপর খালি হাতেই বাড়ী ফিরল।



মা বললেন—কই, গিরি কি দিলে ?

হারাধন বলল—গিরি দিয়েছিল একটা বাছুর।

মা বললেন—বাছুরটা কোথায় ?

হারাধন বলল—হাতে ঝুলিয়ে আনছিলাম। আমায় লাথি

মেরেছ, সারা দেহ কেটে গেছে, জামা-কাপড় ছিঁড়ে গেছে, তারপর পালিয়ে গেছে মাঠে।

মা বললেন—সে কি ? বাছুর কেউ কখনও হাতে ঝুলিয়ে নেয় ?

হারাধন বলল—তুমি যে বলেছিলে ঝুলিয়ে আনতে হবে।

মা বললেন—সে ত মাছের কথা। তোর বুদ্ধি ত খুব! বাছুরকে ছোট্ট লাঠি দিয়ে মারতে মারতে তাড়িয়ে আনতে হয়। গোয়াল শূন্য, কেমন একটা বাছুর থাকত!

হারাধন বলল—বেশ, এবার তাই করব।

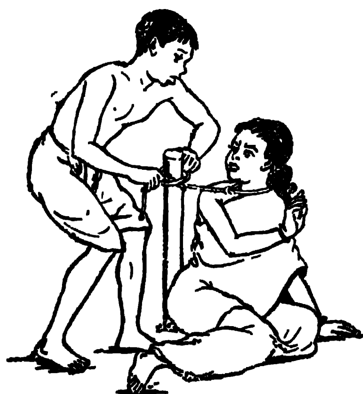
ক'দিন পরে হারাধন বলল—মা, গিরিকে দেখতে যাচ্ছি।

মা বললেন—বেশ, ভদ্রভাবে চলো, বুদ্ধি খরচ করো।

হারাধন পথে বেরিয়ে পড়ল। বাবুদের বাড়ী আসতেই গিরিবালা বললে—আমার জন্য কি এনেছ ?

হারাধন বললে—কিছু না। তুমি কি দেবে দাও ?

গিরিবালা বলল—আমি তোমার সঙ্গে বাড়ী যাব, চল।



হারাধন পথে নামল। একটি দড়ি বাঁধল গিরির গলায়, তারপর পথের পাশ থেকে গাছের ডাল ভেঙ্গে নিয়ে, গিরিকে এক ঘা করে মারে আর বলে—চল্।

গিরিবালা বলল—এ কি ?

হারাধন বলল—মা বলে দিয়েছেন।

বরাবর গিরিবালাকে এনে, হারাধন গোয়াল ঘরের খুঁটির সঙ্গে তার গলার দড়িটা বেঁধে দিলে।

মা বললেন—কই, গিরি কি দিলে ?

হারাধন বলল—গিরি এসেছে আমার সঙ্গে।

মা বললেন—কোথায় সে ?

হারাধন বলল—তাকে আমি গোয়াল-ঘরে বেঁধে রেখেছি।

মা বললেন—সে কি!

হারাধন বলল—তুমি যে বলেছিলে মারতে মারতে তাড়িয়ে এনে গোয়াল-ঘরে বেঁধে রাখতে।

মা বললেন—সে ত বাছুরের কথা। তোর বুদ্ধি ত খুব! শিগগীর যা, তাকে ঘরে নিয়ে আয়।

হারাধন তখনই গেল গোয়াল-ঘরে। কিন্তু হারাধনের হাতে মার খেয়ে আর ব্যাপার দেখে গিরিবালা তার আগেই রাগে দুঃখে গলার দড়ি খুলে গোয়াল-ঘর থেকে দৌড় দিয়েছে। হারাধন গিয়ে দেখলে গোয়াল খালি।

॥ তিন ॥

হারাধন আর গিরিবালা গাঁয়েই থাকে। হারাধন বোকা আর গিরিবালা চালাক। হারা কাজ করে, গিরি বসে থাকে। হারা কাঠ কাটে, রান্না করে, গিরি বসে বসে খায়। হারা মাঝে মাঝে চটে যায়, বলে—তুই শুধু বসে থাকবি?



গিরি উত্তর দেয়—আমার মাথা ঘুরছে, পেট কামড়াচ্ছে, হাঁটু কন্‌কন্ করছে।

একদিন হারা বলল—শুধুই বসে থাকবি? খানিক চরকা কাট্।

গিরি চরকা নিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

হারা বলল—কি হল?

গিরি বলল—সুতো কেটে রাখবো কোথায়? লাটাই?

হারা বলল—বেশ, এখনই আমি লাটাই তৈরী করে দিচ্ছি।

কুড়ুল নিয়ে হারা বেরুল গাছ কাটতে।

একটু পরে গিরিও বেরুল বাড়ী থেকে। অন্য পথ দিয়ে ঘুরে জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে সে বসে রইল এক ঝোপের মধ্যে।

হারা সেই ঝোপের পাশেই একটি পেয়ারা গাছের ডাল কাটবার জন্য তৈরী হচ্ছিল। যেই সে মাথার উপর কুড়ুল তুলেছে, অমনি গিরিবালা ঝোপের আড়াল থেকে গান গেয়ে উঠল—

কেটো না কেটো না ডাল, বিপদ হবে বড়।
নিজের মন্দ কেন তুমি নিজের হাতে কর॥

হারাধন চম্‌কে উঠল। বলে উঠল—কে গান গাইল?

গিরিবালা আড়াল থেকে বলে উঠল—তোমার অন্তর।

হারা আবার কুড়ুল তুলল মাথার উপর। গিরিও গাইল—

কেটো না কেটো না ডাল, বিপদ হবে বড়।
নিজের মন্দ কেন তুমি নিজের হাতে কর॥

হারা আবার থামল। চুপ করে কি যেন ভাবল। তারপর আবার কুড়ুল তুলল মাথার উপর। সঙ্গে সঙ্গে গিরিও আবার গাইল—

কেটো না কেটো না ডাল, বিপদ হবে বড়।
নিজের মন্দ কেন তুমি নিজের হাতে কর॥

বার বার তিনবার। হারাধনের আর গাছের ডাল কাটা হল না। সে ফিরল বাড়ীর পানে।

গিরিবালাও অন্য পথে দৌড় দিল বাড়ীর পানে। হারাধনের আগে সে বাড়ী পৌছাল। হারাধন যেতেই গিরিবালা বলল—কই, লাটাইয়ের কাঠ আনলে না?

হারাধন বলল—না, এখন সুতো কাটতে হবে না।

গিরিবালা বলল—তা হলে আমি কি কাজ করব?

হারাধন বলল—তুই মাঠে গিয়ে ধান কাটবি। আমি হাটে যাব।

গিরিবালা বলল—তা ভাল।

হারাধন হাটে গেল। গিরিবালা এক ধামা মুড়ি আর নারকেল নিয়ে চলে গেল মাঠে। ধানক্ষেতের পাশে একটা গাছতলায় বসে

বসে গিরিবালা মুড়ি-নারকেল খেতে লাগল। বলল—আগে খাই, পরে ধান কাটব। খাওয়া শেষ হলে গিরিবালা বলল—আগে একটু ঘুমিয়ে নিই তারপর ধান কাটব।

গিরিবালা গাছতলায় শুয়ে পড়ল। শুতে না শুতেই ঘুম।

সন্ধ্যাবেলা হারাধন ফিরল হাট থেকে। গিরিবালা তখনও ফেরেনি। হারা বেরুল গিরিকে ডাকতে। ক্ষেতে এসে দেখে ধান কাটা হয়নি। গিরিবালা গাছতলায় পড়ে ঘুমুচ্ছে।

হারাধন বাড়ী ফিরে এল। বলদের গলা থেকে ঘণ্টাটা খুলে নিয়ে আবার মাঠে গেল। ঘণ্টাটা সে বেঁধে দিলে গিরিবালার গলায়। তারপর বাড়ী ফিরে খেয়ে-দেয়ে দরজায় খিল এঁটে শুয়ে পড়ল।

খানিক পরে গিরিবালার ঘুম ভাঙল। তখন চারিপাশ অন্ধকার হয়ে গেছে। গিরিবালা বাড়ী চলল।

গিরি এক পা করে যায় আর গলার ঘণ্টাটা ঠুন ঠুন করে বাজে। গিরি অবাক হয়ে গেল, ঘণ্টা বাজে কেন? সে কি গিরি না গরু?

যাক্, বাড়ীর দরজায় এসে দেখে দরজা বন্ধ।

সে জানালায় ধাক্কা মেরে ডাকল—ওগো শুনছ?

হারাধন সাড়া দিল—কে?

গিরিবালা বলল—গিরিবালা কি ঘরে আছে?

হারাধন বলল—যেখানে থাকার সে ঠিক সেখানেই আছে।

ঠুন ঠুন করে গলার ঘণ্টা বাজল।

গিরি তখন ভাবল—তাহলে আমি নিশ্চয়ই গিরি নই, আমি গরু।

গিরি গেল পাশের বাড়ী। অনেক ডাকাডাকি করল। যত কথা বলে তত গলার ঘণ্টা বাজে। সবাই ভাবে গরু, কেউ আর দরজা খুলল না। ঘণ্টার শব্দ শুনে বাড়ীর ভিতরে কে একজন বলল—গরুটা এসে দরজা ঠেলছে।

গিরিবালা ভাবল—তাহলে সে ত আর গিরিবালা নেই, সে গিরি নয় গরু। এই ভাবতে ভাবতে আবার সে ফিরে এল ক্ষেতের পাশে গাছতলায়।

সারা রাত সে ক্ষেতেই রইল।
কাজ না করার সাজা সেদিন সে পেলে।—

বোকা মানুষ সাদাসিদে সরল লোক হয়,
চালাক লোক কোনকালে সোজা মানুষ নয়।
চাতুরি দিয়ে নিজের কাজে সুবিধা সে করে,
শেষকালে বুদ্ধিদোষে অতি-চালাক মরে॥

জীবন-জল

এক ছিল রাজা। রাজার বড় অসুখ। রাজবৈদ্য নানা ওষুধ দেন, কোন ওষুধেই আর কাজ হয় না। রাজবৈদ্য বললেন—এবার রাজার বাঁচা শক্ত।

রাজার তিন ছেলে। তাদের মনে বড় দুঃখ। বাগানে বসে বসে তারা একদিন কাঁদছে। এমন সময় এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা। সন্ন্যাসী বললেন—কাঁদছ কেন?

রাজপুত্রেরা বলল—বাবার বড় অসুখ, রাজবৈদ্য বলেছেন বাবা আর বাঁচবেন না।

সন্ন্যাসী বললেন—রাজা বাঁচবেন, অসুখ সারবে, যদি তোমরা তেপান্তরের মাঠ পার হয়ে জীবন-জল এনে রাজাকে খাওয়াতে পার।

বড় রাজপুত্র তখনই ছুটল রাজার কাছে, বলল—বাবা, আমি যাব আপনার ওষুধ আনতে। জীবন-জল খেলেই আপনি সেরে উঠবেন।

রাজা বললেন—বিদেশে গিয়ে তুমি কোন বিপদে পড়, আমি তা চাই না।

কিন্তু 'চাই না' বললে রাজপুত্র ছাড়বে কেন, সে রাজাকে অনেক বুঝিয়ে জীবন-জল আনতে বেরিয়ে পড়ল। কত মাঠ-ঘাট বন-বাদাড় পার হয়ে রাজপুত্র এসে পড়ল এক পাহাড়ের পাশে। সেখানে এক বটগাছের নীচে থেকে গুটি গুটি এক বামন বেরিয়ে এল, বলল—নমস্কার রাজপুত্র, এদিকে কোথায় চলেছ?

রাজপুত্র বলল—আমি যেদিকেই যাই না কেন, তোমার কি ?

রাজপুত্র চলল। কিছুদূর গিয়েই পড়ল এক পাহাড়ী ঘাট। দু'দিকে দুই পাহাড়, মাঝখান দিয়ে সরু পথ। রাজপুত্র সেই পথ দিয়ে কিছুদূর গিয়েই দেখে সামনের পথটা এত সরু হয়ে গেছে যে আর যাওয়া চলে না। পিছু হটে আসতে গিয়ে দেখে পিছনে কোন পথ নেই, শুধুই পাহাড়ের দেয়াল। বড় রাজপুত্র খাঁচার পাখীর মত সেখানে আটকে পড়ল।

এদিকে বড় রাজপুত্র ফেরে না দেখে মেজো রাজপুত্র বলল—দাদা ত ফিরল না, আমি একবার গিয়ে দেখি, জীবন-জল নিয়ে আসি, দাদারও খোঁজ করে আসি।

রাজা বললেন—না না, একজন ত গেল, তোমার আর গিয়ে দরকার নেই।

কিন্তু মেজো রাজপুত্র রাজাকে অনেক বুঝিয়ে জীবন-জল আনতে বেরিয়ে পড়ল। কত মাঠ-ঘাট বন-বাদাড় পার হয়ে মেজো রাজপুত্র এসে পড়ল এক পাহাড়ের পাশে। সেখানে সেই বটগাছের নীচে বামনের সঙ্গে দেখা। বামন বলল—নমস্কার রাজপুত্র, এদিকে কোথায় চলেছ ?

মেজো রাজপুত্র বড় ভাইয়ের মতই জবাব দিল—আমি যেদিকেই যাই না কেন, তোমার কি ?

মেজো রাজপুত্র চলল। কিছুদূর গিয়েই পড়ল এক পাহাড়ী ঘাট। দু'দিকে দুই পাহাড়, মাঝখানে সরু পথ। মেজো রাজপুত্র সেই পথে কিছুদূর গিয়েই দেখে যে সামনের পথটা এত সরু হয়ে গেছে যে আর যাওয়া যায় না। পিছু হটে আসতে গিয়ে দেখে পিছনেও কোন পথ নেই, শুধুই পাহাড়ের দেয়াল। মেজো রাজপুত্রও বড় ভাইয়ের মত সেই পাহাড়ের মাঝে আটকে পড়ল।

দিন যায়। বড় দু'ভাইয়ের কোন খবর নেই। ছোট ভাই এবার রাজার কাছে বলল—দাদারা ত ফিরল না, আমি একবার গিয়ে দেখি, জীবন-জল নিয়ে আসি, দাদাদেরও খোঁজ করে আসি।

রাজা বললেন—না না, তু'জন ত গেল তোমার আর গিয়ে দরকার নেই।

রাজাকে অনেক বুঝিয়ে ছোট ভাই একদিন ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়ল। কত মাঠ-ঘাট বন-বাদাড় পার হয়ে রাজপুত্র এসে পড়ল এক পাহাড়ের পাশে। সেখানে সেই বটগাছের নীচে বামনের সঙ্গে তার দেখা। বামন বলল—নমস্কার রাজপুত্র, এদিকে কোথায় চলেছ?

ছোট ভাই বলল—বাবার খুব অসুখ, যাচ্ছি জীবন-জল আনতে।

বামন বলল—জীবন-জল কোথায় পাবে তুমি জান?

ছোট রাজপুত্র বলল—তা ত জানি না। তুমি জান?

বামন বলল—জানি। বরাবর সোজা চলে যাও। পথের শেষে দেখবে একটা লোহার ফটকওয়ালা প্রকাণ্ড বাড়ী। আমি তোমাকে দিচ্ছি একটা লাঠি আর তু'খানা রুটি। লাঠি দিয়ে সেই ফটকের উপর তিনবার টোকা দিলেই ফটক খুলে যাবে। ফটকের ভিতরে দেখবে তু'পাশে তুটি সিংহ বসে আছে। রুটি তু'খানি তুটি সিংহের সামনে ফেলে দেবে। তারা আর তোমাকে কিছু বলবে না, তুমি বরাবর ভিতরে ঢুকে যাবে। উঠানে দেখতে পাবে একটি কূয়া, সেই কূয়ার জলই জীবন-জল। সেই কূয়া থেকে এক ঘটি জল তুলে নিয়ে তুমি সেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসবে। মনে রেখো, বেলা বারোটা যেই বাজবে অমনি সেই ফটক বন্ধ হয়ে যাবে। তুমি আর বেরুতে পারবে না। তার আগে বেরিয়ে আসবে।

বামন লাঠি দিলে, রুটি দিলে। রাজপুত্র আবার ঘোড়া ছুটাল।

কত মাঠ-ঘাট বন-বাদাড় পার হয়ে রাজপুত্র সাত-সমুদ্দুর-তের নদীর পারে সেই বিরাট ফটকওয়ালা অট্টালিকার সামনে এসে পৌঁছাল। ফটক বন্ধ, রাজপুত্র লাঠি দিয়ে তিনবার ফটকের গায়ে টোকা মারল। ঝন্‌ঝন্ করে ফটক খুলে গেল। সামনেই তুটি সিংহ বসে। রাজপুত্র রুটি তু'খানি তাদের সামনে ফেলে দিলে। তারপর রাজপুত্র বরাবর চলে গেল বাড়ীর মধ্যে। ভিতরে বড় বড় সব ঘর।

ঘরের মধ্যে যে যেখানে আছে সবাই নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। একে একে ঘরগুলি পার হয়ে সব শেষের ঘরে রাজপুত্র দেখল এক সোনার পালংকে এক রাজকন্যা শুয়ে আছে। তার মাথার কাছে একটি সোনার কাঠি, আর পায়ের কাছে একটি রূপার কাঠি। সোনার কাঠি ছুঁইয়ে রাজপুত্র রাজকন্যার ঘুম ভাঙাল। রাজকন্যা রাজপুত্রকে দেখেই চমকে উঠল, বলল—তুমি কে? এখানে কেন?

রাজপুত্র বলল—আমি জীবন-জল নিতে এসেছি।

রাজকন্যা বলল—বাগানের মাঝে কূয়া আছে, শীগ্গির জল নিয়ে চলে যাও। বেলা বারোটার পর এখানে থাকলে তুমিও আমাদের মতো ঘুমিয়ে পড়বে আর বেরুতে পারবে না। এখানের সব-কিছু এক ডাইনী যাদু করে রেখেছে।

রাজপুত্র বলল—কি করলে সেই যাদু নষ্ট করা যায়?

রাজকন্যা বলল—এক বছর পরে এস, তখন বলব।

রাজকন্যার সামনে টেবিলের উপর পড়েছিল একখানি তালোয়ার আর একখানি রুটি। রাজকন্যা বলল—এ দুটি জিনিষ তোমার কাছে রাখ, দরকারে লাগবে।

কথায় কথায় দেরী হয়ে গেল। রাজকন্যার কাছ থেকে একটি ঘটি নিয়ে রাজপুত্র ছুটল বাগানে। বাগানের মাঝে কূয়া। কূয়া থেকে এক ঘটি জল তুলে নিয়ে সে ছুটল ফটকের দিকে। যেই ফটক পার হল অমনি ঢং ঢং ঢং করে বেলা বারোটা বাজল। ঝন্ঝন্ করে ফটক বন্ধ হয়ে গেল। আর এক মুহূর্ত দেরী হলে রাজপুত্র সেই ফটকের মাঝে পিষে যেত।

মনের আনন্দে রাজপুত্র এবার দেশে ফিরল।

ফেরার পথে পাহাড়ের নীচে বটগাছের তলায় সেই বামনের সঙ্গে দেখা। বামন বলল—রাজকন্যার কাছ থেকে যে রুটিখানি পেয়েছ ওখানি যতই খাও কখনও ফুরাবে না, আর যে তলোয়ারখানি পেয়েছ ওর সামনে কোন শত্রু বাঁচবে না।

রাজপুত্র বলল—তোমার কথামত কাজ করেই ত এসব পাওয়া

গেল। তুমি আমাকে এবার আরেকটা কথা বলে দাও, আমার বড়দা ও মেজদা কোথায় আছে। তাদের দু'জনকে নিয়ে আমি বাড়ী ফিরব।

বামন বলল—তারা দু'জন বড় অহংকারী, তাই তাদেরকে আমি পাহাড়ে আটক করে রেখেছি।

রাজপুত্র বলল—তুমি তাদের ক্ষমা কর, তুমি তাদের দু'জনকে ছেড়ে দাও, তাদের দু'জনকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাই। বাবার অসুখ, তাদের জন্য বাবা বড় দুশ্চিন্তায় পড়েছেন।

বামন বলল—তাদের আমি ছেড়ে দিতে পারি, কিন্তু তাতে তোমারই বিপদ বাড়বে।

রাজপুত্র বলল—তা হোক্, তুমি তাদের ছেড়ে দাও।

বামন রাজপুত্র দু'জনকে ছেড়ে দিলে। তিন ভাই এবার এক সঙ্গে পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়ে দেশে চলল। চলতে চলতে ছোট ভাই বড় দু'ভাইকে সব কথাই বলল।—জীবন-জলের কথা, তলোয়ারের কথা, রুটির কথা। বড় দু'ভাই সব কথা বিশ্বাস করল না, বলল—সত্যি কি মিথ্যে পরে সব পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে।

দেখতে দেখতে তিন ভাই এসে পড়ল এক রাজ্যে। সেখানে লড়াই চলছে। শত্রুরা বাড়ীঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে, ধান-চাল লুট করছে, দেশে হাহাকার পড়ে গেছে। দেশের রাজা কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। বড় দু'ভাই বলল্—এবার তোমার রুটি আর তলোয়ারের কাজ দেখাও।

ছোট ভাই রাজার কাছে গিয়ে দিল তার রুটিখানি, বলল—এই রুটি দিয়ে দেশশুদ্ধ লোককে খাওয়ান। এ রুটির শেষ নেই।

তারপর তলোয়ার হাতে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেরুল শত্রু মারতে।

সন্ধ্যাবেলা সব শত্রু মেরে ছোট রাজপুত্র ফিরে এল।

এদিকে ততক্ষণে সেই রুটিখানি খেয়ে দেশশুদ্ধ লোকের পেট ভরে গেছে।

বড় দু'ভাই বলল—সত্যি তো রুটি আর তলোয়ারের গুণ আছে। তাহলে জলের কথাও সত্যি।

রাত্রে ছোট ভাই যখন ঘুমুল, তখন বড় দুই রাজপুত্র তার জীবন-

জল ভরা ঘটিটা চুরি করল, সে জায়গায় নুন-জল ভরা আরেকটি ঘটি রেখে দিল। ছোট ভাই কিছুই টের পেলে না।

বাড়ী ফিরে ছোট ভাই রাজাকে বলল—বাবা, এই নাও জীবন-জল এনেছি।

রাজা সেই একঘটি নুন-জল খেয়ে বমি করে আরও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তখন বড় দুই রাজপুত্র বলল—ছোট ভাই রাজাকে যা-তা খাইয়ে দিয়েছে। জীবন-জল আমরা এনেছি। বাবা খেলেই সুস্থ হয়ে উঠবেন।

তাদের দেওয়া ঘটি-ভরা জীবন-জল খেয়ে রাজা সুস্থ হয়ে উঠলেন।

ছোট ছেলের উপর রাজার ভারী রাগ হল, তখনই সভাসদ্‌দের ডেকে বললেন—ছোট রাজপুত্র আমাকে নুন-জল খাইয়ে মেরে ফেলছিল, আপনারা ওর বিচার করুন।

পাত্র-মিত্ররা বলল—রাজাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করা মানে রাজদ্রোহ। রাজদ্রোহের চেয়ে বড় অপরাধ নেই। এর শাস্তি মৃত্যু। ছোট রাজপুত্রের শিরশ্ছেদ করা হোক।

রাজা তখনই জল্লাদকে হুকুম দিলেন—ছোট রাজকুমারকে বনে নিয়ে গিয়ে কেটে ফেল গে।

জল্লাদ ছোট রাজকুমারকে বনে নিয়ে গেল। কিন্তু ছোট রাজকুমারের মিষ্টি ব্যবহারের জন্য সে তাকে ভালবাসত, বললে—তোমাকে আমি মারতে পারব না। তুমি রাজপোষাক বদলে রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যাও।

ছোট রাজপুত্র চাষীর কাপড়-জামা পরে, চাষী সেজে পালিয়ে গেল। জল্লাদ তার পোষাক এনে দিল রাজাকে। বলল—আপনার আদেশ পালন করেছি। এই নিন ছোট কুমারের পোষাক পরিচ্ছদ।

দিন যায়। মাস যায়। বছরও শেষ হয়ে এল। বড় দু'ভাই বলল—ছোট ভাই যেখান থেকে জীবন-জল এনেছিল, সেখানে ত এক বছর বাদে যাবার কথা। এবার আমাদের সেখানে যাওয়া দরকার।

বড় ভাই বেরিয়ে পড়ল।

এদিকে সেদেশে তখন ডাইনী মরে গেছে। তার যাদু শেষ হয়ে গেছে। রাজা নেই। রাজকন্যাই রাজ্য চালাচ্ছে। ছোট রাজপুত্রের কথা রাজকন্যার মনে আছে। ছোট রাজপুত্র আসবে বলে রাজকন্যা রাজবাড়ীর সামনের পথটা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছে। সেই পথ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে রাজপুত্র আসবে রাজবাড়ীতে।

বড় রাজপুত্র সেই পথের মুখে এল, সোনা বাঁধানো পথ দেখে সে ভাবল, এমন পথের উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে মায়া হয়। পথের পাশ দিয়ে, ঘাসের উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে সে এল রাজবাড়ীর ফটকে। সিপাইরা তাকে নিয়ে গেল রাজসভায়। বড় রাজপুত্র বলল—এক বছর পরে আসার কথা ছিল, আমি এসেছি।

রাজকন্যা বলল—কোন্ পথ দিয়ে এসেছ ?

রাজপুত্র বলল—সোনা-বাঁধানো পথ দিয়ে।

রাজকন্যা বলল—সোনা-বাঁধানো পথের উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছ ?

রাজপুত্র বলল—সোনার উপর দিয়ে আসব কেন ? এসেছি ডান পাশের ঘাস-জমির উপর দিয়ে।

রাজকন্যা বলল—তুমি আসল রাজপুত্র নও। তোমার মন বড় ছোট, তোমাকে বন্দী করলাম।

দিন যায়। বড় ভাই আর ফেরে না! শেষে মেজো রাজপুত্র একদিন ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়ল।

মেজো রাজপুত্র সেই পথে এসে যখন পৌঁছাল, সোনার পথ দেখে সে ভাবল, এমন পথে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে মায়া হয়। ঘোড়ার খুরের দাগ পড়ে পথের সোনালী পালিশ নষ্ট হয়ে যাবে। আমি ঘাসের উপর দিয়ে যাই। পথের বাঁ পাশ দিয়ে, ঘাসের উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে সে এল রাজবাড়ীর ফটকে। সিপাইরা তাকে নিয়ে গেল রাজসভায়। মেজো রাজপুত্র বলল—এক বছর পরে আসার কথা ছিল, আমি এসেছি।

রাজকন্যা বলল—কোন্ পথ দিয়ে এসেছ?

রাজপুত্র বলল—সোনার পথ দিয়ে।

রাজকন্যা বলল—সোনা-বাঁধানো পথের উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে?

রাজপুত্র বলল—সোনার উপর দিয়ে আসব কেন? এসেছি বাঁ পাশের ঘাস-জমির উপর দিয়ে।

রাজকন্যা বলল—তুমি আসল রাজপুত্র নও, তোমার মন বড় ছোট, তোমাকে বন্দী করলাম।

দিন যায়। ছোট রাজপুত্র বনে বনে ঘুরে বেড়ায় চাষীর বেশে। রাজকন্যার কথা তার মনে আছে। একদিন অনেক কষ্টে একটি ঘোড়া যোগাড় করে সে বেরিয়ে পড়ল। ঘোড়ায় চড়ে এল সেই রাজকন্যার দেশে। পথে আসতে আসতে সে ভাবল, আগে যখন আমি এসেছিলাম তখন আমি ছিলাম রাজার ছেলে, এখন আমি সামান্য চাষী, রাজকন্যা আমাকে চিনতে পারবে কি না কে জানে। সোনা-বাঁধানো পথ রাজপুত্রের নজরেই পড়ল না। আন্‌মনে সে বরাবর পথের উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এল ফটকের সামনে। সিপাইরা তাকে রাজসভায় নিয়ে গেল। রাজপুত্র বলল—এক বছর বাদে আমার আসার কথা ছিল, আমি এসেছি।

রাজকন্যা বলল—কোন্ পথ দিয়ে এসেছ?

রাজপুত্র বলল—যে পথ দিয়ে আগের বারে এসেছিলাম।

রাজকন্যা বলল—সোনা-বাঁধানো পথ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছ?

রাজপুত্র বলল—কই, সোনা-বাঁধানো পথ ত আমার নজরে পড়েনি।

সিপাইরা বলল—রাজকুমার সোনা-বাঁধানো পথের মাঝখান দিয়ে এসেছে।

রাজকন্যা বলল—তুমিই রাজা হবার যোগ্য, তোমার মন ঠিক রাজার মতো!

রাজকন্যার সঙ্গে রাজপুত্রের বিয়ে হয়ে গেল। রাজা ছিল না, ছোট রাজপুত্র হল সেই রাজ্যের রাজা। রাজা যেদিন সিংহাসনে

বসল, সেদিন সব বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হল। বড় দু'ভাই ছাড়া পেয়ে মুখ লুকিয়ে দেশে ফিরে গেল।

এদিকে খবর চাপা রইল না। বুড়ো রাজা সব শুনে ছেলে-বৌকে ডেকে পাঠালেন। ছোট রাজপুত্রের মুখ থেকে সব কথা শুনে, বড় দুই ছেলেকে তিনি তাড়িয়ে দিলেন রাজ্য থেকে। যেমন হিংসুক তারা, তেমনি তাদের সব ছেড়ে চলে যেতে হল।—

যতই তুমি কর ছল
কর্ম মত পাবেই ফল।

লালটুপি

ছোট মেয়ে। লাল টুপি পরতে সে বড় ভালবাসে। মা তাকে একটি লাল টুপি কিনে দিয়েছেন। সে সব সময় সেইটি মাথায় পরে থাকে। গাঁয়ের সবাই তাই তার নাম দিয়েছে—লালটুপি।

মা একদিন বললেন—লালটুপি, এই পিঠেগুলি নিয়ে গিয়ে দিয়ে আয় তোর দিদিমার কাছে।

লালটুপি পিঠের বাটি নিয়ে চলল—দিদিমার বাড়ী।

দিদিমার বাড়ী গাঁয়ের এক পাশে, বনের ধারে এক ফুল-বাগানের মাঝে। লালটুপি টুক টুক করে গাঁ ছাড়িয়ে যখন ফুল-বাগানে গিয়ে ঢুকছে, এমন সময় এক নেকড়ের সঙ্গে দেখা। নেকড়ে বলল—কি গো খুকি, কোথায় যাচ্ছ?

—দিদিমার বাড়ী।

—হাতে কি?

—পিঠের বাটি।

—দিদিমা কোথায় থাকে?

—ওই যে, ওই বাড়ীতে।

—ওই বাড়ীতে আর কে আছে?

—একা দিদিমা থাকে, আর কেউ নেই।

নেকড়ে ভাবল বেশ হয়েছে। বুড়ী আর এই খুকী। আগে বুড়ীটাকে গিয়ে খাই, তারপর এই খুকীকে খাব। বাঘ বলল—তুমি বাগান থেকে কতকগুলো ফুল তুলে নিয়ে যাও। তোমার দিদিমা ফুল পেলে বড়ো খুসি হবেন। বুড়ো মানুষ।

কথাটা লালটুপির ভাল লাগল। সে বাগান থেকে বেছে বেছে কয়েকটি বড় বড় ফুল তুলল, তারপর গেল দিদিমার বাড়ী।

ইতিমধ্যে নেকড়ে এসে দিদিমার দরজার ধাক্কা মেরেছে। দিদিমা বলল—কে ?

—আমি তোমার নাতনি।

—আমি আর উঠতে পারছি না। দরজা ঠেলে ভিতরে আয়।

নেকড়ে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে লাফিয়ে পড়ল দিদিমার ঘাড়ে। তাকে মেরে, খেয়ে, লেপ মুড়ি দিয়ে তার বিছানায় শুয়ে রইল।

লালটুপি এল, ডাকল—দিদিমা !

—আয়, ভিতরে আয়। আমার অসুখ করেছে।

লালটুপি ঘরে ঢুকে দিদিমার বিছানার পাশে বসল, তারপর বলল—একি দিদিমা ? তোমার কান দুটো অমন বড় কেন ?

—ভাল করে শোবার জন্য।

—অমন চোখ কেন ?

—ভাল করে দেখার জন্য।

—অমন দাঁত কেন ?

—ভাল করে খাবার জন্য। তোকে এখনি খাব, হালুম !

নেকড়ে লাফিয়ে পড়ল লালটুপির উপর।

—বাবাগো মাগো—বলে লালটুপি দৌড় দিল ঘর থেকে।

ঠিক সেই সময় একজন শিকারী যাচ্ছিল সেখান দিয়ে। সে এক গুলিতে নেকড়েকে সেইখানে শেষ করে দিলে। আমার গল্পও ফুরুল।—

মনে যার পাপ কভু না থাকে
বিপদে দেবতা তারেই রাখে।

তিন ভাইয়ের ভাগ্য

এক চাষীর তিনটি ছেলে। চাষী বড় গরীব। মরণকালে ছেলেদের ডেকে বলল—তোদেরকে দিয়ে যাওয়ার মত আমার টাকা-পয়সা নেই। আমার মুরগীটা বড়কে দিলাম, কাস্তেখানা মেজো নিস্ আর বিড়ালটা ছোটর জন্য। এ সবের তেমন দাম নেই, তবে এমন দেশও আছে যেখানে এসবের খুব দাম, সেখানে গিয়ে পড়লে তোরা রাজা হয়ে যাবি।

চাষী তো মারা গেল। বড় ছেলে মুরগীটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল, বলল—দেখি দেশবিদেশ ঘুরে, মুরগী বেচে রাজা হতে পারি কি না।

বড় ভাই যেখানে যায় সেইখানেই মুরগী আছে। ঘুরতে ঘুরতে শেষে সে এক রাজ্যে এসে পড়ল সেখানে দিনরাত বৃষ্টি হয়, আকাশ মেঘলা হয়ে থাকে। ভোরের দিকে আকাশ মেঘলা থাকলে সবাই ভাবে এখনও রাত আছে, দিনের কাজ আর সুরু হয় না।

বড় ভাই মুরগী নিয়ে গেল রাজসভায়, বলল—সকাল হলেই এই পাখী ডাকবে, সবাইকে জানিয়ে দেবে ভোর হয়েছে।

রাজা বললেন—বেশ, থাক্ পাখী এখানে, দেখি পাখীর গুণ।

পরদিন ভোর হতেই মুরগী রাজবাড়ীর ছাদ থেকে ডাকল—কঁকর কোঁ!

রাজা তো ভারী খুসি, বললেন—এই পাখী কিনব, কি দাম?

বড় ছেলে বলল—এক থলি মোহর।

রাজা বস্তা বোঝাই মোহর দিলেন। গাধার পিঠে মোহরের থলি চাপিয়ে বড় ভাই দেশে ফিরল।

এবার মেজো ভাই বেরুল কাস্তে নিয়ে।

নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে শেষে সে এক দেশে গিয়ে পড়ল, সেখানে দেখে চাষীরা পাকা ধান হাত দিয়ে উপড়ে তুলছে। বললে—এ কি? এই কাস্তে দিয়ে সব কেটে নাও।

সেখানকার চাষীরা কাস্তে কখনও দেখেনি। এখন কাস্তে দিয়ে ধান কেটে তারা তো বেজায় খুসি। বলল—এই কাস্তে আমরা কিনব, কত দাম?

মেজো ভাই বলল—এক থলি মোহর।

চাষীরা বস্তা বোঝাই করে মোহর দিলে। ঘোড়ার পিঠে মোহরের থলি চাপিয়ে মেজো ভাই দেশে ফিরল।

এবার ছোট ভাই বেরুল বিড়াল নিয়ে।

যেখানে সে যায় সেখানেই বিড়াল আছে। শেষে এক দ্বীপে গিয়ে দেখে সেখানে ইঁদুরের বেজায় উপদ্রব। জামা-কাপড়, পুঁথি-পত্তর ইঁদুরে কাটে, খেতে বসলে পাত্ থেকে খাবার টেনে নিয়ে খায়। সে রাজ্যে বিড়াল নেই। ছোট ভাই বলল—আমি একদিনে সব ঠাণ্ডা করছি।

সে বিড়াল ছেড়ে দিল। একদিনেই রাজবাড়ীর সব ইঁদুর সাফ হয়ে গেল।

রাজা বললেন—এই জানোয়ার আমি কিনব।

ছোট ভাই বলল—এক থলি মোহর চাই।

রাজা মোহর দিলেন। মোহরের থলি উটের পিঠে চড়িয়ে ছোট ভাই বাড়ী ফিরল।

এদিকে রাজবাড়ীর সব ইঁদুর খেয়ে বেড়ালের তেষ্টা পেয়েছে। ডাকল—মিঞাও! মিঞাও!

যত তেষ্টা বাড়ে, ততো ডাকে। দাস-দাসীরা ভয় পেল। রাজা মন্ত্রী ছুটে এলেন। বেড়াল একটানা ডাকছে—মিঞাও—মিঞাও—

রাজা ভয় পেলেন, বললেন—এ একটা রাক্ষুসে জানোয়ার, একে বের করে দাও বাড়ী থেকে।

দাস-দাসীরা বলল—কি করে বের করি। আমাদের ভয় করছে।

রাজা বললেন—এই রাক্ষস, বেরিয়ে যাও!

বিড়াল বলল—মিঞাও।

—যাবি না, বটে!—রাজা তখনই সিপাই ডাকলেন। হুকুম দিলেন—ওকে তাড়াও।

সিপাইরা বলল—কি করে তাড়াই ?

রাজা হুকুম দিলেন—সহজে না যায় কামান দাগো।

সিপাইরা বলল—যাও, রাজার হুকুম।

বিড়াল বলল—মিঞাও।

সিপাইরা তখন কামান দাগল রাজবাড়ীর দরজায়। গোলার পর গোলা ছুঁড়ে তারা রাজবাড়ী মাঠ করে দিলে।

রাজা বললেন—যাক্, রাক্ষসের হাত থেকে বাঁচলাম।

বিড়াল কিন্তু গোড়াতেই জানালা দিয়ে সরে পড়েছে।—

বুদ্ধি যাদের থাকে না ক' কিছু নতুন কিছু বুঝতে নাহি পারে,
উল্টো কাজে অল্পবুদ্ধির পিছু যা নয় তাই ঘটায় বারে বারে।

মাকড়সা আর মাছি

এক ছিল মাকড়সা, আর এক ছিল মাছি। দু'জনে পাশাপাশি থাকত, দু'জনে ভারী ভাব। একদিন মাকড়সা লাফাতে গিয়ে জলে পড়ে গেল, আর উঠতে পারল না। মারা গেল। মাছি তাই দেখে কাঁদতে লাগল।

ঘরের দরজা বলল—মাছি, কাঁদছ কেন ?

মাছি বলল—মাকড়সা মরে গেছে।

দরজা বলল—আমিও কাঁদি, ক্যাঁচ কোঁচ কোঁচ।

ঝাঁটা বলল—দরজা, তুই কাঁদিস কেন ?

দরজা বলল—মাকড়সা মরেছে, মাছি কাঁদছে।

ঝাঁটা বলল—আমি তাহলে জোরে জোরে ঝাঁটাই।

ছাইয়ের গাদা বলল—অত জোরে ঝাঁটাস্ কেন ?

ঝাঁটা বলল—মাকড়সা মরেছে, মাছি কাঁদছে।

ছাই বলল—আমি তাহলে ধিকি ধিকি জ্বলি।

ঠেলা গাড়ী দাঁড়িয়েছিল। বলল—অমন জ্বলিস কেন ?

ছাই বলল—মকড়সা মরেছে, মাছি কাঁদছে।

গাড়ী বলল—আমি তাহলে ছুটে বেড়াই।

গাছ বলল—অমন করে ছুটিস্ কেন?

গাড়ী বলল—মাকড়সা মরেছে, মাছি কাঁদছে।

গাছ বলল—আমি তাহলে পাতা ঝড়াই।

গাছ নড়ে। পাতা পড়ে। মেয়ে যাচ্ছিল জল তুলতে। বলল—এ কি! এত পাতা পড়ে কেন?

গাছ বলল—মাকড়সা মরেছে, মাছি কাঁদছে।

মেয়ে বলল—আমি তাহলে কলসী জলে ভাসিয়ে দিই;

নদী বলল—কলসী ভাসালি কেন?

মেয়ে বলল—মাকড়সা মরেছে, মাছি কাঁদছে।

নদী বলল—আমি তাহলে দু'কূল ভাসিয়ে দিই।

নদী দু'কূল ভাসিয়ে দিলে। মেয়ে, গাড়ী, গাছ, ছাই, ঝাঁটা, দরজা, মাছি, মাকড়সা—সব ভেসে গেল।—

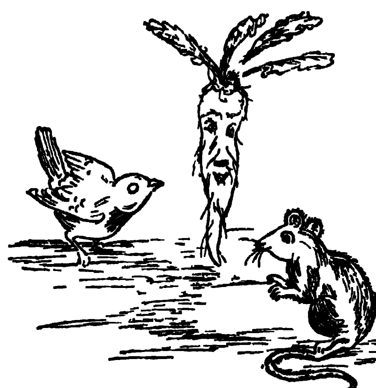
মাকড়সাটি ডুবে ম'ল, মাছি কাঁদে বসে,
দরজা ডাকে ক্যাঁচ কোঁচ, ঝাঁটা ঝাঁটায় ক'ষে
ঠেলা গাড়ী ছুটল জোরে, ছাই ধিকিধিকি জ্বলে,
গাছ কাঁপিয়ে পাতা ঝরে, কলসী ভাসে জলে।
নদেয় এলো বান—
ডুবল মেয়ে, গাড়ী, ঝাঁটা, ডুবল সকল স্থান॥



তিন বন্ধু

কবে কেমন করে কে জানে তিনজনের ভাব হয়ে গেল। এক ইঁদুর, এক পাখী আর একটি মূলো। তারা ঠিক করে ফেলল—তিনজনে এক সঙ্গে এক জায়গায় থাকবে।

তিন জনে এক জায়গায় থাকে। দিব্যি সুখে আছে। চড়ুই পাখী ঘুম থেকে উঠেই বন থেকে কাঠ-কুটো জোগাড় করে আনে। ইঁদুর সেই কাঠে আগুন দেয়, তারপর জল তুলে আনে। মূলো বসে বসে রান্না করে। তারপর তিনজনে একসঙ্গে খায়।



দিন যায়। একদিন চড়ুইয়ের সঙ্গে শালিখের দেখা, বলল—খাওয়া হয়ে গেছে?

চড়ুই বলল—আমি এখন বাড়ীতেই খাই ঘাটে মাঠে খাই না।

শালিখ সব শুনে বলল—তোমাকে আর সবাই বেশী খাটায়। বন থেকে কাঠ আনা কম কথা নয়। কতদূর উড়ে যেতে হয়। ইঁদুর ঘরে বসে উনুন ধরায়, উঠানের কূয়া থেকে জল তোলা—কোন দৌড়াদৌড়ি নেই। আর মূলো তো ঘরে বসেই রাঁধে—কি আরাম! তুমিই সব চেয়ে বোকা।

কথাটা চড়ুইয়ের মনে লাগল।

পরদিন চড়ুই বলল—আজ আমি রান্না করব। তোমরা বন থেকে কাঠ নিয়ে এস।

ইঁদুর আর মূলো বলল—সে কী!

চড়ুই কোন কথাই শুনল না। শেষে লটারী হল কে কি করবে।

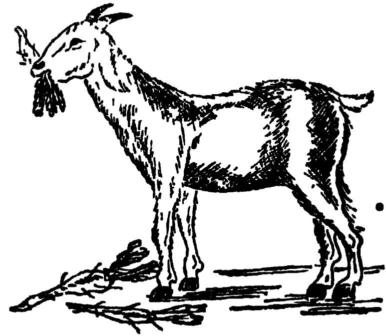
মূলোর নাম পড়ল কাঠ আনার। ইঁদুরের নাম উঠল রান্না করার, চড়ুইয়ের নাম পড়ল জল তোলার।

মূলো বেরিয়ে পড়ল। সে কাঠ নিয়ে এলে রান্না হবে।

সারা সকাল কেটে গেল, মূলো আর ফিরল না। চড়ুই তখন দেখতে বেরুল—ব্যাপার কি?

পথে এক ছাগলের সঙ্গে দেখা। চড়ুই বলল—পথে মূলোকে দেখেছ?

ছাগল বলল—একটা মূলো সামনে দিয়ে যাচ্ছিল বটে, তাকে তো আমি খেয়ে ফেলেছি।



চড়ুই বলল—আমাদের বন্ধুকে তুমি খেয়ে ফেললে?

ছাগল বলল—বাঃরে, খাবার জিনিষ খাব না? আরো পেলে আরো খাই।

চড়ুই ফিরে এল।

ইঁদুর বলল—তাহলে আমি রান্না শেষ করি।

উনুনে হাঁড়ি চড়াতে গিয়ে ইঁদুর হাঁড়ির জলের মধ্যে পড়ে গেল। ডুবে মরে গেল।

চড়ুই বসে আছে। ইঁদুরের সাড়া নেই। বেলা শেষ হয়ে গেল। পাখী ঢুকল রান্না ঘরে, কত ডাকল, এদিকে ওদিকে খুঁজল—কিন্তু ইঁদুর কোথায়?

চড়ুইয়ের পাখার ঝাপটায় কয়েকটা খড়কুটো এসে পড়ল উনানে, ঘরময় আগুন ছড়িয়ে পড়ল। চড়ুই ছুটল জল আনতে। বালতি করে জল তুলতে গিয়ে বালতি কূয়ার মধ্যে পড়ে গেল। বালতির সঙ্গে সে-ও পড়ে গেল কূয়ার ভিতর। চড়ুই ডুবে মরে গেল।

তিন বন্ধু শেষ হয়ে গেল। তাই লোকে বলে—যার যে কাজ

সে তাই করবে। তাকে দিয়ে অন্য কাজ করাতে গেলেই মুস্কিল বাধবে।—

যার যা শক্তি সেইটুকুই সে করুক,
তার বেশী আর চেও না তার কাছে।
যা পারে না, সে কাজ করতে গেলে
অনেক দুঃখ আসবে তাহার পাছে॥

মোরগ-মুরগীর উপাখ্যান

এক

মোরগ বলল—চল, পাহাড়ে বাদাম পেকেছে, খেয়ে আসি।

মুরগী বলল—আগে না গেলে কাঠবিড়ালী সব খেয়ে নেবে।

দু'জনে গেল পাহাড়ে, পাহাড়ের উপব বাদাম গাছ। গাছে বাদাম ফলেছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি দু'জনে মিলে শুধুই বাদাম খেলে। এতো খেলে যে সন্ধ্যা বেলা আর চলতে পারে না।



মোরগ বললে—বাদামেব খোলা দিয়ে একটা গাড়ী কবে ফেলি।

মোরগ এক গাড়ী বানিয়ে ফেলল।

মুরগী গাড়ীতে চড়ে বসল, বলল—আমি চড়ি, তুমি টানো।

মোরগ বলল—আমি টানতে পারব না, আমি হাঁকাব।

এই সময় একটা হাঁস এসে পড়ল, বলল—এই অঞ্চলে আমরা থাকি, তোরা এলি কোত্থেকে?

মুরগী বলল—এসেছিলাম বাদাম খেতে।

হাঁস বলল—না বলে বাদাম খেয়েছিস্, তোরা চোর।

মোরগ বলল—মিছামিছি গাল দিও না।

—চুরি করে খাবি আর চোর বলব না ?

—মারামারি হয়ে যাবে।

—হোক্।

মোরগ লাফিয়ে পড়ল হাঁসের উপর। হাঁস লড়তে পারল না। মোরগের ঠোকর খেয়ে আর ডানার ঝাপটা খেয়ে কেঁদে ফেলল, বলল—হেরে গেছি।

মোরগ বলল—বেশ, তাহলে আমাদের গাড়া টেনে নিয়ে চল।

মোরগ উঠে বসল সামনের আসনে। হাঁস টেনে নিয়ে চলল বাদামের খোলা।

কিছুদূর যেতেই পথে দেখা হল এক সুচ আর এক আলপিনের সঙ্গে। সুচ বলল—আমাদের দু'জনকে পৌছে দাও না ভাই, পথে বড় কাদা, আমরা তাড়াতাড়ি চলতে পারছি না।

মোরগ বলল—বেশ তো, উঠে এস।

সুচ আর আলপিন গাড়ীতে উঠে পড়ল।

সন্ধ্যাবেলা তারা এসে পড়ল এক সরাইখানায়। মোরগ বলল—অন্ধকারে কোথায় যাব, এইখানেই রাত কাটাব।

মালিক বলল— আমার জায়গা নেই। সব ঘরে লোক আছে।

মোরগ বলল—থাকার জন্য ভাড়া দোব, খাবারের দাম দোব।

—তোমাদের পয়সা কোথায় ?

—এই হাঁসটাকে রেখে দাও, রোজ সকালে একটা করে ডিম পাড়বে, সেই ডিম বেচে তুমি পয়সা পাবে।

মালিক বলল—বেশ, তাহলে থাকো।

পরদিন ভোরের আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে মোরগের ঘুম ভেঙ্গে গেল মুরগীকে সে ডেকে তুলল, বলল—চল, আমরা এখনি এখান থেকে সরে পড়ি।

আলপিন আর সূচ তখনও পড়ে ঘুমাচ্ছিল। মোরগ একটিকে শুইয়ে দিল চেয়ারের উপর, আরেকটিকে শুইয়ে দিল মালিকের রুমালে, হাঁসের ডিমটা রেখে গেল উনুনে।

হাঁসের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে দেখল মোরগ আর মুরগী বেরিয়ে গেল, সে বলল—আমিও তাহলে সরে পড়ি।

সামনেই ছিল নদী, হাঁস নদীতে সাঁতার দিয়ে ভেসে চলে গেল।

ঘণ্টা খানেক পরে রোদ উঠল, মালিকও ঘুম থেকে উঠল। রুমালে মুখ মুছতেই আলপিন বিঁধে গেল মুখে। উনুন থেকে কয়লা তুলে নিয়ে গেল তামাক সাজতে, ডিমের খোলা ছিটকে লাগল চোখে-মুখে। 'আজকের দিনটাই খারাপ'—বলে সে বসল চেয়ারে, সেখানে ছিল সূচ, বিঁধে গেল, সে লাফিয়ে উঠল, বলল—এ নিশ্চয়ই কারো নষ্টামি। কালকের সেই হাঁস-মুরগীগুলো কোথায় গেল দেখি।



কিন্তু মোরগ ও মুরগী তখন অনেক দূরে। হাঁসও ভেসে চলে গেছে নদীর ওপারে।

মালিক বলল—আর কখনও বাজে লোককে সরাইখানায় ঢুকতে দোব না।

মোরগ তখন মুরগীকে বলছে—আমাদের রাতে জায়গা দিতে চায়নি, কিছু খেতে দেয়নি, সরাইখানার মালিক এতক্ষণে রীতিমত জব্দ হয়েছে।

দুই

আরেকদিনের কথা। মোরগ একখানি গাড়ী তৈরী করল। চার চাকার গাড়ী। ছ'টা ইঁদুর জুড়ে দিল সেই গাড়ীতে, বলল—চল, খানিক গাড়ী চড়ে ঘুরে আসি।

মোরগ আর মুরগী গাড়ী চড়ে বেরিয়ে পড়ল।

পথে এক বিড়ালের সঙ্গে দেখা। বিড়াল বলল—কোথায় চলেছ?

মোরগ বলল—ঘুরে ফিরে খানিকটা বেড়াতে চাই।
শিয়াল ভায়ার খোঁজ নোব—যদি দেখা পাই॥

বিড়াল বলল—চল, আমিও যাই।

মোরগ বলল—বেশ, পিছনে উঠে বসো। দেখো, পড়ে যেও না।—

এই গাড়ীখানি খেটে-খুটে তৈরী করেছি আমি নিজে,
সারাদিন কাজ করেছি—রোদে পুড়ে, জলে ভিজে।
ছয়টি ইঁদুর ছুটছে তড়বড়,
চারটি চাকা ঘুরছে ঘর ঘর,
ঘুরব ফিরব বড়লোকের চালে
বনে মাঠে খেত-খামারের আলে।

পথে আরো ক'জনের দেখা মিলল। একখানি যাঁতা, একটি ডিম, একটি হাঁস, আর একটি আলপিন। সবাইকেই মোরগ গাড়ীতে তুলে নিলে।

শিয়াল বাড়ী ছিল না। না থাক্। তারা গাড়ী থেকে নামল। মোরগ আর মুরগী গিয়ে বসল ঘরের মাচার উপর। বিড়াল শুয়ে পড়ল উনুনের পাশে। হাঁস গেল চৌবাচ্চায়। আলপিন গেল বিছানার উপর। যাঁতা বসল বাড়ীর দরজায়। ডিম গেল গামছার উপর।

শিয়াল ভায়া বাড়ী ফিরল। সে উনুনের পাশে যেতেই বিড়াল তার চোখে ছাই ছড়িয়ে দিল। শিয়াল চোখ ধুতে এল চৌবাচ্চায়। হাঁস সারা মুখে জল ছিটিয়ে দিল। শিয়াল গামছায় মুখ মুছতে গেল। ডিম ভেঙে গিয়ে সারা মুখে কুসুম লেপ্টে গেল। শিয়াল বিছানায় গিয়ে বসল, ফুটে গেল আলপিন। শিয়াল বিছানা থেকে নেমে বাড়ী থেকে বেরুতে গেল। দরজা পার হয়েছে আর যাঁতার পাথর গিয়ে পড়ল তার ঘাড়ে। শিয়াল মরে গেল।

মোরগ চীৎকার করে উঠল—

অনেক বাচ্চা খেয়েছ, চোর বাটপাড় !
ভেবেছিলে চিরকাল পেয়ে যাবে পার।
আজকে তোমায় সুদে আসলে বুঝিয়ে দিলাম ঠিক
কঁকর কঁকর কোঁ—কোঁ—কিক্ কিক্ কিক্ ॥

তিন

মোরগ ও মুরগী আবার একদিন পাহাড়ে গেল বাদাম খেতে।

বাদাম খেতে খেতে মুরগীর গলায় একটা বড় বাদাম আটকে গেল, মুরগী বলল—শীগ্‌গীর যাও, জল নিয়ে এস, গলায় বাদাম আটকেছে।

মোরগ ছুটে গেল নদীতে, বলল—নদী তাড়াতাড়ি জল দাও, মুরগীর গলায় বাদাম আটকেছে।

নদী বলল—ঘরে কণে-বউ বসে আছে, ওর কাছ থেকে দড়ি কলসী নিয়ে এস।

মোরগ গেল কণে-বউয়ের কাছে, বলল—দড়ি কলসী দাও, জল নোব, মুরগীর গলায় বাদাম আটকেছে।

কণে-বউ বলল—বাগানে গাছের ডালে ফুলের মালা রয়েছে, সেটা আগে এনে দাও।

মোরগ বাগান থেকে ফুলের মালা এনে দিলে।

কণে-বউ দিল দড়ি কলসী।

জল নিয়ে মোরগ গেল পাহাড়ে।

ততক্ষণে মুরগী দম আটকে মরে গেছে। জল আর খাবে কে !

মোরগ ডাক ছেড়ে কাঁদতে সুরু করল—কঁক্ কঁক্ কঁকর কোঁক্ !

বনের পশুপাখীরা সেই কান্না শুনে দেখতে এল। তারাও কাঁদল। তারপর মোরগ ইঁদুরের গাড়ীতে মরা মুরগীকে নিয়ে চলল কবর দিতে, সঙ্গে চলল বনের যত জানোয়ার—বাঘ ভালুক শিয়াল ছাগল।

গাড়ী এল নদীর ধারে। মোরগ বলল—কেমন করে পার হব ?

একটা খড় ছিল, সে বলল—আমি ভাসব, আমার উপর দিয়ে চলে যাবে।

খড় ভাসল। খড়ের উপর গাড়ী গিয়ে নামতেই খড় ডুবে গেল, ইঁদুরগুলোও ডুবে গেল। মোরগ বলল—এখন কি করি?

একটা গাছের গুঁড়ি পড়েছিল, বলল—আমি ভাসব, আমার উপর দিয়ে চলে যাবে।

গুঁড়ি জলে পড়ল, কিন্তু জলের টানে স্থির হতে পারল না, ভেসে গেল। মোরগ বলল—এখন কি করি?

নদীর ধারের নুড়ি বলল—আমরা যাচ্ছি, নদীর উপর দিয়ে পথ করে দোব।

অনেক নুড়ি জলে পড়ল। নদীর উপর দিয়ে পথ হয়ে গেল। মোরগ মরা মুরগীকে নিয়ে পার হল।

বাঘ ভালুক বলল—আমরা সাঁতার দিয়ে পার হব।

তারা দু'জন জলে নামল। আর তখনই ঢেউ তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল। শিয়াল আর ছাগল ব্যাপার দেখে সরে পড়ল।

এপারে মোরগ একা-একাই এক গর্ত খুঁড়ল। তার মধ্যে মুরগীকে কবর দিয়ে মাটি চাপা দিল। তারপর সেই মাটির ঢিবির উপর বসে বসে কাঁদতে লাগল—কঁক্ কঁক্ কঁরর কোঁক্—

মনের দুঃখে করছি শোক!

সারা দিন সারা রাত মোরগ কাঁদল। ভোরবেলা কাঁদতে কাঁদতেই মোরগ মরে গেল।

বনের বাউল

এক ছিল গাধা। চাষার গাধা। অনেক দিনের পুরানো গাধা। বুড়ো হয়েছে আর খাটতে পারে না। চাষা একদিন বলল—গাধাটাকে এবার তাড়িয়ে দোব।

কথাটা শুনে গাধার মনে দুঃখ হল, সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল। সে বনে চলে যাবে। সেখানে গলা ছেড়ে গান গাইবে। বনের

পশুরা গান শুনে খুসি হবে। তার আর খাওয়া-পরার দুঃখ থাকবে না। মানুষে গাঁয়ের বাউল হয়, সে বনের বাউল হবে।

এক বুড়ো কুকুর পথে শুয়ে হাঁপাচ্ছিল, গাধা বলল—তোমাকে বড় ক্লান্ত বলে মনে হচ্ছে।

কুকুর বলল—অনেক দূর থেকে আসছি। বুড়ো হয়েছি, রাত জেগে আর বাড়ী পাহারা দিতে পারি না, তাই মনিব আমাকে মেরে তাড়িয়ে দিলে। বনে চলে যাব।

গাধা বলল—আরে, আমিও তো ওই দুঃখে বনে যাচ্ছি। চল দু'জনে একসঙ্গে যাই।

কিছুদূর যেতেই পথের পাশে এক বিড়ালের সঙ্গে দেখা। বিড়াল কুকুর দেখেও দৌড়াল না, মুখখানা ভারী করে বসে রইল।

গাধা বলল—কি গো বেড়াল ঠাকরুণ, কুকুরকে তোমার ভয় করে না?

বিড়াল বলল—না, আমি এখন মরতে পারলেই বাঁচি।

—কেন কি হল?

—বুড়ো হয়ে গেছি, আর লাফালাফি করে ইঁদুর ধরতে পারি না, তাই বাড়ীর গিন্নী বলেছেন—'থলিতে ভরে নদীতে ফেলে দোব।' তাই বাড়ী থেকে চলে এসেছি। কোথায় যাব, কি খাব, কে জানে।

গাধা বলল—ভাবনা নেই, চল আমাদের সঙ্গে। আমাদেরও ওই এক অবস্থা। তুমি তো মাঝরাতে বেশ চড়া সুরে গান ধরতে পার, তোমার সঙ্গে সারারাত আমি গান গাইব। বন মাত্ হয়ে যাবে।

বিড়াল তাদের সঙ্গী হল।

পথের পাশে এক বাড়ীর ছাদে উঠে একটা মুরগী খুব ডাকছিল—কঁক্ কঁক্ কঁকর কোঁ—কঁক্ কঁক্।

সে ডাক আর থামে না।

গাধা বলল—এতো ডাকাডাকি কেন?

মুরগী বলল—মনের দুঃখে। রোজ সকালে বাড়ীশুদ্ধ মানুষকে

ডেকে জাগিয়ে দিই। সন্ধ্যে হবার আগে সবাইকে জানিয়ে দিই অন্ধকার হয়ে এল, তবু বাড়ীর লোকেরা খুসি নয়। তারা ছুরি নিয়ে আমাকে কাটতে এসেছে, বলে—'সুরুয়া করে খাব।' তাই উঠে এসেছি এই ছাদের উপর।

গাধা বলল—কোন ভাবনা নেই। চল আমাদের সঙ্গে, বনে আমরা গান গাইব; আর তুমি পোঁ ধরবে। বেশ জমবে।

চারজনে চলল বনের দিকে।



সন্ধ্যাবেলা চার বন্ধু বনে পৌঁছাল। অনেক হাঁটাহাঁটি হয়েছে। গাধা আর কুকুর শুয়ে পড়ল এক গাছের নীচে। বিড়াল উঠল গাছের উপরে। আর মুরগী উঠে গেল এক মগ্‌ডালে। উপর থেকে মুরগী দেখতে পেলে কাছেই একটা বাড়ী রয়েছে, সেখানে আলো জ্বলছে, বলল—কাছেই একখানি বাড়ী রয়েছে।

গাধা বলল—ওইখানেই তাহলে যাই, রাতে বনে থাকার চেয়ে ঘরে থাকা ভাল।

কুকুর বলল—চল, সেখানে আমার কপালে কিছু উচ্ছিষ্ট মিলে যেতে পারে।

বিড়াল বলল—এঁটো পাতে মাছের কাঁটাও থাকতে পারে।

চারজনে সেই বাড়ীর দিকে চলল।

বনের মধ্যে সেই বাড়ীটি ডাকাতের বাড়ী। ঘরে আলো জ্বলছিল। গাধা মাথা উঁচু করে জানালা দিয়ে দেখে নিলে। বললে—ভিতরে খুব খানাপিনা চলছে।

সবাই বলল—বটে! আমরাও তো পেটভরে খেতে চাই।

গাধা বলল—তাহলে ওই ডাকাতগুলোকে এখান থেকে তাড়াতে হবে। তাহলেই ওদের খাবারগুলো আমরা খেতে পাব।

—কিন্তু কি করে তাড়াব?

ফন্দি ঠিক হয়ে গেল। জানালার উপর সামনের দু'পা তুলে দিয়ে গাধা দাঁড়াল। কুকুর উঠল তার পিঠে, বিড়াল উঠল কুকুরের কাঁধে। মুরগী বসল বিড়ালের মাথায়। তারপর সবাই একসঙ্গে ডাকতে সুরু করল।—

গাধা ডাকল—হাঁক্‌কা হাঁক্‌কা হাঁ—!

কুকুর ডাকল—ঘেউ ঘেউ ঘুঁ—!

বিড়াল ডাকল—মিউ মিউ মিঞাও—!

মুরগী ডাকল—কঁক্ কঁক্ কঁকর কোঁ—!

পরক্ষণেই চারজন জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ল ঘরের ভিতর। ঘরের মধ্যে সুরু করল লাফালাফি দাপাদাপি—গেলাস ভাঙল, জলের কলসী ওল্‌টাল। ডাকাতের দল হক্‌চকিয়ে গেল। ঘরের মধ্যে ভূত নামল নাকি! বাড়ী ছেড়ে সবাই দৌড় দিল।

চার বন্ধু এবার খোস মেজাজে খেতে বসে গেল। অনেক দিন পরে পেট ভরে তারা খেলে। তারপর আলো নিভিয়ে ঘুমানোর ব্যবস্থা করল। গাধা শুয়ে পড়ল উঠানের খড়ের গাদায়। কুকুর শুয়ে পড়ল দরজার সামনের পা-পোঁছ্‌টার উপর। বিড়াল শুয়ে পড়ল উনুনের পাশে ছায়ের গাদায়। মুরগী গিয়ে বসল ঘরের এক খিলানের মাথায়। দেখতে দেখতে চারজনেই ঘুমিয়ে পড়ল।

ডাকাতরা একেবারে পালায় নি, দূর থেকে নজর রেখেছিল। আলো নিভতেই তারা আবার বাড়ীর পানে ফিরল।

বাড়ীর কাছাকাছি এসে দলের সর্দার বলল—আমি দেখে আসি, ব্যাপারটা কি!

নিঃশব্দে সে ঢুকে পড়ল বাড়ীর মধ্যে। পায় পায় সে এল রান্না ঘরে। দেশলাই দিয়ে সে একটা বাতি জ্বালতে গেল। মুখের সামনে দেশলাই জ্বলতেই বেড়াল তো লাফিয়ে উঠল। নখ দিয়ে আঁচড়ে দিল সর্দারের মুখ।

ভয়ে সর্দার লাফিয়ে পড়ল বারান্দায়। দরজার পা-পোঁছের উপর শুয়ে ছিল কুকুর, সে লাফিয়ে উঠে দিল তার পায়ে কামড়ে।

ডাকাত লাফিয়ে নামল উঠানে। খড়ের গাদায় গাধা ছিল, মারল এক লাথি। ডাকাত ছিট্‌কে পড়ল।

গোলমালে মুরগী তখন জেগেছে। সে অন্ধকারে ডেকে উঠলো—কঁকর কোঁ কঁক্ কঁক্।

সর্দার আর পিছন পানে তাকাল না। লম্বা দৌড় দিল। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল—সত্যি ভূত নেমেছে। দেখ, আমার মুখ আঁচ্‌ড়ে দিয়েছে, পায়ে কামড়েছে, পেটে ঘুসি মেরেছে, পালিয়ে আসার সময় পিছনে চীৎকার করেছে—ভাগ্ যাউ, ভাগ্ ভাগ্!

চোরেরা বলল—এ বাড়ীতে আর থাকা চলবে না।

চোরেরা বাড়ী ছেড়ে চলে গেল।

চার বন্ধুতে সেই বাড়ীতে রয়ে গেল। খায় আর ঘুমায়।—

দুঃখ-কষ্ট সব জীবনেই আছে
ভেঙে পড়ার মত কিছু নয়।
দুঃখের ভারে নত হবে কেন,
বুদ্ধি দিয়ে দুঃখ কর জয়॥

বাবুই পাখীর লড়াই

গরমের দিন। এক বাঘ আর এক ভালুক বেড়াতে বেরিয়েছে বনে। এক গাছের উপর এক পাখী ডাকছিল, ভালুক বলল—ভাই, ওটা কি পাখী?

বাঘ বলল—বাবুই পাখী। পাখীদের মধ্যে ওরাই হল সব চেয়ে বাবু। ওদের বাসা দেখলে তুমি অবাক হবে।

ভালুক বলল—কেমন করে দেখব ওদের বাসা?

—দাঁড়াও পাখীটা উড়ে যাক্, তারপর গাছে উঠে দেখাব।

গান গাইতে গাইতে বাবুই উড়ে গেল। বাঘ ভালুক গাছে উঠল। গাছের ডালে বাবুই পাখীর বাসা ঝুলছে। বাসার মধ্যে পাঁচ-ছটা ছোট ছোট বাচ্চা। বাসার ভিতরটা একবার দেখে নিয়ে ভালুক বলল —ধুৎ, এই বাসা তুমি আমাকে দেখাতে নিয়ে এলে?

বাঘ বলল—বাসাটা কেমন বুনেছে।

ভালুক বলল—তা বুনুক, কিন্তু কতটুকু জায়গায় কতগুলো পাখী থাকে,—এ তো ছোটলোকের বাসা, তুমি বলছ এরা বাবু। এদের চেয়ে কাক চিলের বাচ্চারা অনেক আরামে থাকে।

একটা বাচ্চা কিচ্ মিচ্ করে উঠল,—পিক্ পিক্ পিক্—তুমি আমাদের ছোটলোক বলছ, মা আসুক, আমরা বলব।

ভালুক বলল—ঠিক বলেছি, সত্যি কথা বলব, কাউকে ভয় করি নাকি?

সব বাচ্চাগুলো একসঙ্গে পিক্ পিক্ করে উঠল। বাঘ আর ভালুক নেমে এল গাছ থেকে।

বাবুই পাখী বাচ্চাদের খাবার নিয়ে ফিরল। বাচ্চারা বলল—জানো মা, ভালুক এসে আমাদের বলেছে ছোটলোক।

বাবুই-মা বলল—আচ্ছা, আমরা দেখছি।

খানিক পরে বাবুই-কর্তা বাসায় ফিরল, সব শুনে বলল—আমি দেখছি।

বাবুই তখনই গেল ভালুকের বাড়ী। পাহাড়ী গুহার মধ্যে ভালুক থাকে। বাবুই বলল—তুমি আমার ছেলেদের ছোটলোক বলে এসেছ কেন?

ভালুক বলল—বেশ করেছি।

—তোমাকে আমি এই বনে থাকতে দোব না। তোমাকে মাপ চাইতে হবে।

—যা পারিস করগে যা!

—বেশ, তোমার সঙ্গে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করলাম।

পাখী চলে এল। ভালুক বাঘকে সব কথা বলল। বাঘ বনের সব জানোয়ারকে ডেকে বলল—লড়াই হবে পাখীদের সঙ্গে, সবাই তৈরী হও।

ওদিকে বাবুইও পাখীদের ডেকে বলল—জানোয়াররা আমাদের ছোটলোক বলেছে, লড়তে হবে।

দু'দলই তৈরী হল।

পাখীরা মশাকে পাঠাল শত্রুপক্ষের খবর নিতে। মশা সারা বন ঘুরে খবর জোগাড় করল। সে শুনল, ভালুক শিয়ালকে করেছে সেনাপতি। শিয়াল তাদের পথ দেখিয়ে যুদ্ধে নিয়ে যাবে। শিয়াল বলেছে—আমি সবাইকার আগে লেজ তুলে যাব। আমার লেজের ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া লাল লোম ঝোপঝাড়ের সবুজ গাছ-পাতার মধ্যেও ঠিক নজরে পড়বে। তোমরা সেই লেজ দেখে আমার পিছু পিছু আসবে। তোমরা লড়াইও করবে আমার এই লেজ দেখে। এই লেজই হল নিশানা, যতক্ষণ এই লেজ উঁচু থাকবে, বাতাসে উড়বে, ততক্ষণ জানবে আমরা জিতছি।

ভালুক বলল—আর যদি দেখি লেজ নামিয়ে নিয়েছ?

শিয়াল বলল—লেজ নামিয়ে নিলেই জানবে আমরা হেরে গেছি। তখন যে যেদিকে পারবে প্রাণ নিয়ে পালাবে। তবে পাখীদের কাছে আমরা হারব না, এ তুমি ঠিক জেনো।

সব জানোয়ার বলল—আরে, ওরা কতটুকু আর আমরা কত বড়—হারব কী!

শিয়ালের লাল লেজ দেখে জানোয়ারের দল লড়াই করতে চলল।

মশা তো সব শুনেছে, ফিরে এসে বলল বাবুইকে।

বাবুই বলল—বেশ, ওর লেজ আমি নামিয়ে দোব।

জানোয়ারের দল এসে পৌঁছাল বাবুই পাখীর বাসার নীচে। আর পাখীর দল এসে বসল গাছের মাথায়।

সব জানোয়ার একসঙ্গে ডাক দিল, বলল—আয়, দেখে নোব।

সব পাখী ডানার ঝাপ্‌টা মেরে বলল—তোদের ঠুক্‌রে খাব।

পাখীদের সেনাপতি বাবুই নিজে। ভাল করে সবকিছু দেখেশুনে নিয়ে সে ডাক দিলে ভীমরুলের সর্দারকে। বলল—তুমি আগে যাও, শিয়ালের ওই উঁচু লেজ নামাতে হবে।

ভীমরুলের ঝাঁক উড়ে গেল। সোজা গিয়ে বসল শিয়ালের লাল লেজে। এক কামড় খেয়েই শিয়াল লাফিয়ে উঠল। কিন্তু লেজ নামাল না।

দুই কামড়। শিয়াল লেজটা জোরে জোরে নাড়তে লাগল।

তিন কামড়। যাতনায় শিয়াল অস্থির হয়ে পড়ল। আর সইতে পারল না। লেজ গুটিয়ে নিয়ে পা দিয়ে ভীমরুল ছাড়াতে চাইল। তখন আরো কয়েকটা ভীমরুল তার গায় বসল। শিয়াল আর সেখানে দাঁড়ল না, এক লাফেই সেখানে থেকে সরে পড়ল।

পিছনে জানোয়াররা দেখল—লেজ নেমে গেছে, শিয়াল পালাচ্ছে। তারাও দাঁড়ল না, দৌড় দিল জঙ্গলের মধ্যে।

বাবুই এবার হাসল, বলল—আমরা জিতেছি।

বাচ্চারা বলল—কিন্তু সেই ভালুকটার কি হল? সে তো মাপ চাইল না?

বাবুই গেল ভালুকের গুহায়, বলল—কি, মাপ চাইবে, না তোমাকে বন থেকে তাড়ব?

ভালুকের সুর তখন অনেক নেমে গেছে। গুহা থেকে বেরিয়ে এসে বলল—তোমাদের ছোটলোক বলা আমার অন্যায় হয়েছে, আমাকে মাপ কর।

বাচ্চারা এবার খুসি হল। বলে উঠল—পিক্ পিক্ পিক্—

যেমন ছোটলোক বলা,
তেমন খেল কানমলা।

সেদিন পাখীরা সারাদিন জয়োৎসব করল, পাপিয়া সারারাত পাখীদের গান শোনাল। কেউ ঘুমুল না। ভোরবেলা মুরগী ডেকে বলল—কঁকর কোঁ—এবার সবাই শুতে যাও।—

বুদ্ধি-বল সবার সেরা বল, গায়ের জোর তুল্য নয় ক' তার।
যতই শক্তি থাক্ না কেন গায়, বুদ্ধিবলে হবেই তার হার॥

বনপথের বাঁশীওয়ালা

একদিন এক বাঁশীওয়ালা বনের পথ দিয়ে চলেছিল বাঁশী বাজাতে বাজাতে। গভীর বনে বাঁশীওয়ালা চলেছে আপন মনে। বাঁশীর সুর গাছের পাতায় সাড়া তুলছিল, হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছিল বনের গভীরে বাঁশীওয়ালা বাঁশী বাজিয়েই চলেছিল।

বনের জানোয়ার সেই বাঁশী শোনে। এক বাঘ সেই বাঁশীর সুর শুনে আর থাকতে পারল না, এগিয়ে এল, বলল—ভারী সুন্দর তুমি বাঁশী বাজাও, আমাকে শেখাবে?

সামনে বাঘ দেখে বাঁশীওয়ালা চম্‌কে উঠল, বলল—কেন শেখাব না?

—তবে শেখাও বাঁশীতে ফুঁ দেওয়া।

—আগে তুমি আমার সাগরেদ্ হও, যা বলি তাই কর তবে তো শেখাব।

—বেশ সাগরেদ্ হব, বল কি করতে হবে?

সামনেই ছিল এক বড় গাছের মস্ত কোটর, বাঁশীওয়ালা বলল—ওই কোটরের মধ্যে চুপ করে সন্ধ্যে অবধি অন্ধকারে বসে থাকতে হবে, পারবে?

—পারব।

বাঘ কোটরে ঢুকে গেল। বাঁশীওয়ালা একখানা বড় পাথর দিয়ে কোটরের মুখ বন্ধ করে দিলে। বললে—এই অন্ধকারে বসে থাক, যতক্ষণ না আমি ফিরে আসি।

বাঁশীওয়ালা এগিয়ে চলল বাঁশী বাজাতে বাজাতে।

বনের জানোয়ার সেই বাঁশী শোনে। এক শিয়াল সেই বাঁশী শুনে আর থাকতে পারল না, এগিয়ে এল, বলল—ভারী সুন্দর তুমি বাঁশী বাজাও, আমাকে শেখাবে?

বাঁশীওয়ালা চমকে উঠল, বলল—কেন শেখাব না। আগে আমার সাগরেদ্‌ হও।

—কি করতে হবে বল?

—বাঁশ থেকে বাঁশী হয় জান তো?

—জানি।

—বাঁশীতে সুর তুলতে হলে আগে বাঁশ ধরে ঝুলতে হয়। পারবে?

—পারব।

সামনেই বাঁশঝাড়। বাঁশীওয়ালা একটি বাঁশকে ধরে ধীরে ধীরে নত করল, ধনুকের মত বেঁকিয়ে তার আগাটা নিয়ে এল পায়ের কাছে। আগার সঙ্গে শিয়ালের পাদুটি শক্ত করে বাঁধল, তারপর বাঁশটি ছেড়ে দিল। বাঁশ সোজা খাড়া হয়ে গেল। শিয়াল ঝুলতে লাগল বাঁশের আগায়। বাঁশীওয়ালা বলল—ওইখানে খানিকক্ষণ ঝোল, হাত ঠিক হোক, তারপর আমি ঘুরে আসছি।

বাঁশীওয়ালা চলল বাঁশী বাজাতে বাজাতে। বনের জানোয়ার বাঁশী শোনে। এক খরগোস আর থাকতে পারল না, ছুটে এল, বলল—চমৎকার বাজাও তুমি, শেখাবে আমাকে?

—কেন শেখাব না। আগে আমার সাগরেদ্‌ হও।

—কি করতে হবে বল?

—গলায় একটা দড়ি বেঁধে গাছের নীচে বসে গলা সাধতে হবে, তবে গলা দিয়ে বাঁশীর মত ফুঁ বেরুবে।

—বেশ, তাই করব।

বাঁশীওয়ালা একটা খড়ের দড়ি পাকাল, সেইটি বাঁধল খরগোসের গলায়, তারপর সেই দড়ি বেঁধে দিল গাছের ডালে। বলল—তুমি এখানে বসে মুখ দিয়ে শুধু শ্বাস ফেলা অভ্যাস কর, আমি ঘুরে আসি।

বাঁশীওয়ালা বাঁশী বাজাতে বাজাতে চলে গেল।

বেলা দুপুর হয়ে গেল। বাঘ এদিকে অধৈর্য হয়ে পড়ল। এমন ভাবে কি সারাদিন অন্ধকারে বসে থাকা যায়? দরকার নেই তার বাঁশী বাজানো শেখা। পাথর ঠেলে সে গাছের কোটর থেকে বেরিয়ে এল। তারপর চলল বাঁশীওয়ালার খোঁজে।

বাঘকে দেখেই শিয়াল ডাকল, বলল—মামা, কোথায় যাচ্ছ?

বাঘ থমকে দাঁড়াল, বলল—ও কি?

—এক বাঁশীওয়ালা এখানে আমাকে তুলে দিয়ে গেছে। ঝুলে ঝুলে কাঁধে ব্যথা হয়ে গেল, এখন নামি কি করে তাই ভাবছি।

—আমি তোমাকে নামিয়ে দিচ্ছি, বলে বাঘ বাঁশের গোড়ায় কামড় দিতে সুরু করল। বাঘের শক্ত দাঁত। কামড়ে কামড়ে সে বাঁশটার গোড়া কেটে ফেলল। বাঁশ ভেঙ্গে পড়ল। শিয়াল মাটিতে নামল। পায়ের বাঁধন কেটে সে বলল—চল তো মামা, একবার সেই বাঁশীওয়ালার খোঁজ করি।

দু'জনে চলল।

পথে গলায় দড়ি দিয়ে গাছের ডালে বাঁধা খরগোস। শিয়াল বলল—এ কি ব্যাপার?

খরগোস বলল—বাঁশীওয়ালা বেঁধে রেখে গেছে।

শিয়াল তার বাঁধন কেটে দিল, বলল—বাঁশী বাজাতে শেখাব না বললেই তো হত, এই চালাকির দরকার কি ছিল?

খরগোস বলল—আমাদের ঠকিয়েছে।

বাঘ বলল—দেখতে পেলেই হালুম করে লাফিয়ে পড়ব ঘাড়ের উপর।

তিনজনে এগিয়ে চলল।

এদিকে বাঁশীওয়ালা চলেছে বাঁশী বাজাতে বাজাতে। এক কাঠুরে বনে কাঠ কাটছিল, বাঁশী শুনে তার কাঠ কাটা বন্ধ হল। বলল—বাঃ! চমৎকার বাজাও তুমি, কান জুড়িয়ে গেল। নদীর ধারে বসে একটু বাজাবে, শুনব?

বাঁশীওয়ালা বলল—তাহলে কাট কাটবে কে?

কাঠুরে বলল—কাঠ তো রোজই কাটি, কিন্তু বাঁশী তো রোজ শুনতে পাই না। আজ যখন পেয়েছি তখন তোমায় ছাড়ব না।



নদীর ধারে বসে বাঁশীওয়ালা বাঁশীতে সুর ধরল। এতক্ষণে এক-জন মানুষ শ্রোতা পেয়ে সে খুসি হল, মনের আনন্দে বাঁশী বাজাল।

বাঁশীর সুর শুনে বাঘ শিয়াল খরগোস সেখানে এসে পড়ল।

বাঘ বললে—হালুম! এবার তোকে শেষ করব।

শিয়াল বললে—হুক্কা হুয়া—চালাকি কিয়া,

এবার বাঘের মুখে পরাণ গিয়া।

খরগোস হেসে উঠল—খিক্ খিক্ খিক্—

যেমন কর্ম তেমনি সাজা নিক্।

কাঠুরে বলল—বটে, বাঁশীর সুর কেটে দিলি। আর এক পা যদি কেউ এগিয়ে আসিস্ তো এই কুড়ুলের এক এক কোপে তোদের এক একটাকে দু'খানা করে দেব। ভাল চাস্ তো সরে পড়।

কুড়ুলের পানে তাকিয়ে শিয়াল বলল—মামা, সরে পড়াই ভাল।

বাঘ শিয়াল খরগোস গুটি গুটি সরে পড়ল। বাঁশীওয়ালা খোস-মেজাজে বাঁশীতে নতুন সুর ধরল।—

গাইয়ে বাজিয়ে মনের মানুষ চায়।
রসিক পেলে আনন্দে গান গায়॥

সুলতান

এক রাখালের একটি কুকুর ছিল। রাখাল কুকুরের নাম রেখেছিল সুলতান। অনেক দিনের কুকুর। বুড়ো হয়েছে। দাঁত পড়ে গেছে। রাখাল একদিন তার বউকে বলল—কুকুরটাকে দূর করে দাও। একটাও দাঁত নেই, শিয়ালেও আর ওকে ভয় করে না। ওকে দিয়ে আর পাহারার কাজ চলবে না।

রাখাল-বৌ বলল—অনেক দিনের কুকুর, বুড়ো হয়েছে, তাড়াব কেন, আছে থাক।

রাখাল বলল—না, বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে পারব না। পথে চরে খাকগে।

কুকুর সব শুনল, মনের দুঃখে সন্ধ্যাবেলা সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। বনে ছিল তার পুরান বন্ধু এক বাঘ। বাঘকে ডেকে বলল তার দুঃখের কথা।

বাঘ বলল—কোন ভাবনা নেই। রাখাল-বৌ ছেলে নিয়ে রোজ মাঠে যায়। ছেলেটাকে গাছতলায় শুইয়ে রেখে মাঠের কাজ করে। কাল তুমি ছেলেটার কাছে বসে থাকবে। আমি একটু সুযোগ বুঝে ছেলেটাকে মুখে নিয়ে দৌড় দেব। তুমিও পিছনে ছুটবে। আমি

তখন ছেলেটাকে ফেলে দিয়ে চলে যাব। সবাই ভাববে তুমিই ছেলেটাকে রক্ষে করেছ। তখন তোমাকে আবার খাতির করবে।

ফন্দিটা কুকুরের মনে ধরল। পরদিন সুলতান গাছতলায় ছেলেটির কাছে কাছে ঘুরতে লাগল। বাঘ এসে ছেলে মুখে নিয়ে দৌড় দিল, সুলতান তাড়া করল পিছনে। বাঘ পালাল। সুলতান ছেলেটাকে মুখে করে নিয়ে ফিরে এল। রাখাল-বৌ সুলতানকে অনেক আদর করল, বলল—তোর জন্যেই আজ খোকা রক্ষে পেয়েছে।

বাড়ীতে সুলতানের আদর হল।

এবার বাঘ একদিন বলল—তোমার কাজ তো হল। এবার আমাকে একদিন খুসি কর। রাখালের একটা বাচ্চা ভেড়া আমি একদিন ধরে আনি।

সুলতান বলল—সেটা কি ঠিক হবে, যার খাই চোখের উপর তার ক্ষতি হবে।

বাঘ বলল—আমার ফন্দি ছিল বলেই তো খাচ্ছ, না হলে ?

কুকুর আর কিছু বলল না। বাঘ চলে গেল।

রাতে বাঘ এল রাখালের খোঁয়াড়ে। সুলতান জানতে পেরেই চীৎকার করে রাখালকে জাগিয়ে দিলে। রাখাল লাঠি নিয়ে তাড়া করল বাঘকে।

বাঘ ক্ষেপে গেল। সকালে বনশূয়োরকে পাঠাল, বলল—সুলতানকে বলো, এবার তাকে দেখতে পেলেই আমি তার ঘাড়ে পড়ব। সাহস থাকে তো বনে আসুক।

সুলতান শূয়োরকে বলল—বেশ, আমি বনে যাব বাঘের সঙ্গে লড়তে।

বিড়ালকে ডেকে সুলতান বলল—তুই যাবি আমার সঙ্গে, বাঘের লড়াই দেখবি।

বিড়ালকে নিয়ে কুকুর চলল বনে। বিড়াল লেজ উঁচু করে আসছে বাঘ দেখতে পেল। বাঘ ভাবল—ওটা কি, তলোয়ার নাকি ?

শূয়োর বলল—বলা যায় না। তলোয়ার হতে পারে। মানুষের বাড়ীতে সব কিছুই থাকে। আগে ভাল করে দেখে তবে এগোবে।



বাঘ ভাল করেদেখার জন্য গাছে উঠল। শূয়োর লুকাল এক ঝোপের আড়ালে।

কুকুর ও বিড়াল এসে দেখে কেউ কোথাও নেই। তারা অবাক হল।

সহসা বিড়ালের নজরে পড়ল, ঝোপের পাশে একটা ইঁদুর নড়ছে, সে ঝাঁপিয়ে পড়ল ইঁদুরটার উপর। আসলে সেটা ইঁদুর নয়, শূয়োরের কানটা বেরিয়ে ছিল। বিড়াল সেই কান কামড়ে ধরল। শূয়োর লাফিয়ে উঠে বলল—আমি নয়, আমি নয়, ওই গাছের উপর দেখ—

কুকুর উপর পানে তাকাল, বাঘকে দেখে বলল—নেমে এস।

বাঘ তখন ভয় পেয়ে গেছে, সে নামতে চাইল না। বলল—আমি লড়ব না ভাই, মাপ কর।

কুকুর খ্যাঁক্ খ্যাঁক করে ধমক দিয়ে, সগর্বে যুদ্ধ জয় করে বিড়ালের সঙ্গে ফিরে এল।—

বুদ্ধি যাদের থাকে মাথায় অল্প
তাদের নিয়েই যত মজার গল্প।

ঝুট্-ঝামেলা

নাম হনুমন্ত সিং, সবাই ডাকত হনুমান বলে।

হনুমান জমিদার বাড়ীর চাকর। চাকরি করছে সাত বছর। শেষে একদিন বলল—কর্তা, আমি বাড়ী যাব। বাপ-মাকে অনেক দিন দেখিনি। আমার মাইনে চুকিয়ে দিন।

বিশ্বাসী চাকর। জমিদার সাত বছরের মাইনে দিলেন ঝক্‌ঝকে যত রূপার টাকা। রুমালে টাকা বেঁধে নিয়ে হনুমান বাড়ী চলল।

পথে এক ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে দেখা, হনুমান বলল—ঘোড়ার পিঠে কেমন বসে বসে যাচ্ছ, চলতে হয় না, হোঁচট খাবার ভয় নেই, কী আরাম!

ঘোড়সওয়ার বলল—তুমিও তো ঘোড়ার পিঠে যেতে পার।

—ঘোড়া কোথায় পাব?

—কিনবে।

—এখানে কে ঘোড়া বেচবে?

—ঠিকমত দাম পেলে আমারটাই আমি বেচে দেব।

—কত দাম দিতে হবে?

—তোমার কাছে টাকা আছে?

—সাত বছরের মাইনের টাকা আছে।

—সেইগুলো দাও, আমি ঘোড়া দিচ্ছি।

—বেশ তো, এই নাও।

হনুমান রুমাল সমেত টাকা তাকে দিলে। লোকটি ঘোড়া দিয়ে চলে গেল। হনুমান ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল।

রাশ টানতেই ঘোড়া ছুটল মাঠের উপর দিয়ে। হনুমান কখনও ঘোড়ায় চড়ে নি। নিজেকে সামলে নেবার আগেই, ঘোড়ার পিঠ থেকে সে পড়ে গেল। ঘোড়া ছুটে মাঠ পার হয়ে গেল।

এক রাখাল দেখতে পেয়ে ঘোড়াটাকে ধরল, নিয়ে এল হনুমানের

কাছে। হনুমান তখন গা থেকে ধুলো ঝাড়ছে। বলল—ঘোড়া তো বড় পাজী জানোয়ার, আমাকে পিঠ থেকে ফেলে দিলে। গরু এর চেয়ে অনেক ভাল। পিঠে চড়া যায় না বটে তবে দুধ দেয়—মাখন কর, ছানা কর, ঘি বানাও, সন্দেশ বানাও।

রাখাল বলল—তুমি গরু কিনবে?

হনুমান বলল—কেনার টাকা নেই, তবে এই ঘোড়াটার বদলে একটা গরু পেলে নিই।

—বেশ, আমি তোমাকে গরু দেব।

রাখাল ঘোড়ার বদলে গরু দিল। হনুমান গরু নিয়ে চলল। ভাবল—তেষ্টা পেলেই এই গরুর দুধ খাব, দুধ থেকে মাখন করে রুটিতে মাখাব। খাওয়ার একটা সুবিধা হল।

পথ চলতে চলতে দুপুর হয়ে গেল। মাথার উপর রোদ ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। গলা শুকিয়ে গেল। হনুমান একটা গাছে গরুটাকে বেঁধে দুধ দুইতে বসল। কিন্তু গরুর বাঁটে তো এক ফোঁটা দুধ নেই। বাঁট নিয়ে বেশি টানাটানি করতেই গরু মারল এক লাথি, হনুমান উল্টে পড়ে গেল। রীতিমত চোট্ লাগল, হনুমান গাছতলায় বসে রইল চুপ করে।

এক রাখাল চলেছিল, এক পাল ছাগল নিয়ে। বলল—তুমি কে গা? এখানে বসে আছ কেন?

হনুমান বলল—বসে আছি কি সাধে? গরুতে চোট্ মেরেছে।

—পোষা গরু চোট্ মারলে?

—না, নতুন কেনা গরু। দুধ দুইতে গেলাম, মারলে লাথি!

—এ তো বুড়ো গাই, এ কি দুধ দেবে? একে দিয়ে হবে ধান মাড়াই—ডাল মাড়াইয়ের কাজ, নয়তো ঘানি টানবে।

—কিন্তু আমি যে দুধ খাব বলেই একে কিনলাম।

রাখাল হাসল, বলল—দেখে কেনো নি? এর চেয়ে একটা ছাগল কেনাও ভাল ছিল। তবু আধসের-তিনপোয়া দুধ পেতে।

—তুমি ছাগল বেচবে?

—তুমি কিনবে ?

—এই গরুটার বদলে আমাকে একটা ছাগল দাও।

—পরে বলবে না তো যে ঠকিয়েছে ?

—না না, দুধ পেলেই আমি খুসি হব।

রাখাল একটা ছাগল দিয়ে গরুটা নিয়ে গেল।

কিছুটা গিয়েই ছাগল আর নড়তে চায় না, দল ছাড়া হয়ে সে আর এগোবে না। মারলে এমনভাবে ব্যা ব্যা করে কাঁদে যে মারতেও ইচ্ছা হয় না। হনুমান ভাবে—পথের মাঝে এ তো এক আপদ হল।

এমন সময় একজনকে দেখা গেল, একটা হাঁস নিয়ে চলেছে। হনুমান বলল—হাঁস নিয়ে কোথায় যাচ্ছ ?

—যাচ্ছি বাজারে বেচতে।

—তুমি তো বেশ যাচ্ছ, আমি এই ছাগলটাকে নিয়ে যাই কি করে বলত ?

—ও তোমার কাজ নয়, আমি ওকে ঠিক নিয়ে যেতে পারি।

—বেশ তো, তুমি এটাকে নিয়ে চল। আমি তোমার হাঁসটা বহে নিয়ে যাচ্ছি।

ছাগলের দড়িটা সে হাঁসওয়ালার হাতে দিলে। হাঁসওয়ালা হাঁসটা তুলে দিলে হনুমানের হাতে। হাঁসটা দিব্যি আরামে পড়ে থাকে হাতের উপর, হনুমান গট্‌ গট্‌ করে হাঁটতে থাকে।

হাঁসওয়ালা ছাগলটাকে টানতে টানতে নিয়ে আসে। হনুমান দেখে বলে—ভাই, ছাগলটা তুমি নেবে, এই হাঁসটার বদলে ?

হাঁসওয়ালা বলল—তা মন্দ নয়।

—বেশ, তবে তাই হোক, ও ছাগল তোমার, এই হাঁস আমার।

হনুমান হাঁস বগলে নিয়ে জোরে জোরে পা চালাল, ভাবল খুব জিতেছি, রোজ সকালে একটা করে ডিম পাব আর ভেজে খাব।

চলতে চলতে হনুমান এল এক গাঁয়ে। গাঁয়ের পথে এক শান-ওয়ালা ছুরি শানাচ্ছে আর গাইছে—

ঘুরে বেড়াই পথে ঘাটে হাটে
গাঁয়ের মানুষ সবাই আমার চেনা।
ছুরি-কাঁচি পালিশ করে খাই,
কারও কাছে নেইক' কোন দেনা।
ঘুর ঘুর ঘুর ঘোরাই চাকাখানি,
যা কিছু পাই ভাগ্য বলে মানি,
—আর ভগবানকে জানি।

হনুমান খানিক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল ছুরি শান দেওয়া, শুনল শানওয়ালার গান, বলল—তোমার শান-পালিশের কাজে বেশ রোজগার হয়, না ?

—দিন চলে যায়। তা তুমি ওই হাঁসটাকে কি হাট থেকে কিনে নিয়ে এলে ?

—না, বদ্‌লিতে পেলাম।

—বদ্‌লি ?

—হ্যাঁ, একটা ঘোড়ার বদলে একটি গরু নিয়েছিলাম, গরুর বদলে ছাগল, তারপর সেই ছাগলের বদলে এই হাঁস নিয়েছি।

—ঘোড়াটা তোমার ?

—হ্যাঁ, আমি কিনেছিলাম। আমার কাছে ছিল ·ত বছরের চাকরির মাইনে, সেই টাকাটা দিয়ে ঘোড়াটা কিনেছিলাম।

—পয়সা তো তাহলে সব খরচ হয়ে গেছে, এখন চলবে কি করে ?

—একটা কোন কাজকর্ম করতে হবে।

—তুমি আমার মত শান-পালিশের কাজ কর। পয়সার অভাব হবে না। পকেটে হাত ভরলেই পয়সা পাবে।

—শান পাথর চাই তো একখানা তোমার মত।

—আমি দেব। ওই হাঁসটার বদলে তুমি পাথরখানা নিয়ে যাও। শান-পালিশ করে যে পয়সা রোজগার করবে তা দিয়ে অমন হাঁস অনেক কিনতে পারবে।

—এটা নেহাৎ মন্দ কথা বলনি, দাও তাহলে পাথর।

সামনেই একটা সাধারণ পাথর পড়েছিল, শানওয়ালা সেইটা তুলে দিলে হনুমানের হাতে। হনুমান হাঁসটা দিয়ে দিলে শানওয়ালাকে।

পাথরখানা কাঁধে নিয়ে হনুমান হাঁটতে সুরু করল। সে ভারী খুসি। এই পাথরে ছুরি কাঁচি বঁটি কাটারি শান দিয়ে সে অনেক পয়সা পাবে।

ভারী পাথর। বইতে বইতে গা দিয়ে ঘাম ঝরে। এক নদীর তীরে এসে হনুমান বসে পড়ল। পাথরখানি রেখে হাতমুখ ধুয়ে সে জল পান করল। তারপর হঠাৎ তার পায়ের ধাক্কা লেগে পাথরখানি গরগর করে জলে নেমে গেল।

হনুমান দেখল, কিন্তু জল থেকে পাথরখানি আর তোলার চেষ্টা করল না। বলল—যাক, ভারী পাথরখানি বইবার কাজ থেকে বাঁচলাম। ভগবান আমাকে সব বোঝা থেকে মুক্তি দিলেন। ঝুট্-ঝামেলা সব গেল, এবার দিব্যি হেঁটে বাড়ী চলে যাব।

হাসতে হাসতে হনুমান হাল্কা পায়ে নিজের গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছাল। বাড়ীর দরজায় গিয়ে ডাকল —মা, আমি এসেছি।—

সরল যারা সহজ যারা অচল তারা জীবনে,
বোঝে না ছলা চাতুরীকলা সদাই ঠকে ভুবনে।
বুঝেও কভু বোঝে না তারা লাভ ক্ষতির অর্থ কি,
রাত্রি দিন ভাবনাহীন জীবন তাদের সার্থকই॥

পরী-বাগান

বনের পাশে একঘর কাঠুরের বাস। কাঠুরে রোজ বনে যায় কাঠ কাটতে। একদিন বিকালে বন থেকে ফিরে এসে কাঠুরে বলল —দেখ, গিন্নী, নদীর ধারে ওই যে ডুমুর গাছটা আছে, ওর নীচে আপ্‌না-আপ্‌নিই একটা ভারী চমৎকার ফুলবাগান হয়েছে, সন্ধ্যার পর মনে হয় কারা যেন ওই বাগানে ঘোরাফেরা করে, অন্ধকারে

ভালোমত ঠাহর করা যায় না। তবু মনে হয় কারা কি যেন বলছে, কারা যেন ফিস্ ফিস্ করে কথা কইছে। ওদিকে ছেলেমেয়েরা যেন খেলতে না যায় নজর রেখো, কি ভূতপ্রেত ওখানে আছে কে জানে।

কাঠুরের একটি মাত্র মেয়ে। কাঠুরে-বৌ মেয়েকে বলে দেয়—মণি-মা, কখনও যেও না ওই ডুমুরগাছটার নীচে।

মণিমালা বলল—ওখানে খুব ভাল ভাল ফুল ফোটে, মা।

কাঠুরে-বৌ বলল—তা ফুটুক, ওখানে দত্যি আছে, ফুল তুলতে গেলেই ধরে নিয়ে যাবে।

মণিমালা সেদিন থেকে ওদিকে যায় না।

পাশের বাড়ীর ছেলে মুকুলের সঙ্গে একদিন লুকোচুরি খেলতে খেলতে মণিমালা সেই ঝোপের নীচে গিয়ে লুকাল। খেলতে খেলতে



মনে ছিল না মায়ের বারণ। ঝোপের ভিতর ঢুকেই দেখে একটি ছোট্ট ফুটফুটে কুকুর-ছানা। মণি সেটিকে ধরতে গেল। ছানাটা লাফিয়ে পালিয়ে গেল। তাকে ধরার জন্য মণি আরো এগিয়ে গেল। পায় পায় সে গিয়ে পড়ল একেবারে বনের মধ্যে।

বনের মধ্যে খানিকটা জায়গা জুড়ে ফুল ফুটে বাগান হয়ে আছে। ছোট ছোট পরী-ছেলেমেয়েরা সেই ফুলের উপর নাচছে, তাদের

ডানায় রোদ পড়ে ঝিক্‌মিক্‌ করছে। মণি অবাক হল। কুকুরের কথা ভুলে গিয়ে তাদের পানে তাকিয়ে রইল।

নাচ থামিয়ে এক পরী এগিয়ে এল মণির কাছে, বলল—তুমি এসেছ আমাদের নাচ দেখতে? এস—এস।

এবার বাকি সব পরীদের ডেকে নিয়ে মণিকে ঘিরেই তারা নাচতে স্থুরু করল। কখন ঘাসের উপর নাচে, কখন বা ফুলের উপরে উড়ে উড়ে নাচে। মণি যত দেখে তত ভাল লাগে।

পরীরা বলল—চল, আমাদের রাণীর বাড়ী।

মণিকে তারা নিয়ে গেল এক চমৎকার বাড়ীতে। ফুল দিয়ে ঘেরা বাড়ী। গানের স্থুরে ভরা। সেখানে মণিকে তারা খেতে দিলে মধু আর রকমারি মিষ্টি ফল।

মণি বলল—রাণী কোথায়? রাণীকে দেখব।

এক পরী বলল—রাণীকে এখন দেখা যায় না, রাণী আসেন বসন্ত-কালে।

আর একবার নাচ দেখে মণি বলল—এবার আমি বাড়ী যাই, মা ভাববে।

এক পরী মণিকে বনের বাইরে পৌঁছে দিলে।

মণি বনের বাইরে এসে দেখে সকাল হয়েছে, সূর্য উঠছে। সারারাত ওই বনের মধ্যে কেটে গেছে, সে বুঝতে পারেনি। ভয়ে ভয়ে মণি বাড়ীর পানে চলল।

বাড়ীর সামনে বাবা বসেছিলেন, বাবার বয়স যেন অনেক বেড়ে গেছে, মণি ডাকল—বাবা?

বাবা মুখ তুলে তাকালেন, বললেন—কে?

—আমি মণিমালা।

মণি! গলার স্বর শুনে মা বেরিয়ে এলেন, মা তাকে দেখেই চিনলেন, বললেন—মণি-মা, সাত বছর কোথায় ছিলি মা?

সাত বছর! মণি তো শুনেই অবাক। সে ত একটা রাত মাত্র কাটিয়েছে পরী-বাগানে।

মা বললেন—আমরা ভেবেছিলাম বনের মধ্যে তোকে বাঘে টেনে নিয়ে গেছে।

বাবা বললেন—সারারাত তোকে খুঁজেছি, কোথাও পাইনি।

মণি পরী-বাগানের কথা বলল বাবাকে মাকে।

দিন যায়। মণি ভয়ে ভয়ে আর কখনো সেই ঝোপের কাছে যায় না। পরীদেরও সে আর দেখতে পায়নি। এখন মনে হয় সে ঘটনা যেন একটা স্বপ্ন!

পাশের বাড়ীর ছেলে মুকুলের সঙ্গে মণিব বিয়ে হল।

কিছুদিন পরে মণির একটি মেয়ে হল। ফুটফুটে মেয়ে। মণি তার নাম রাখল পরী।

পরী হাঁটতে শেখে। দুপুরে বিকালে খেলা করে নিজেদের বাগানে। একদিন মণির নজরে পড়ে পরীর গলায় একটা ফুলের হার। এই ধরনের হার সে দেখেছিল পরীদের গলায়। মণি ভাবল —তাইত, কোথা থেকে এল এই হার?

মণি সেদিন একটু আড়াল থেকে নজর রাখল। দেখে বিকালে পরীবাগানে গেলেই এক পরী এসে তার মেয়ের সঙ্গে খেলা করে। তারপর কোন এক সময় খুকির হাত ধরে পরী ফুলগাছগুলির উপর দিয়ে উড়ে উড়ে নাচতে থাকে। মণি ভয় পায়। খুকি হয়ঃ এখনি পড়ে হাত-পা ভাঙবে। তাড়াতাড়ি সে আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে, বলে—নামিয়ে দাও—মেয়েকে নামিয়ে দাও—

পরী হেসে খুকিকে নামিয়ে দেয়। তারপর একটা চিল হয়ে উড়ে যায় আকাশে।

রাতে মুকুল কাজ থেকে ফিরলে মণি তাকে পরীর কথা বলল। মুকুল বললে—বেশ, আমি কাল বনে গিয়ে দেখব কোথাও কোন ফুলবাগান আছে কি না।

পরদিন সকালেই মুকুল বনে গেল। সারাদিন ঘুরল, কিন্তু কোথাও কোন ফুলবাগান চোখে পড়ল না। সন্ধ্যাবেলা সে ফিরে এল।

সন্ধ্যার পরেই আকাশে মেঘ দেখা দিল। ঝড় জল সুরু হল। সুরু হল বাজপড়া। সারারাত চলল দুর্যোগ।

পরদিন সকালে মণি দেখল বনের সেই ঝোপগুলো বাজ পড়ে একেবারে পুড়ে গেছে। মাটি ঘাস সব কালো হয়ে গেছে। ঘাটের মাঝি এসে বলল এক অবাক করা গল্প। ঘাটের পাশই সে থাকে। সন্ধ্যাবেলা ঝড়ের সময় কে যেন তার দরজায় এসে বলল—'তোমার নাও নিয়ে আমরা ওপারে যাচ্ছি, এই নাও তোমার ভাড়া।' একখানি মোহর এসে পড়ল তার সামনে। তারপরেই সে দেখতে পেল, অমন ঝড় জলের মধ্যে একদল ছোট ছোট মানুষ তার নৌকায় চড়ে বসল, নৌকা ছেড়ে দিল। ঝড়ো হাওয়ায় শোনা গেল তাদের গান, তার দু'চরণ সে স্পষ্ট শুনেছে—

ভিন্ গাঁয়ের যাত্রী মোরা—ঝড়ের আগে যাই।
বনের মাঠে ফুল বাগানে আর তো মোরা নাই।
চাঁদের আলোয় উড়ে বেড়াই,
ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়াই,
হাসি খেলা ছড়িয়ে বেড়াই, আনন্দে গান গাই॥

মণি বুঝল পরীরা দেশ ছেড়ে চলে গেল। বাজ-পড়া ঝোপটার পানে সে তাকিয়ে রইল চুপ করে।—

ভাল জিনিষ অজানা যদি হয়,
ভাল তখন দেখতে করি ভয়।

পিক্‌লু

তার ভাল নাম কি ছিল কে জানে, সবাই তাকে পিক্‌লু বলেই ডাকত। পিক্‌লু চাষী। একদিন সকালে সে ক্ষেতে চাষ করছে এমন সময় মাথার উপর এক পাখী ডেকে উঠল—পিক্ পিক্ পিক্‌লু—

পিক্‌লুর লাঙল ঠেলা বন্ধ হল। একটা ছোট পাখী তার নাম

ধরে ডাকছে, ভাবছে বেশ মজা করছি। দেখাচ্ছি মজা! পিক্‌লু লাঙল ছেড়ে এগিয়ে গেল। আলের উপর থেকে একখানি পাথর কুড়িয়ে নিয়ে মারল পাখীটাকে। পাখী উড়ে গেল, পাথরখানি পড়ল লাঙলের এক গরুর মাথায়। গরুটা পড়ল আর মরল।

পিক্‌লু এমনটা হবে ভাবেনি। খানিকক্ষণ সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর সে মরা গরুর চামড়াটা ছাড়াতে বসল।

চামড়াখানি নিয়ে সে চলল মুচি-বাড়ী।

মুচি বাড়ীতে ছিল না। অনেক ডাকাডাকি করেও কারও সাড়া পাওয়া গেল না। পিক্‌লু জানালা দিয়ে দেখল ঘরের ভিতরে একটি লোকের সঙ্গে মুচি-বৌ গল্প করছে।

ওদিকে মুচি এসে পড়ল। মুচি দরজায় ডাকতেই ঘরের ভিতরের লোকটি একটা ভাঙা বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল, মুচি ঘরে ঢুকে তাকে আর দেখতে পেলে না।

মুচি আসতেই পিক্‌লু তাকে ডাকল, বলল—একখানা চামড়া এনেছি, নেবে?

মুচি বলল—কত দাম চাও?

পিক্‌লু বলল—টাকা পয়সার দরকার নেই, আমার একটা বাক্সের দরকার। এই চামড়াখানা রেখে, তুমি একটা বাক্স আমা.. দাও।

—বাক্স?

—হ্যাঁ, যে-কোন বাক্স। ভাঙা-ফুটো হলেও আমার আপত্তি নেই।

—ভাঙা বাক্স নেবে?

—পেলেই নিই।

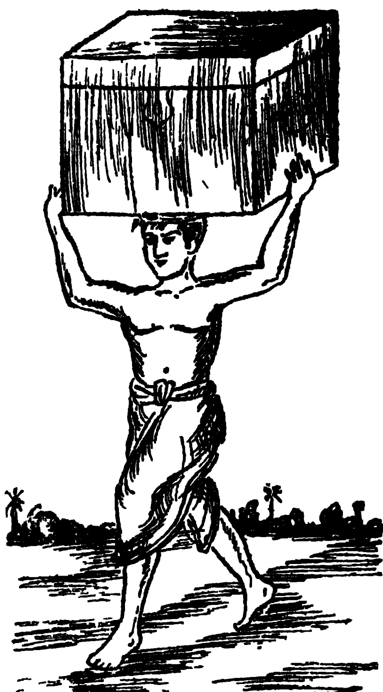
মুচি ভাঙা বাক্সটি দেখিয়ে বলল—এইটা নেবে?

পিক্‌লু তখনই চামড়াখানা দিয়ে বাক্সটি তুলে নিলে।

মানুষ ভর্তি বাক্স বইতে কষ্ট হয়, তবু পিক্‌লু বাক্সটি বহে নিয়ে চলল। ভিতরের মানুষটি বললে—কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে? ছেড়ে দাও।

পিক্‌লু বললে—তোমায় থানায় দেব, বলব—চুরি করতে ঢুকেছিলে আমার বাড়ীতে, লুকিয়ে ছিলে বাক্সের মধ্যে।

লোকটি ভয় পেল। ছেড়ে দেবার জন্য অনেক কাকুতি-মিনতি করতে লাগল, শেষে বলল—আমি তোমাকে এক হাজার টাকা দেব, আমায় ছেড়ে দাও।



পিক্‌লু হাজার টাকা নিয়ে তাকে ছেড়ে দিলে, ভাঙা বাক্স মাঠে ফেলে দিয়ে সে বাড়ী

হাতে টাকা পেয়েছে, পিক্‌লু তার কুঁড়েঘরকে নতুন করে বানাল, বাগানে নতুন বেড়া দিল, একজোড়া চাষের বলদ কিনল। সবাই দেখে বলল—এতো টাকা তুই পেলি কোথায়? নিশ্চয়ই চুবি করেছিস্!

তাঁরা পিক্‌লুকে ধরে নিয়ে গেল গাঁয়ের মোড়লেব কাছে। পিক্‌লু বলল—গরুর চামড়া বেচে হাজার টাকা পেয়েছি, তা-ই খরচ করেছি।

একখানা গরুর চামড়ার দাম হাজার টাকা? সবাই মুচির ঠিকানাটা জেনে নিলে। মোড়ল তো সবার আগে বাড়ী গিয়ে নিজের বলদটাকে মারল, তারপর তার চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে চলল সেই মুচির বাড়ী। মুচি তো সব দেখে শুনে বলল—আমি পিক্‌লুকে টাকা-পয়সা কিছুই দিই নি, তাকে শুধু একটা ভাঙা বাক্স দিয়েছি।

মোড়লের পিছু পিছু গিয়েছিল গাঁয়ের আরো ক'জন। তারা

তো বেজায় রেগে গেল, বলল—পিক্‌লুটা মিছে কথা বলেছে, তাকে উচিত-মত শিক্ষা দিতে হবে।

পিক্‌লু তাদেরকে মুচিবাড়ী যেতে দেখেছে, ফিরে এসেই তারা একটা গোলমাল বাধাবে। যদি মারধর করে তাহলে পিক্‌লু তো মুস্কিলে পড়বে। তাকে একটু আড়ালে থাকতে হবে, যেন গোলমাল দেখলেই পালাতে পারে। তাই বৌকে ডেকে বলল—দেখ গিন্নী, ওরা এসে গোলমাল করতে পারে, তোমাকে একটু সামলাতে হবে, আমি সেই ফাঁকে সরে পড়ব। তুমি আমাব চাদরখানা গায় জড়িয়ে আজ বাগানে কাজ করগে, যেন দূর থেকে দেখে ওরা মনে করে আমিই কাজ করছি। ওরা যখন তোমাকে এসে ধরবে তখন আমি খিড়কির দরজা দিয়ে চম্পট দেব।

ব্যাপারটা বেশ মজার হবে ভেবে গিন্নী রাজী হয়ে গেল। পিক্‌লুর চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে সে গেল বাগানে কাজ করতে।

মোড়ল ও পড়শীরা তখন ফিরছে। বাগানে পিক্‌লু আছে মনে করে একজন একখানা ইঁট ছুঁড়ে মারল তার দিকে। ইঁটখানা ধাঁই করে এসে লাগল পিক্‌লুর গিন্নীর মাথায়। সে পড়ল আর উঠল না।

পড়শীরা বিপদ দেখে সরে পড়ল। পিক্‌লু গিয়ে দেখল বৌ বাগানে মরে পড়ে আছে। একবার ভাবল থানায় খবর দেবে, কিন্তু তাতে আর লাভ কি হবে, মরা তো বাঁচবে না। পিক্‌লু তখন অন্য মতলব আঁটল। মরা বৌকে ঘরে এনে ভাল করে সাজিয়ে-গুজিয়ে সে নিয়ে চলল কাঁধে-করে। হাটের পথে এক পুকুরের পাশে গাছতলায় বৌকে বসিয়ে দিল, সামনে রেখে দিল একঝুড়ি টাট্‌কা আতা ফল।

এক বড়লোক টম্‌টম্ হাঁকিয়ে হাটে যাচ্ছিল, পথের পাশে বড় বড় আতা দেখে আতাওয়ালীকে জিজ্ঞাসা করল—কি দরে বেচছ?

কোন জবাব নেই।

বড়লোক আবার জিজ্ঞাসা করল—কি দর?

এবারও কোন উত্তর নেই।

আতাওয়ালীটা কালা নাকি ? না, ঘাড় হেঁট করে ঘুমুচ্ছে ?

বড়লোক টম্‌টম্‌ থেকে নেমে এসে আতাওয়ালীর কাঁধে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলল—আতা বেচবে না ঘুমুবে ?

সেই ঝাঁকানি লাগতেই আতাওয়ালী গাছের পাশ থেকে ঢলে পড়ল, পিছনেই পুকুর, গড়িয়ে পড়ল পুকুরে। পড়েই ডুবে গেল।

বড়লোক তো থ' হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

পিক্‌লু কাছেই ছিল, ছুটে এল। পুকুর থেকে গিন্নীকে তুলল, বলল—মরে গেছে। তুমি আমার বৌকে পুকুরে ডুবিয়ে মারলে, তোমায় আমি থানায় দেব।

বড়লোক বিপদে পড়ল, কোনমতেই সে পিক্‌লুকে বুঝাতে পারে না। সে যত বুঝাতে যায়, পিক্‌লু ততো চীৎকার করে। শেষ অবধি একটা পুলিশের হাঙ্গামা বাধবে দেখে বড়লোক বলল—যা হয়ে গেছে গেছে, তুমি কি চাও বল ?

পিক্‌লু বলল—টম্‌টম্‌খানা আমাকে দাও।

টম্‌টম্‌ নিয়ে পিক্‌লু বাড়ী ফিরল।

পিক্‌লুর গাড়ীঘোড়া দেখে পড়শীরা ঈর্ষায় জ্বলে উঠল, বলল—ব্যাটাকে মেরে ফেললাম আবার বেঁচে উঠেছে, এবার একেবারে মারব।

সবাই মিলে পিক্‌লুর বাড়ী চড়াও হল। তাকে ধরে এক থলির মধ্যে ভরল, বলল—এই থলি ফেলে দেব নদীর জলে, চোখের সামনে ডুবে মরবে!

তিন-চারজন পিক্‌লুর থলি বাঁশে বেঁধে নিয়ে চলল শ্মশানের দিকে, ওইখান থেকেই নদীতে ফেলে দেবার সুবিধা। পথে এক তাড়ির দোকান। যারা মড়া নিয়ে আসে তারা এইখানে বসে তাড়ি খায়। পিক্‌লুর পড়শীরা বলল—আমরাও এখানে তাড়ি খাব।

এক গাছতলায় থলিটা রেখে তারা তাড়ির দোকানে ঢুকল।

পিক্‌লু থলির মুখ খোলার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। তারপরেই তার কানে এল গরু-বাছুরের খুরের শব্দ আর হাম্বা হাম্বা

ডাক। পিক্‌লু থলির ভিতর থেকে চীৎকার করে উঠল—আমি মহাজন হাত চাই না, আমি মহাজন হব না।

রাখাল গরুর পাল নিয়ে বাড়ী ফিরছিল, থলির সামনে এসে বলল—থলির মধ্যে কে?

—আমি মহাজন হতে চাই না, আমি মহাজন হব না!

রাখাল থলির মুখ খুলে দিল, বলল—কি হয়েছে?

পিক্‌লু বলল—গাঁয়ের লোক আমাকে মহাজন করতে চাইছে, বলছে 'টাকা দেব, তুমি সবাইকে ধার দিয়ে সুদ আদায় করবে, আমাদেরকে হিসাব বুঝিয়ে দেবে।' আমি তা পারব না, টাকা-পয়সার হিসাব রাখা বড় শক্ত, সব গোলমাল হয়ে যাবে। তারা তা শুনবে না, আমাকে তারা মহাজন করবেই, তাই আমাকে এইভাবে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে।

রাখাল বলল—টাকা-পয়সার কাজ তো ভাল কাজ।

পিক্‌লু বলল—ভাল কাজ? তুমি মহাজন হবে?

—কেন হব না, কিন্তু আমাকে মহাজন করবে কে?

—তুমি আমার বদলে থলির মধ্যে ঢুকে পড়, তাহলেই হবে।

রাখাল থলির মধ্যে ঢুকে পড়ল, পিক্‌লু থলির মুখ বেঁধে রাখালের গরুর পাল নিয়ে ঘরে ফিরল।

এদিকে গাঁয়ের লোকেরা তাড়ি খেয়ে বেরিয়ে এল। রাখাল তখন থলির ভিতর থেকে বলল—আমি মহাজন হব।

তাড়িখোরের দল হেসে বলল—আলবৎ হবে, এখন তো নদীতে ডুববে চল।

ঘাটে গিয়ে থলিটা নদীতে ফেলে দিয়ে তারা বাড়ী ফিরল।

পিক্‌লুর বাড়ীর সামনে এসে তারা তো অবাক। পিক্‌লুর উঠানে গরু-বাছুরে ভরে গেছে, পিক্‌লু বাছুরগুলোকে ঘাস খাওয়াচ্ছে। একজন বলল—তোকে নদীতে ফেলে দিলুম, তুই এরই মধ্যে ফিরে এলি যে? এত গরু কোথায় পেলি? এত শীগ্‌গির ফিরে এলিই-বা কেমন করে?

পিক্‌লু হেসে বলল—সে অনেক কথা। ওই নদীর নীচে পরীরা থাকে। আমি তো একেবারে নীচে গিয়ে পড়েছিলাম। পড়ামাত্রই আমার থলির মুখ খুলে গেল। দেখি চমৎকার মাঠ, আর মাঠে চরছে গরুর পাল। এক ডানাওয়ালা রাখাল তাদের চরাচ্ছে, সে বলল—গরু নেবে তো নাও, যতগুলো তোমার দরকার।

বললাম—নিয়ে যাব কি করে?

রাখাল বলল—আমি পৌঁছে দেব।

—চোখের নিমেষে এই গরুগুলো শুদ্ধ সে আমাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে গেল।

পড়শীরা বলল—আমরাও নদীর নীচে গেলে এমনি গরু পাব?

পিক্‌লু বলল—আমি যখন পেয়েছি তখন তোমরা পাবে না কেন? তবে নদীর নীচে নেমে যেতে হবে।

—আমরা যাব নদীর নীচে।

পড়শীরা দল বেঁধে আবার নদীর দিকে রওনা হল।

আকাশে শাদা রঙের টুকরো টুকরো মেঘ ভাসছিল, সেই মেঘের ছায়া পড়েছিল নদীর জলে, পিক্‌লু বলল—ঐ দেখ নীচের গরুর গায়ের সাদা রঙ উপরেও দেখা যাচ্ছে।

পড়শীরা আর দেরী করতে পারল না, লাফিয়ে পড়ল নদীর জলে। গভীর নদী, জলের টানও আছে, সেই নদীর নীচে ডুব দেওয়া সহজ নয়। পড়শীরা নীচে ডুবতে গিয়ে কে কোথায় ভেসে গেল কে জানে।

পিক্‌লু নদীর তীর থেকে হাসতে হাসতে বাড়ী ফিরে এল, আবার বাছুরগুলোকে ঘাস খাওয়াতে বসল।—

চতুর যারা জানাবে তারা অনেক ছলা জানে।
সরল জনে সে কথা মেনে মজে ধনে প্রাণে॥

দুই বোন

এক বিধবার দুটি মেয়ে। একটি অপরূপ সুন্দরী আর একটি অতীব কুৎসিত। মা কুৎসিত মেয়েটিকেই বেশি ভালবাসতেন। আর ঘর-সংসারের যত কাজ সব করাতেন সুন্দরীকে দিয়ে।

সুন্দরীকে সারা দুপুরটা বসে বসে তক্‌লিতে সুতা কাটতে হত। তক্‌লি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আঙ্গুলে ব্যথা হয়ে যেত, তবু থামবার জো ছিল না। একদিন আঙ্গুল ফেটে রক্ত পড়তে সুরু করল। সুন্দরী কূয়াতলায় গেল হাতে জল দিতে। সেই সময় হাত ফস্‌কে তক্‌লি পড়ে গেল কূয়ার মধ্যে। সুন্দরী ছুটে এল মায়ের কাছে। ভয়ে ভয়ে বলল—মা, তক্‌লিটা কূয়ার ভিতরে পড়ে গেছে।

মা তো রেগেই আগুন, বলল—কোন কথা শুনব না। যে ভাবেই হোক তক্‌লি তোল্। রোজের হিসাব মত সূতা আমার চাই।

সুন্দরী কি করবে ভেবে পেলে না। শেষে কূয়ার মধ্যেই ঝাঁপিয়ে পড়ল। পড়েই জ্ঞান হারাল।

খানিক পরে সুন্দরীর জ্ঞান হল। চোখ মেলেই দেখে চমৎকার মাঠের উপর সে শুয়ে আছে। রোদে চারিপাশ ঝল্‌মল্ করছে, গাছে গাছে ফুল ফুটেছে, ডালে ডালে পাখী ডাকছে। সুন্দরী উঠে বসল। তারপর হাঁটতে সুরু করল সেই মাঠের উপর দিয়ে।

মাঠ পার হয়েই বন। বনের কিনারায় একখানি কুঁড়ে-ঘর। দরজা খোলা। ভিতরে ঢুকতেই চোখে পড়ল উনুনের উপর সারি সারি রুটি সেঁকা হচ্ছে। রুটিগুলি বলে উঠল—আমাদের নামিয়ে নাও। নাহলে আমরা এবার পুড়ে যাব।

সুন্দরী রুটিগুলিকে উনান থেকে নামিয়ে গুছিয়ে রাখল।

বাড়ীর উঠানে একটি আপেল গাছ, সুন্দরীকে দেখেই গাছটি বলে উঠল—আমাকে নাড়াও, আপেল সব পেকে গেছে।

সুন্দরী গাছটি নাড়াল, অনেকগুলি পাকা আপেল পড়ল নীচে।

এবার দরজার সামনে এসে দাঁড়াল এক বুড়ী, বলল—শোন, আমার কাছে আয়।

সুন্দরী কাছে এল।

বুড়ী বলল—তুই আমার কাছে থাক, আমার কাজকর্ম করবি।

সুন্দরী সেই বুড়ীর কাছেই রহে গেল। রান্না করে, বাসন মাজে, ঘর ঝাঁট দেয়, বিছানা পাতে।



দিন যায়। মায়ের জন্য সুন্দরীর মন কেমন করে। একদিন সে বুড়ীকে বলল—আমি মাকে একবার দেখতে যাব।

বুড়ী বলল—দেখে আবার আস্‌বি তো ?

সুন্দরী বলল—আসব।

বুড়ী বলল—তবে চল্‌, আমি তোকে পৌঁছে দিয়ে আসি। তুই খুব ভাল মেয়ে, এতদিন আমার কাছে কাজকর্ম করলি কিছু টাকা-পয়সা নিয়ে যা।

বুড়ী সুন্দরীর আঁচলে এক গাদা মোহর বেঁধে দিলে।

তারপর বুড়ী তার হাত ধরে নিয়ে এল তার বাড়ীর সামনে। তাকে দেখেই বাড়ীর দরজায় মুরগী ডেকে উঠল—কঁক্‌ কঁক্‌ কঁকর কোঁ—

ফিরে এসেছে সুন্দরী মেয়ে
আঁচল ভরা মোহর নিয়ে।

সুন্দরী মাকে সব মোহর দিলে, বললে সব কথা।

মা তখনই কুৎসিৎ মেয়েকে ডেকে বলল—কালো, তুই আজ থেকে কূয়ার পাশে বসে তক্‌লিতে সূতা কাটবি, তারপর তক্‌লি ফেলে দিবি কূয়ার মধ্যে, আর সেই তক্‌লি তুলতে ঝাঁপিয়ে পড়বি কূয়ায়। সুন্দরী যখন মোহর এনেছে তখন তুইও আনতে পারবি।

কালো মেয়ে মায়ের কথামত কাজ করল। কূয়ার মধ্যে তক্‌লি ফেলে দিয়ে সে লাফিয়ে পড়ল কূয়ার মধ্যে, চোখ মেলেই দেখে সুন্দর মাঠ, মাঠের মধ্যে দিয়ে সুন্দর পথ। সেই পথ ধরে সে এসে পৌঁছাল বুড়ীর কুঁড়ে ঘরে। সেখানে আগের মতই রুটি সেঁকা হচ্ছিল, রুটিগুলো বলে উঠল—আমাদের তুলে নাও—তুলে নাও, নয়ত পুড়ে যাব।

কালো মেয়ে বলল—আমার বয়ে গেছে, রুটি তুলতে গিয়ে আমি হাত পোড়াব নাকি?

উঠানের আপেল গাছ বলে উঠল—আমাকে ঝাঁকানি দাও, পাকা আপেল সব পেড়ে নাও।

কালো মেয়ে বলল—হ্যাঁ, আমি নাড়া দিই আর আমার মাথায় আপেল পড়ুক ধুপ্‌ধাপ্ করে।

ইতিমধ্যে বুড়ী এসে পড়ল, বলল—আমার কাজকর্ম কর, আমার কাছে থাক্।

কালো মেয়ে রহে গেল সেখানে।

প্রথম দিন সে ভালভাবে কাজ করল।

দ্বিতীয় দিনে সে তেমনভাবে কাজ করতে পারল না। কাজ করা তার অভ্যাস নেই।

তৃতীয় দিনে সারা দুপুর সে ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিলে।

চতুর্থ দিনে বিছানা থেকে উঠতেই তার অনেক বেলা হল।

বুড়ী এবার বিরক্ত হল, বললে—তুই বাড়ী যা, তোকে আমার দরকার নেই।

কালো বলল—কাজ করলাম, আমার মাইনে দেবে না ?

—কি চাস্ ?

—আঁচল ভরা মোহর।

—তোর মাইনে তো মোহর নয়, তোর মাইনে আল্‌কাতরা।

এই কথা বুড়ী বলতেই চারিপাশ থেকে আল্‌কাতরা বৃষ্টি হল কালো মেয়ের মাথা থেকে পা পর্যন্ত কালোয় কালো হয়ে গেল। বুড়ী তাকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলে।

কালো মেয়ে আল্‌কাতরা মেখে এসে দাঁড়াল বাড়ীর দরজায়। মুরগী ডেকে উঠল—কঁক্ কঁক্ কঁকর কোঁ—

ফিরেছে আল্‌সে কালো মেয়ে
আলকাতরায় পেত্নী হয়ে।

বিড়ালী

এক ছিল রাজা। রাজার এক মেয়ে। গোলাপের মত রং, সোনার মত চুল, মোমের পুতুলের মত গড়ন। অমন সুন্দরী দেখা যায় না। কিন্তু সুন্দরী মেয়ের কপালে সুখ হল'না। রাণী মারা গেলেন, প্রজারা রাজাকে বলল—আবার বিয়ে করুন। আমাদের রাণী চাই।

রাজা আবার বিয়ে করলেন।

নতুন রাণী এসেই বললে—রাজকন্যার বিয়ে দেব আমার ভাইয়ের সঙ্গে।

রাণীর ভাই কানা ও খোঁড়া। রাজকন্যা বলল—ওকে আমি বিয়ে করব না।

রাণী বলল—আমি বিয়ে দেব।

রাজা বললেন—আমার হুকুম, বিয়ে করতে হবে।

রাজকন্যা বলল—বেশ, বিয়ের উৎসব হয় তিনদিন—বিয়ে, বাসি-বিয়ে, বৌ-ভাত,—এই তিনদিনের জন্যে আমার তিনটি পোষাক

চাই। বিয়ের দিনের জন্যে চাই সোনালী জরীর পোষাক, বাসি-বিয়ের দিনে চাই রূপালী জরীর পোষাক আর বৌ-ভাতের দিনে চাই ঝিকমিকে পোষাক। সোনালী পোষাকে রোদ ঠিক্‌রে পড়বে, রূপালী পোষাকে চাঁদের আলো ঝল্‌মল্‌ করবে আর ঝিক্‌মিকে পোষাক দেখে মনে হবে যেন নীল আকাশে এক আকাশ তারা ফুটেছে। আর শ্বশুরবাড়ী যাবার জন্যে আমার চাই একটা বাঁদরের লোমের পোষাক, কানা-খোঁড়ার বউ হয়ে আমি বাঁদর সেজে শ্বশুরবাড়ী যাব।

সৎমা রাণী বলল—বেশ, তাই হবে।

রাজা তখনই দরজী ডেকে পোষাক তৈরীর হুকুম দিলেন।

রাজ-দরজী চারশো সেরা ওস্তাগর লাগিয়ে চারটি পোষাক তৈরী করে নিয়ে এল। সোনালী জরীর পোষাকে রোদ যেন ঝল্‌মল্‌ করছে। রূপালী জরীর পোষাকে জ্যোৎস্না যেন উথলে পড়ছে। নীল পোষাকে সত্যি যেন এক আকাশ তারা ফুটেছে। আর বাঁদরের লোমের পোষাকে কোথাও কোন খুঁৎ নেই।

রাজকন্যার পোষাক পছন্দ হল। রাণী বলল—এবার বিয়ের দিন ঠিক করি।

বিয়ের দিন ঠিক হল। এদিকে রাজকন্যা এক রাতে গায়ে হতে মুখে ছাই মেখে বাঁদরের পোষাকটি পরে, বাকি তিনটি পোষাক পোঁট্‌লা বেঁধে নিয়ে রাজবাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল। দুপুর রাতে খিড়কি দরজা দিয়ে বেরুল, কেউ তাকে দেখতে পেলে না।

সারা রাত হেঁটে, নগর পার হয়ে, সে এল এক বনে। বনের মাঝে এক গাছের কোটরে ঢুকে সে লুকিয়ে রইল। বসে বসে কোন এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল কুকুরের ডাকে। ভিন্‌দেশের এক রাজকুমার এসেছিল শিকার করতে। তার সঙ্গে ছিল শিকারী কুকুর। গাছের কোটরে এক অদ্ভুত জানোয়ার দেখে কুকুরের দল চীৎকার করে উঠল। সেই ডাকে রাজকন্যার ঘুম ভাঙল। চোখ মেলেই দেখে সামনে এক রাজকুমার। রাজপুত্র বলল—তুমি কে?

রাজকন্যা বলল—আমি এক ভিখারী, সহরে ভিক্ষে মেলে না, তাই বনে থাকি, ফলমূল খাই।

—তোমার পরণে এটা কি?

—বাঁদরের লোমের পোষাক। কাপড়-জামা কোথায় পাব? কে আমাকে দেবে?



ছাইমাখা মেয়েটাকে ভিখারী বলেই রাজপুত্রের মনে হল, মনে দয়া হল, বললে—কাজকর্ম করতে পারিস্?

—কি কাজ বলুন?

—বাসন মাজা, উনুনে আঁচ দেওয়া, রান্নাঘর পরিষ্কার করা।

—রান্নাঘরের কাজ খুব পারব, যা রান্না হবে আমায় একটু একটু খেতে দেবেন তো?

রাজপুত্র হাসলেন, বললেন—তা দেব, মাইনেও দেব।

রাজকন্যা বোকা সেজে, বোকার মত বলল—থাকব কোথায়?

—আমার বাড়ীতে।

—সে বেশ হবে। আমি এখনি যাব।

রাজপুত্র বাঁদরবেশী রাজকন্যাকে নিয়ে এলেন নিজের বাড়ীতে। রাঁধুনীকে ডেকে বললেন—এই একটা মেয়েকে এনেছি, তোমার কাজের সুবিধা হবে।

রাঁধুনী তো বানরের পোষাক পরা মেয়ে দেখে থ'। বলল—এ তো একটা জানোয়ার।

রাজপুত্র বলল—বাসন মাজতে উনুন সাফ্ করতে ও খুব পারবে।

রাঁধুনী আর কিছু বললে না। রান্নাঘরের পাশে একখানি ছোট ঘর ছিল, সেখানেই রাজকন্যার থাকার জায়গা হল। রাঁধুনী বললে—তোকে কি নামে ডাকব?

রাজকন্যা বলল—মা ডাকতেন বিড়ালী বলে, তাই বলো।

রাঁধুনী বলল—পরেছিস্ তো বাঁদরের চামড়া, যদি বাঁদরী বলি?

রাজকন্যা বোকার মত বলল—তাই বলো, সে বেশ হবে, পোষাকে আর নামে মিলে যাবে।

রাঁধুনী বুঝল মেয়েটা ভারী বোকা, দয়া হল, বললে—না, তোকে আমি বিড়ালীই বলব।

বিড়ালী রাজবাড়ীতেই রয়ে গেল।

দিন যায়। বাসন মাজা, উনুনে আঁচ দেওয়া ছাড়াও বিড়ালী এখন রান্নার কাজও শিখেছে। রাঁধুনী তাকে ভালবাসে। তবে বিড়ালী সব সময়েই হাতে মুখে ছাই মেখে থাকে এটা তার ভারী খারাপ লাগে। বলে—এত ছাই মাখিস্ কেন?

বিড়ালী আরো ভাল করে ছাই মাখে, বলে—ছাই না মেখে আমি থাকতে পারি না।

ছাই মেখে রাজকন্যা রূপ ঢাকা দেয় তা তো রাঁধুনী জানে না।

দিন যায়।

রাজপুত্রের জন্মতিথি। তিনদিন ধরে নাচ-গান আর খাওয়া-দাওয়া, রাজবাড়ীতে মহা-উৎসব।

সন্ধ্যাবেলা গানবাজনা জমে উঠে। রাঁধুনী কালিয়া পোলাও রান্না করে, রান্না শেষে বিড়ালী বললে—আমি একবার যাই নাচগান দেখে আসি।

রাঁধুনী বললে—সাবধানে যাস্, আড়াল থেকে দেখিস্ বাপু, তোর অমন বেশভূষা যেন কারো নজরে না পড়ে।

বিড়ালী নিজের ঘরে আসে, হাত মুখ ধুয়ে সোনালী পোষাক পরে, রাজকন্যা সেজে রাজপুত্রের গানের আসরে গিয়ে দাঁড়ায়। সবাই

চম্‌কে উঠে,—এ কে ? এমন রূপ, এমন পোষাক ! রাজপুত্র তাকিয়ে থাকে তাব মুখের পানে।

রাজকন্যা বসে বসে গান শোনে। তারপর যখন খাওয়ার ডাক পড়ে তখন কোন ফাঁকে সকলের অলক্ষ্যে সরে পড়ে। নিজের ঘরে এসে আবার হাতে মুখে ছাই মেখে, ময়লা কাপড় পরে রান্না ঘরে গিয়ে দাঁড়ায়। ওদিকে তখন রাজপুত্র খোঁজে—সেই মেয়েটি কোথায় গেল ? কে সেই মেয়েটি ?

রাঁধুনী বলে—কেমন দেখ্‌লি ? .

বিড়ালী বলে—ভারী চমৎকার, তুমি দেখে এস।

—আমি দেখতে গেলে রাজপুত্রের সরবৎ তৈরী করবে কে ?

—আমি করছি, তুমি যাও।

—পারবি তো ?

—পারব—পারব।

রাঁধুনী নাচ গান দেখতে গেল। বিড়ালী রাজপুত্রের সরবৎ তৈরী করল। তারপর সরবতের গ্লাসের মধ্যে ফেলে দিলে তার আঙুলের হীরে বসান আংটি।

খানসামা সরবৎ নিয়ে গেল। সরবৎ পান করে রাজপুত্র দেখে গ্লাসের তলায় পড়ে আছে হীরের আংটি। বলল—এ সরবৎ তৈরী করেছে কে ? রাঁধুনীকে ডাকো।

রাঁধুনী এল। বলল—আমি করেছি।

—না। এ আর কেউ করেছে।

রাঁধুনী ভয়ে ভয়ে বলল—এ সরবৎ করেছে বিড়ালী।

রাজপুত্র বলল—ডাকো বিড়ালীকে।

বিড়ালী এল।

রাজপুত্র বলল—এই সরবৎ তুমি বানিয়েছ ?

বিড়ালী বোকার মত বলল—আমি খুব যত্ন করে বানিয়েছি, যদি খারাপ হয়ে থাকে তাহলে আমার অপরাধ নেবেন না। আমাকে ধরে যা কতক মারুন। অন্যায় করেছি।

রাজপুত্র কি বলবেন ভেবে পেলেন না, বললেন—না, সরবৎ খুব ভাল হয়েছে, তুই যা।

হীরের আংটিটা কি করে গ্লাসের মধ্যে এল রাজপুত্র তাই ভাবতে লাগল।

পরদিন সন্ধ্যায় আবার নাচগানের আসর বসল।

রান্না শেষ হলে বিড়ালী বলল—আমি দেখে আসি।

নিজের ঘরে এসে হাত মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে, সেদিন সে রূপালী পোষাক পরে এল গানের আসরে। তাকে দেখে রাজপুত্র খুসি হল। কাছে এসে বলল—তোমার নাম কি? কোথা থেকে আসছ?

রাজকন্যা বলল—গান শুনি, শেষে সব বলব।

গান-বাজনা চলল অনেকক্ষণ। তারপর যেই শেষ হল অমনি রাজকন্যা সরে পড়ল। নিজের ঘরে এসে পোষাক বদলে, ছাই মেখে রান্না ঘরে গেল, রাঁধুনীকে বলল—দেখে এস আজকের নাচ-গানের আসর কেমন জমেছে।

রাঁধুনী বলল—সরবৎ করবে কে?

—আমি করব।

—কালকের মত রাজপুত্র আবার ডেকে পাঠাবে তো?

—সরবৎ ভাল হয়েছিল বলেই ডেকেছিল, তুমি ভয় পাও কেন?

রাঁধুনী নাচ গান দেখতে গেল। বিড়ালী সরবৎ বানাল। তারপর গলার হার ছড়া ফেলে দিলে গ্লাসের মধ্যে।

খানসামা সরবৎ নিয়ে গেল। রাজপুত্র সরবৎ খেয়ে দেখে গ্লাসের তলে চুণী বসান হার। বলল—ডাকো রাঁধুনীকে।

রাঁধুনী এল। রাজপুত্র বলল—কে সরবৎ বানিয়েছে?

রাঁধুনী বলল—বিড়ালী।

—ডাকো বিড়ালীকে।

বিড়ালী এল। রাজপুত্র বলল—তুমি সরবৎ বানিয়েছ?

বিড়ালী বলল—হ্যাঁ, ভাল করে বানিয়েছি, যদি খারাপ হয়ে থাকে তো আমাকে ধরে ঘা কতক মারুন, আমার অন্যায় হয়েছে।

—না, সরবৎ চমৎকার হয়েছে, তুই যা।

বিড়ালী চলে গেল। রাজকুমার ভাবতে লাগল হীরের আংটি ও এই চুণীর হার কি করে পড়ল সরবতের গ্লাসে।

পরদিন সন্ধ্যায় আবার সেই নাচ-গানের আসর বসল।

সেদিনও রান্না শেষ হলে বিড়ালী বলল—দেখে আসি।

আজ বিড়ালী গানের আসরে এল আস্‌মানী রঙের তারা ফোটান পোষাক পরে। যে দেখল সেই বলল—হ্যাঁ, সুন্দরী বটে!

আজ রাজপুত্র রাজকন্যার কাছে এসে তার হাত ধরল, বলল—আজ বলতে হবে তোমার পরিচয়।

রাজকন্যা বলল—পরে বলব।

রাজপুত্র কিন্তু সেই ফাঁকে একটা আংটি পরিয়ে দিলে রাজকন্যার আঙুলে। রাজকন্যা টের পেল না।

আসর ভাঙতেই কোন্ ফাঁকে রাজকন্যা টুক করে সরে পড়ল। নিজের ঘরে এসে সাজ-পোষাক বদলে সরবৎ বানাতে বসল। আজ সোনার চুড়ী একগাছা ফেলে দিলে গ্লাসের মধ্যে।

সরবৎ খেয়েই রাজকুমার ডেকে পাঠাল রঁাধুনীকে।

রঁাধুনীর পর ডাক পড়ল বিড়ালীর।

বিড়ালীর কথা শুনে রাজপুত্র বললেন—দেখি তোমার দুই হাত।

হাত তুলতেই বিড়ালীর আঙুলে রাজপুত্রের আংটি ঝিক্‌মিক্ করে উঠল। রাজপুত্র বলল—এবার তোমাকে চিনেছি।

বিড়ালী আর নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারল না। স্নান করে, পোষাক পরে তাকে এসে দাঁড়াতে হল রাজপুত্রের সামনে সভার মাঝে। রাজপুত্র বলল—কে তুমি? কি তোমার পরিচয়?

এবার রাজকন্যাকে সব বলতে হল।

রাজপুত্র বলল—এই মেয়েকে আমি বিয়ে করব।

রাজপুত্রের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেল। রাজ্য জুড়ে আবার উৎসব চলল আরো সাতদিন।—

রাজকন্যা বনে গেল, সাজল হনুমান
ছদ্মবেশে সেই কন্যা রাজার বাড়ী যান।
রাজার কুমার বলল শেষে—একে আমি জানি,
বিয়ে করে একেই আমি করব আমার রাণী।

শিয়ালের বুদ্ধি

এক চাষার ঘরে একটি ঘোড়া ছিল। অনেক দিনের ঘোড়া। বুড়ো হয়ে গেছে। আর গাড়ী টানতে পারে না, পিঠে মানুষ বইতেও পারে না। চাষা তাকে একদিন আস্তাবল থেকে বের করে দিলে, বললে—চরে খেতে যা, আমি বসিয়ে খাওয়াতে পারব না। খেয়ে-দেয়ে দেহে যদি আবার শক্তি পাস্ তখন আসিস্। আমি বাঘের মত জোর চাই।

বুড়ো ঘোড়া মনের দুঃখে বনে চলে গেল। বনে কোথায় থাকবে? শীতের হিম আর বর্ষার জল থেকে মাথা বাঁচাবে কি করে? বুড়ো ঘোড়া একটা আশ্রয় খোঁজে বনের মধ্যে।

ঘুরতে ঘুরতে দেখা হল এক শিয়ালের সঙ্গে। শিয়াল বলল—তোমাকে নতুন দেখছি?

ঘোড়া বলল—হ্যাঁ, আমি আজ এসেছি।

—বাড়ীর আস্তাবল ছেড়ে বনে এলে কেন?

—আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

—কেন?

ঘোড়া সব কথা বলল।

শিয়াল সব শুনে বলল—বাঘের মত তোমার গায়ে জোর চাই?

ঘোড়া বলল—তা কখনো হয় না।

শিয়াল হেসে উঠল—হুয়া হুয়া হুয়া। বলল—ঠিক হয়। বুদ্ধি করতে হয়। তোমাকে আমি বাঘের চেয়ে জোরালো করে দেব।

আমি যা বলি তাই কর দিকি। সোজা শুয়ে পড় এই ঘাসের উপর। হাত-পা-লেজ কিছু নাড়বে না—ঠিক যেন মরা ঘোড়া। তারপর যা করতে হবে আমি বলে দেব।

ঘোড়া শুয়ে পড়ল।

শিয়াল গেল বাঘের গুহায়। বাঘ শুয়েছিল, শিয়াল বলল—মামা, একটা ঘোড়া মরে পড়ে আছে, চল, একটা ভাল ভোজ হবে।

বাঘ বলল—কতদূরে ?

—বনের কিনারায়।

বাঘ এক লাফে বেরিয়ে পড়ল শিয়ালের সঙ্গে।

ঘোড়ার কাছে নিয়ে এসে শিয়াল বলল—এই দেখ ঘোড়া,সবটা খেয়ে আজ শেষ করতে পারবে ?

—একটা ঘোড়া একদিনে কি খাওয়া যায় ?

—তাহলে ঘোড়াটাকে তোমার গুহায় নিয়ে যাও। দাঁড়াও, তোমার পায়ের সঙ্গে ঘোড়ার লেজটা বেঁধে দিই। তুমি টেনে নিয়ে চলে যাও।

—সেই ভাল, তাই দে।

বাঘ চুপ করে দাঁড়াল। লতাপাতা দিয়ে শিয়াল একটি দড়ি পাকাল। তারপর বাঘের পিছনের দুটি পা শক্ত করে বেঁধে, সেই দড়ি বেঁধে দিল ঘোড়ার লেজে। তারপরেই ডাক দিল—হেট্ ডি ডি —এক দৌড়ে বাড়ী চলে যাও।

ঘোড়া লাফিয়ে উঠেই ছুটল বাড়ী মুখো। বাঘ বলল—একি !

পিছনের পা বাঁধা, সারা দেহ মাটিতে ঘষড়ে, আছাড় খেয়ে ছিঁড়ে কেটে গেল, কিন্তু বাঘ কিছুই করতে পারল না। শুধু গোঁ গোঁ করে গোঁয়াতে লাগল।

ঘোড়া বাঘকে একেবারে এনে ফেলল চাষার দরজায়। চিঁহি করে ডাক দিয়ে বলল—দেখ, আমি বাঘের চেয়ে জোরালো, বাঘ বেঁধে এনেছি।

বাঘ তো তখন মাটিতে আছাড় খেয়ে আধমরা।

চাষী বলল—না, ঘোড়াটা বুড়ো হলেও বুদ্ধি রাখে, বাড়ীতেই থাক্।

ঘোড়া চাষার বাড়ীতে আগের মতই রহে গেল।—

বুদ্ধি যার বল তার, সদাই বুদ্ধির জয়।
ঘোড়ায় বাঘ বেঁধে আনে, বুদ্ধিতে কি না হয়॥

ডাকাতের বিয়ে

গাঁয়ে ছিল এক যাঁতাওয়ালা, ডাল ভেঙ্গে, গম ভেঙ্গে, ছাতু পিষে তার দিন চলত। তার এক মেয়ে ছিল। সুন্দরী মেয়ে। মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য যাঁতাওয়ালা পাত্র খুঁজছিল। কিন্তু মনের মত পাত্র পাচ্ছিল না।

খোঁজ-খবর করতে করতে একদিন এক পাত্র নিজে এসেই হাজির



হল, বলল—আপনার মেয়েকে আমার খুব পছন্দ, তাকে আমি বিয়ে করব।

যাঁতাওয়ালা বলল—বেশ, তুমি কি কর, কি তোমার পরিচয়?

পাত্র বলল—এই বনের ওপারে আমার বাড়ী, ওই বন-গাঁয়ের আমি জমিদার। আপনি চলুন আমার ঘর-বাড়ী দেখে আসবেন।

যাই যাই করে যাঁতাওয়ালার আর যাওয়া হয় না। যেদিন মনে ভাবে যাব সে-ই দিনই যত কাজ এসে পড়ে। ঘরে আর লোক নেই, কাজ ফেলে সে যেতে পারে না।

পাত্র নিজেই দু'চারবার আসে, তারপর বলে—আপনি যাবার সময় না পান, মেয়েকে পাঠিয়ে দিন, সে দেখে-শুনে আসুক।

যাঁতাওয়ালা ভাবল, এটা মন্দ নয়, যেখানে মেয়েকে সারাজীবন থাকতে হবে, সে নিজেই দেখে আসুক না সেই বাড়ী-ঘর। বলল—খুকী, তুই নিজেই একবার দেখে আয়।

খুকী বলল—একা বনের ভিতর দিয়ে যেতে ভয় করে।

পাত্র বলল—কোন ভয় নেই, এ বনে বাঘ-ভালুক নেই। তাছাড়া বনের ভিতর দিয়ে সহজে যাওয়া-আসা যায়—সেইজন্যে আমরা ছাই ছড়িয়ে পথ করে রেখেছি। সেই ছাই দেখে পথ চললেই হবে।

পরদিনেই খুকী বেরিয়ে পড়ল বনের পথে।

বনের ভিতর দিয়ে ছাই ছড়ান ছিল। তাছাড়া খুকী জামার পকেটে ভরে এনেছিল দু'পকেট ছোলা। ছাই ছড়ান পথের উপর দিয়ে এগিয়ে চলে, আর পথের পাশে দু'চারটি করে ছোলা ছড়িয়ে দেয়।

দেখতে দেখতে বন গভীর হল। খুকী এগিয়ে চলল। সারাদিন হেঁটে সে বন পার হল।



বনের শেষে একখানি বাড়ী। সেইখানেই ছাই-পথ শেষ হয়েছে। দরজা খোলাই ছিল। ভিতরে ঢুকতেই এক তোতাপাখী ডেকে উঠল—

কে এলি রে—কে এলি, ফিরে যা রে এখুনি।
ডাকাতবাড়ী মরতে এলি, এখানে ত সবাই খুনী॥

খুকী চমকে উঠল। ভয় হল। তবু এসে যখন পড়েছে, সব কিছু

দেখেই যাক্। বাড়ীর ঘরে ঘরে সে ঘুরতে লাগল। জিনিস-পত্তর অনেক আছে কিন্তু মানুষ নেই। শেষে রান্নাঘরে এক বুড়ীর সঙ্গে দেখা। সে বসে বসে রাঁধছিল। খুকীকে দেখেই বুড়ী বলল—তুমিই বুঝি সেই যাঁতাওয়ালার মেয়ে? তোমার কথাই বলে গেছে আমাকে। তা তুমি এখানে এলে কেন মরতে? এ যে ডাকাতের বাড়ী, যে আসে তাকেই এরা খুন করে।

খুকী বলল—আমার সঙ্গে যে বিয়ের কথা হয়েছে।

—অমন বিয়ের কথা ওদের রোজ হয়। যে মেয়ে আসে তাকে মেরে ওরা তার গয়না-গাটি খুলে নেয়। কোন দয়া-মায়া নেই।

—তাহলে আমি এখন কি করি?

—বাড়ী চলে যা।

—এই অন্ধকারে বনের ভিতর দিয়ে যাই কেমন করে?

বুড়ী বলল—বেশ, এখন থাক্, আমি তোকে একটা ঝুড়ির মধ্যে লুকিয়ে রাখছি।

একটা বড় ঝুড়ির মধ্যে বুড়ী খুকীকে লুকিয়ে রাখল।

এদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল। ডাকাতরাও বাড়ী ফিরল। সাত ডাকাত বাড়ী ফিরল, সঙ্গে একটি মেয়ে। ডাকাতরা বলল—বুড়ী, এই মেয়ে এনেছি দেখ্, এর সঙ্গে আমাদের একজনের বিয়ের ঠিক হয়েছে।

ডাকাতরা সেই মেয়েটিকে সারা বাড়ী ঘুরিয়ে দেখাল। তারপর সবাই মিলে বসল খেতে।

খাওয়ার শেষে সরবৎ তৈরী হল, ডাকাতরা সবার আগে সরবৎ দিলে সেই মেয়েটিকে। মেয়েটি সেই সরবৎ খেয়েই ঢলে পড়ল।

—যাক্, আপদ গেল! এবার গয়নাগুলো খুলে নিয়ে বেটিকে গাছতলায় পুঁতে রেখে আসি—বলে ডাকাতরা মেয়েটির গয়না সব খুলে নিলে। আঙুলের আংটিটা খুলতে গিয়ে ছিট্‌কে পড়ল খুকীর ঝুড়িতে, খুকীর কোলের উপর। এক ডাকাত সেদিকে যাচ্ছিল আংটি খুঁজতে, বুড়ী বলল—ওই আংটি আমি দেখছি, তোমরা

আগে এই মরা মেয়েটাকে এখান থেকে সরাও, আমার বড় ভয় করে।

ডাকাতরা হাসতে হাসতে মেয়েটাকে বের করে নিয়ে গেল বনে গাছের নীচে কবর দিতে।

খানিক পরে ডাকাতরা ফিরল। বুড়ী তাদেরকে সরবৎ দিল খেতে। সরবতে সিদ্ধি মেশান ছিল, একটু পরেই ডাকাতরা যে যেখানে পারল শুয়ে পড়ল। তাদের নাক ডাকতে সুরু করল।

বুড়ী এবার খুকীকে ডেকে বলল—চল্, ভোর হবার আগেই আমরা বন পার হয়ে যাব। আমি পথ চিনি।

বুড়ী খুকীকে সঙ্গে নিয়ে বনের পথ ধরল। আকাশে চাঁদ ছিল, জ্যোৎস্নায় ছাই-পথ চিনতে কষ্ট হল না। সারা রাত হেঁটে ভোরবেলা তারা বন পার হল। খুকী বাড়ী ফিরল। ফিরে এসে বাবাকে বলল সব কথা। যাঁতাওয়ালা বলল—ঠিক আছে, আমি ব্যবস্থা করছি।

ডাকাত পাত্র সেদিন এল, বলল—কই, খুকী তো আমার বাড়ী গেল না?

যাঁতাওয়ালা বলল—যাবে, আগে পাকা-দেখা হয়ে যাক্। তোমার আত্মীয়-পরিজনদের নিয়ে এস।

ডাকাত পরদিনই দলবল নিয়ে এল। পাকা-দেখা হল, আশীর্বাদ হল, খাওয়া-দাওয়া হল। খাওয়ার শেষে যাঁতাওয়ালা বলল—রাতে বনের পথে যাওয়া ঠিক নয়, আজ থাকো, সকালে যেও।

ডাকাতরা রহে গেল। কথা হল—যতক্ষণ না ঘুম আসে এক একজন এক একটা গল্প বলুক। সবার আগে গল্প বলবে কনে, কেন-না তাকে নিয়েই তো আজকের উৎসব।

খুকী গল্প বলতে সুরু করল—আমি একদিন এক মজার স্বপ্ন দেখলাম। এক বনের ভিতর দিয়ে আমি যাচ্ছি। বনের মধ্যে একটি বড় বাড়ী। বাড়ীর দরজায় এক তোতাপাখী। তোতাপাখী আমাকে বলল—কে এলি রে—কে এলি, ফিরে যারে এখুনি।

ডাকাতবাড়ী মরতে এলি, এখানে ত সবাই খুনী॥

বাড়ীতে থাকে এক বুড়ী আর একদল ডাকাত। ডাকাতরা একটা মেয়েকে নিয়ে বাড়ী ফিরল। মেয়েটিকে সরবৎ খাইয়ে তারা খুন করল, তার গয়নাগুলো নিয়ে তাকে পুঁতে ফেললে এক গাছের নীচে। গয়না লুট করার সময় মেয়েটার হাতের আংটিটা ছিট্‌কে এসে পড়ল আমার কোলের উপর। সেই আংটিটা আমি নিয়ে এসেছি।

খুকী আংটিটা দেখাল ডাকাতদেরকে।

ডাকাতরা গল্প শুনে, আংটি দেখে চমকে উঠল, তাড়াতাড়ি পালাবার জন্য উঠে দাঁড়াল, কিন্তু তখন কোটালের পাইক-পেয়াদা এসে পড়েছে। তারা ডাকাতদের ধরে চালান করল।—

তারা সাত ভাই ডাকাত—
যা মন চায় তাই করে, যাকে খুসি মারে ধরে
গায়ের জোরে দিনকে করে রাত।
যেদিন তারা পড়ল ধরা, পায়ে বেড়ি হাতে হাত-কড়া
সেদিন তারা হল কুপোকাৎ॥

সদাগর-রাজা

এক ছিল সদাগর। সপ্ত ডিঙায় সওদা নিয়ে দেশ-বিদেশে বেচা-কেনা করে সে লাখ লাখ টাকা রোজগার করেছিল। কিন্তু একবার চৈত্র মাসের ঝড়ে সদাগরের সাতখানি ডিঙাই ডুবে গেল। সদাগর পথে বসল। সামান্য খেত-খামার ছিল, চাষ-বাস করে কোনমতে দু'বেলা দু'মুঠো জোটে।

একদিন খেত থেকে ফিরছে এমন সময় এক বামনের সঙ্গে দেখা। বেঁটে-খেঁটে ছোট্ট মানুষটি, মাথা নেড়ে বলল—তোর মনে বড় কষ্ট।

সদাগর বলল—সব ডুবে গেল, আর দিন চলে না।

—তুই কি টাকা-পয়সা চাস?

—পয়সা তো সবাই চায়।

—বেশ, আমি তোকে টাকা দোব, কিন্তু আমার একটা কথা রাখতে হবে। তুই বাড়ী ঢুকে যা প্রথম দেখ্‌বি, তা কি আমাকে দিতে পারবি?

—এ আর এমন কঠিন কি? দোব।

—আমি আজই চাইছি না, বারো বছর পরে চাইব।

—বলছি তো দোব।

—বেশ, কাগজ-কলমে লিখে দলিল করে দে। দেখ্‌ তোকে আমি রাজা করে দোব।

সদাগর তখনই লিখে দিল।

বামন বলল—ঠিক আছে, বাড়ী যা, তোকে আমি রাজা করে দোব।

সদাগর বাড়ী ফিরল। বাড়ীর চৌকাঠ পার হতেই সদাগরের ছেলে ছুটে এল। জড়িয়ে ধরল বাবাকে। সদাগর চমকে উঠল, বারো বছর পরে এই ছেলেকে দিয়ে আসতে হবে বামনের কাছে? তারপরেই মনে হল—তা কেন? বামন তো তাকে রাজা করেনি।

ছেলের হাত ধরে সদাগর ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। আজ বড় খাটুনি গেছে। হাত মুখ ধুয়ে সদাগর খাটের উপর শুয়ে পড়ল। হঠাৎ নজরে পড়ল খাটের নীচে কি যেন চক্‌ চক্‌ করছে, ভাল করে তাকিয়ে দেখে, থাকে থাকে মোহর সাজান। সদাগরের মন আনন্দে নেচে উঠল।

আবার সদাগর সপ্ত ডিঙা সাজাল, আবার সুরু হল সদাগরি।

দিনে দিনে সদাগর আবার লাখপতি হল।

দেখতে দেখতে বারো বছর কেটে গেল। সদাগরের মনে এবার ভাবনা দেখা দিল। সদাই মুখ কালো করে বসে থাকে। ছেলে একদিন জিজ্ঞাসা করল—বাবা, সারাক্ষণ কি এত ভাবো বলত?

সদাগর বলল—ভাবি একটা পুরানো কথা।

—কি কথা?

—তা তোমার জেনে দরকার নেই।

ছেলে কিন্তু না শুনে ছাড়ল না। সদাগর বলল—বারো বছর আগে তোমাকে বিক্রী করে দিয়েছি এক বামনের কাছে।

সব শুনে ছেলে বলল—এর জন্য অত ভাবছ কেন? আমি যাব সেই বামনের কাছে।

বারো বছর যেদিন পূর্ণ হল ছেলে বাপকে নিয়ে চলল বামনের কাছে। খেতের পাশে মাঠের মাঝে গাছতলায় বামনের সঙ্গে দেখা। বামন বলল—কি গো সদাগর, যা কথা দিয়েছিলে তা এনেছ?

সদাগর-পুত্র বলল—তুমি কি চেয়েছিলে?

বামন বলল—সে কথা তোমার বাবা জানেন, দলিল করে দিয়ে গেছেন।

—তুমি বাবাকে ঠকিয়েছ।

—না, তোমার বাবা নিজের ইচ্ছায় দলিল করে দিয়েছেন।

—দলিল তুমি ফেরৎ দিয়ে দাও।

—না, চুক্তি যা হয়েছে তা মানতে হবে। কথা দিয়ে কথা ফিরিয়ে নেওয়া চলবে না।

—আমি কি তোমার চাকর হয়ে থাকব?

—না, চাকর তোমাকে হতে হবে না, তোমাকে একটা কাজ দোব করতে হবে।

—কি কাজ?

—নদীর ঘাটে যে নৌকাখানি দেখছ, ওই নৌকায় চড়ে তোমাকে ভেসে পড়তে হবে।

—কোথায় যাব?

—যেখানে যাবার নৌকা তোমায় সেখানে নিয়ে যাবে।

—বেশ, আমি রাজী আছি।

সদাগর-পুত্র নদীর ঘাটে নৌকায় চড়ে বসল। তখনই একটা মস্ত ঢেউ এসে নৌকাখানিকে উজানে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। নৌকা চোখের আড়ালে ভেসে গেল।

সদাগর কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরল।

ওদিকে নৌকা তো বরাবর ভেসে চলল নদীর ঢেউয়ে। ভাসতে ভাসতে গিয়ে পৌঁছাল এক ঘাটে। সদাগর-পুত্র তখনই এক লাফে নেমে পড়ল ঘাটে। ঘাটের উপরেই এক মস্ত প্রাসাদ। রাজ-অট্টালিকা। কিন্তু কোথাও জনমানব নেই। এ-ঘর সে-ঘর ঘুরতে ঘুরতে সদাগর-পুত্র এসে পড়ল এক ঘরে, সে ঘরে মস্ত এক অজগর সাপ পড়ে আছে। সাপের গায়ের রং দুধের মত শাদা। তাকে



দেখেই সাপ মানুষের মত কথা বলে উঠল—বারো বছর তোমার পথ চেয়ে বসে আছি, তুমি কি আমাকে বাঁচাতে পারবে? আমি রাজকন্যা, এরা আমাকে সাপ করে রেখেছে।

—ব্যাপার কি? কি করে বাঁচাব?

—আজ রাতে ভূতের মত কালো কালো বারোজন লোক আসবে। তারা তোমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করবে। তুমি কোন জবাব দেবে না। তারা তোমাকে মারবে, কিন্তু কোন জবাব না পেলে রাত বারোটায় তারা চলে যাবে। কাল রাতে আবার আসবে ওই বারোজন, তোমাকে অনেক মার-ধর করবে কিন্তু তোমাকে চুপ করে সব সইতে হবে। তারাও রাত বারোটায় চলে যাবে। পরশু আসবে চব্বিশ

জন, তারা শুধু মারবে না, শেষে তোমার মাথা কেটে ফেলবে, কিন্তু তারাও রাত বারোটায় চলে যাবে। তাহলেই তাদের তন্ত্র-মন্ত্র সব ফুরিয়ে যাবে, আমিও তখন আবার মানুষ হব। তখন মৃত্যুঞ্জয়-জল ছিটিয়ে তোমাকে আমি আবার বাঁচিয়ে তুলব। তোমাকে সব সইতে হবে, ভয় পেলে চলবে না।

সদাগর-পুত্র বলল—আমি ভয় পাব না।

অজগরের কথা মত সন্ধ্যার পর সত্যই বারোজন লোক এল। অনেক ভয় দেখিয়ে, মার-ধর করেও তারা সদাগর-পুত্রকে কথা বলাতে পারল না। রাত বারোটা বাজতেই তাদেরকে আর দেখা গেল না।

দ্বিতীয় দিন রাতেও ঠিক সেই ব্যাপার।

তৃতীয় রাত্রে বারোজনের বদলে চব্বিশজন এল। শেষে যাবার সময় তারা সদাগর-পুত্রের মাথা কেটে ফেলল।

রাত বারোটা বাজতেই তুক্-তাকের যাদু কেটে গেল। অজগর রাজকন্যা হয়ে গেল, সারা বাড়ী জম্‌জম্ করে উঠল—রাজা-রাণী, সিপাই-সান্ত্রী, লোক-লস্কর, পাইক-বরকন্দাজ,—সব জমজমাট। রাজকন্যা সদাগর-পুত্রকে বাঁচিয়ে তুলল।

রাজকন্যার সঙ্গে সদাগর-পুত্রের বিয়ে হয়ে গেল। সদাগর-পুত্র অর্ধেক রাজ্য পেল। রাজা হল। দেখতে দেখতে বছর [illegible]টে গেল।

একদিন সদাগর-রাজা বলল—আমি যাব মা-বাবার কাছে। আমি রাজা হয়েছি বাবা দেখে কত খুসি হবেন, মা'র কত আনন্দ হবে।

রাণী বলল—কিন্তু সেখানে গেলেই তুমি বিপদে পড়বে।

কিন্তু সদাগর-রাজার মন উতলা হয়েছিল, বলল—মা-বাবাকে একবার দেখে আসি।

রাণী তখন একটা আংটি দিলে, বললে—এই আংটিটা হাতে রাখ, এর কাছ থেকে যা চাইবে, তাই পাবে। [illegible]বে কখনো আমাকে নিয়ে যেতে চেয়ো না। তাহলে বিপদ হবে।

সদাগর-রাজা আংটি আঙুলে পরেই বলল—আমাকে নিয়ে চল আমার মা-বাবার কাছে।

চোখের নিমেষে আংটি সেই নগরের দরজায় সদাগর-পুত্রকে পৌঁছে দিল। সদাগর-পুত্রের পরণে ছিল রাজার পোষাক, সেই পোষাকে নগরে ঢুকলে কে কি ভাববে। সদাগর-পুত্র এক রাখালের সঙ্গে পোষাক বদল করল। রাখাল সেজে নগরে ঢুকল। বরাবর বাড়ীর দরজায় এসে সে সদাগরকে বলল—বাবা, আমি ফিরে এসেছি।

সদাগর তাকে দেখে চিনতে পারল না। বলল—আমার ছেলে তো জলে ডুবে মারা গেছে।

—আমি তোমার সেই ছেলে।

—না। সে রোগা ছিল, তোমার চেয়ে কালো ছিল।

ছেলে বলল—মা, আমাকে চিনতে পারছ?

মা বলল—তোমাকে দেখতে অনেকটা তারই মত সত্যি, কিন্তু তুমিই যে সেই ছেলে তা বুঝি কেমন করে?

ছেলে বলল—কি হলে চিনবে বল?

মা বললে—আমার ছেলের ডান কাঁধে একটা জরুল-চিহ্ন ছিল।

ছেলে বলল—এই তো।

এবার বাবা-মায়ের বিশ্বাস হল। ছেলে বলল—আমি এখন রাজকন্যাকে বিয়ে করে অর্ধেক রাজ্য পেয়েছি, রাজা হয়েছি।

সদাগর হেসে বলল—সে তো দেখতেই পাচ্ছি, রাখালের ছেঁড়া কাপড় পরে রাজা রাজ্য করছে।

ছেলে বলল—আমার কথা বিশ্বাস হল না?

—কেন হবে না, তুমি হলে রাখাল-রাজা।

—আমি রাজকন্যাকে বিয়ে করেছি।

—বুঝেছি, সে রাখাল-রাণী।

ছেলে গুম্ হয়ে গেল।

মা বললে—বেশ তো, অত কথায় কাজ কি? তুই রাজকন্যাকে নিয়ে এলি না কেন? আমরা দেখতাম।

ছেলে বলল—বেশ, আমি এখনি আনাচ্ছি। আংটি, রাজকন্যাকে এখানে নিয়ে এস, আমার মা বাবা দেখবেন।

চোখের নিমেষে রাজকন্যা সেখানে এসে উপস্থিত হল।

বাপ-মায়ের আর সন্দেহ রইল না।

রাজকন্যা বলল—তুমি তোমার কথা রাখতে পারলে না, তোমাকে যা নিষেধ করেছিলাম তুমি তাই করলে।

সদাগর-রাজা বলল—কি করব, বাবা-মাকে দেখাতে হবে তো?

—এতে তোমার বিপদ হবে।

—সাবধানে থাকব।

—যতই সাবধানে থাক, বিপদ এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

সেইদিনই রাত্রে সদাগর-পুত্র যখন ঘুমাল, তখন রাজকন্যা তার হাত থেকে আংটিটি খুলে নিলে, তারপর বললে—আংটি, আমাকে নিয়ে চল আমার বাড়ীতে।

রাজকন্যা চোখের নিমেষে উধাও হয়ে গেল। সকালবেলা ঘুম ভাঙতে সদাগর-পুত্র দেখল—রাজকন্যা নেই, আংটিও নেই। বলল—বেশ, আমিও রাজকন্যাকে খুঁজে বের করব।

সদাগর-পুত্র তখনই বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল।

হাঁটতে হাঁটতে কত বনবাদাড় জলা-জঙ্গল সে পার হল। কত নগর কত গ্রাম পার হল। তারপর এসে পড়ল এক পাহাড়ে। পাহাড়ের মাথায় তিনজন দৈত্য বসেছিল, সদাগর-পুত্রকে তারা ডাকল, বলল—শোন, আমাদের তিন-জনের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ বেধেছে, তুমি মিটিয়ে দাও দিকি।

সদাগর-পুত্র মনে মনে কেঁপে উঠল, মুখে সাহস দেখিয়ে বললে—কি সম্পত্তি বল?

প্রথম দৈত্য বলল—এই একখানা তলোয়ার, একে হুকুম করলেই এ শত্রুর মাথা কেটে আনবে।

দ্বিতীয় দৈত্য বলল—এই একটা আলখাল্লা, এটা গায়ে দিলে আর তোমাকে দেখতে পাওয়া যাবে না।

তৃতীয় দৈত্য বলল—এই একজোড়া জুতা, পায়ে পরে হুকুম করলেই তোমাকে চোখের নিমেষে যেখানে বলবে পৌঁছে দেবে।

সদাগর-পুত্র বলল—ব্যাপার সব সত্যি কি না আগে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

তিনজন দৈত্য জিনিষ তিনটি তার সামনে ধরল।



সদাগর-পুত্র আলখাল্লা গায়ে দিয়ে, জুতা পায়ে দিয়ে, তলোয়ার হাতে নিয়ে বলল—জুতো, আমাকে নিয়ে চল আমার রাজ্যে।

চোখের নিমেষে সদাগর-পুত্র উধাও হয়ে গেল। তিন দৈত্য হাঁ করে বসে রইল সেইখানে।

সদাগর-পুত্র এসে পৌঁছাল রাজবাড়ীর দরজায়।

রাজবাড়ীতে তখন নহবৎ বাজছে। সদাগর-পুত্র জিজ্ঞাসা করল—নহবৎ বাজছে কেন?

সান্ত্রী বলল—রাজকন্যার বিয়ে হবে এক রাজপুত্রের সঙ্গে।

—ক'দিন আগে যে রাজকন্যার বিয়ে হয়েছিল?

—সে রাজা বিবাগী হয়ে চলে গেছে, আমাদের রাজা নেই, তাই নতুন করে আবার রাজকন্যার বিয়ে হবে।

সদাগর-পুত্র ভাল করে আলখাল্লাটা গায়ে জড়িয়ে বিয়ের আসরে গিয়ে বসল।

রাজকন্যা বিয়ের আসরে আসতেই সদাগর-পুত্র বলল—এক মেয়ের কি দু'বার বিয়ে হবে ?

—কে কথা বলল ? কে কে ?

কিন্তু কাউকেই দেখা যায় না।

সদাগর-পুত্র বলল—এমন কখনও হয় না।

—কে ? কে ?

সবাই চারিপাশে তাকায়।

রাজকন্যা বলল—আমি তো বিয়ে করতে চাই না, মন্ত্রী সেনাপতি কোটাল বলে -রাজা নেই, আমাদেব রাজা চাই।

মন্ত্রী সেনাপতি কোটাল এক সুরে বলে উঠল—হ্যাঁ, আমাদের রাজা চাই।

সদাগর-পুত্র বলল—রাজা তো রয়েছে।

—কোথায় রাজা ?

—কেন, আমি তো আছি।

—তুমি কে ?

—তোমাদের রাজা।

সেনাপতি বলল—তোমাকে তো দেখছি না, তুমি রাজা নও, রাজার ভূত ?

—ভূত হলেও আমি তোমাদের রাজা।

সেনাপতি বলল—ভূত-রাজাকে আমরা মানব না।

—বটে, তলোয়ার, এর শিরশ্ছেদ কর।

তলোয়ার তখনই শাঁ করে সেনাপতির মাথা কেটে ফেলল।

সবাই তো অবাক।

সদাগর-পুত্র এবার আলখাল্লা খুলে ফেলল। সবাই দেখল তাদের পুরানো রাজা ফিরে এসেছে। সদাগর-রাজা বলল—আজ থেকে পুরানো মন্ত্রী কোটাল সভাসদ্ সবাইকে আমি বরখাস্ত করলাম, যে

গোলমাল করবে তারই মুণ্ড কাটব সেনাপতির মত। সব বিদায় হও, আমি নতুন মন্ত্রী নতুন সেনাপতি নিয়ে কাজ চালাব—যাও।

প্রাণের ভয়ে সবাই মাথা হেঁট করে বিদায় হল।

সদাগর-পুত্র আবাব রাজা হয়ে বসল সিংহাসনে।

দাসদাসী পাইক-পিয়াদা সিপাই-সান্ত্রী সবাই সাড়া তুলল—সদাগর-রাজার জয় হোক্।

রাজকন্যার মুখে হাসি ফুটল।—

রাজার ছেলে রাজা হয়—তাইত সবাই শেখে—
ইতিহাসে সেই কথাটাই লেখে।
এক যে ছিল সদাগব, ছিল তার এক ছেলে,
রাজকন্যা বিয়ে কবে সে অনেক দুঃখ পেলে,
তারপরে সে বসল সিংহাসনে.
ইতিহাস বদলালো সেইক্ষণে।

আজব মূলা—আজব গাজর

এক ছিল শিকারী। সে বনে বনে ঘুরত শিকারের সন্ধানে। একদিন এক বনের ধাবে এক বুড়ীর সঙ্গে তাব দেখা হল। বুড়ী বললে—কিছু খেতে দিবি বাবা? ক'দিন খেতে পাইনি।

শিকারীর পকেটে ছিল রুটি আর ফলমূল। বুড়ীকে সে দিয়ে দিলে, বললে—খাও।

বুড়ী তৃপ্তি করে খেলে, তারপর বললে—তোর মনটা খুব ভাল, তোর জন্যে অনেকদিন বাদে আমি পেট ভবে খেতে পেলাম। তোর যাতে ভাল হয় আমি তা করব, আমার কথা শোন্। এই পথ ধরে বনের মধ্যে যা। খানিকটা গেলেই দেখতে পাবি একখানা চাদরের উপর ন'টা কাক বসে আছে। সেই কাকগুলোর মাঝের কাকটাকে তীর ছুঁড়ে মারবি। আর সব কাক পালিয়ে যাবে। ওই কাকের

কেটে নিবি মাথাটা। রাতে বালিশের তলায় সেই মাথাটা রেখে শুলে সকালে বালিশের নীচে একখানা মোহর পাবি। আর ওই চাদরখানাও নিয়ে আসবি। ওটা গায়ে জড়িয়ে যেখানে যাবার ইচ্ছা হবে বললেই চোখের নিমেষে সেখানে পৌঁছে যাবি। ওই দুটো জিনিষেই তোর বরাত ফিরে যাবে। পয়সা হলে গরীব-দুঃখীকে দয়া করিস্।

বুড়ীর কথামত শিকারী বনে গিয়ে ঢুকল। কিছুদূর গিয়েই দেখে একখানি চাদর পড়ে আছে আর তার উপর ন'টা কাক ঝগড়া করছে। শিকারী তখনই তীর ছুঁড়ে মাঝের কাকটিকে মারল, বাকি আটটি কাক উড়ে গেল। শিকারী সেই কাকের মুণ্ডটা কেটে নিলে, আর কুড়িয়ে নিলে সেই চাদরখানি।

শিকারী বাড়ী ফিরল। বিছানার বালিশের নীচে রেখে দিল কাকের মুণ্ড। পরদিন সকালে উঠে দেখে বালিসের নীচে সত্যি একটা মোহর রয়েছে। তাহলে তো আজ থেকে আমি বড়লোক হলাম, আমার আর বনে বনে ঘুরে শিকার করার দরকার কি? খাবার ভাবনা তো আর রইল না, ঘুম থেকে উঠেই এক একখানা মোহর। এবার দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াই। এই ভেবে শিকারী সেই দিনই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। চাদরখানা সঙ্গে নিতে ভুলল না।



চলতে চলতে সন্ধ্যাবেলা শিকারী এসে পড়ল এক বনের কাছে। সেখানে এক মেটে বাড়ী। সে বাড়ীতে থাকত এক ডাইনী আর তার মেয়ে। বিকালবেলা ডাইনী দাওয়ায় বসে ছিল। দূর থেকে শিকারীকে দেখতে পেল। মেয়েকে ডেকে বলল—খুকী, ওই যে লোকটা আসছে ওর কাছে দুটি আশ্চর্য বস্তু আছে, একটা কাকের মুণ্ড আর একখানা চাদর। ওই দুটি জিনিষ ওর কাছ থেকে আদায় করে নিতে হবে।

বুড়ী এসে বাড়ীর দরজায় দাঁড়াল। শিকারী কাছে আসতেই বলল—কে বাবা তুমি, এই সন্ধ্যেবেলা বনের ধার দিয়ে চলেছ?

—আমি শিকারী।

—তা বেশ, কিন্তু অন্ধকারে তো নজর চলবে না, বাঘ লাফিয়ে পড়বে ঘাড়ের উপর। এই বনে বড় বাঘের ভয়।

—কিন্তু আমাকে তো যেতেই হবে। একটা সরাইখানা না পেলে থাকি কোথায়?

—কেন বাবা, তুমি এখানে থাক না, এখানে তো কতলোক রাতে থেকে যায়, যাবার সময় দু'চার পয়সা যা দিয়ে যায় তাতেই আমাদেব মা-মেয়ের দিন চলে।

শিকারী বুড়ীর বাড়ীতেই উঠল। ডাইনী দুধ মুড়ি নারকেল খেতে দিল। শিকারী খেয়ে-দেয়েই শুয়ে পড়ল। সারাদিনের ক্লান্তি, শুতে না শুতেই ঘুম।

রাতদুপুরে ডাইনী এসে বালিসের নীচে থেকে কাকের মুণ্ডটা বের করে নিলে, আরেকটা কাকের মুণ্ড রেখে দিলে তার বদলে। শিকারী কিছুই জানল না।

সকালে শিকারী উঠে বালিশের নীচে মোহর পেলে না। কাকের মুণ্ড আছে কিন্তু মোহর নেই, সে অবাক হল। যে টাকাব জোরে সে দেশভ্রমণে বেরিয়েছিল সে টাকা তো আর হবে না। তাকে তো আবার ঘরে ফিরতে হবে। শিকারীর মন খারাপ হয়ে গেল। এমন সময় ডাইনীর মেয়ে এল, বলল—সকালে ঘুম থেকে উঠেই এত ভাবনা কিসের, মুখ হাত ধোও, জলখাবার যে তৈরী।

শিকারী বলল—পয়সার কথা ভাবছি।

মেয়েটি বলল—পয়সা চাই? আমি হীরে-জহরতের সন্ধান দিতে পারি, নেবে?

—কোথায়?

—ওই যে মেঘের কোলে পাহাড় দেখছ, ওই পাহাড়ের মাথায়।

ওখানে এক গুহার মধ্যে অনেক হীরে-জহরৎ জমান আছে আমি জানি, ওখানে যেতে পারবে ?

—তা পারব না কেন ? কিন্তু কোন্ গুহা কোথায় খুঁজব ?

—আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল, আমি চিনি।

শিকারী তখনই চাদরখানি বের করল, তারপর সেই চাদরে নিজেকে ও খুকীকে জড়িয়ে নিল। বলল—চাদর, নিয়ে চল আমাদেরকে ওই পাহাড়ে।

চোখেব নিমেষে চাদর দু'জনকে পাহাড়ে পৌঁছে দিল।

খুকী শিকারীকে নিয়ে গেল এক গুহায়। সেখানে হীরে চুনী পান্নার সাদা সবুজ লাল দ্যুতি ঝল্‌মল্ করছে। চোখে ধাঁধা লাগে। খুকী বলল—যত খুসি নাও এবাব।

শিকারী আগে পকেটে যত পাবল ভরল, কাপড়ের খুঁটে বাঁধল যত পাবে, তারপর বলল—চল এবার যাই।

কে যাবে ? যতক্ষণ ধবে শিকারী চুনী পান্না কুড়াচ্ছিল, ততক্ষণে তার চাদরখানি গায়ে মুড়ি দিয়ে খুকী সরে পড়েছে। শিকারী গুহা থেকে বেরিয়ে খুকীকে কোথাও দেখতে পেলে না। তখন সে ভাবল—আমি এখন করি কি ? এত হীরে-জহরৎ কি করে নিয়ে যাই ?

হঠাৎ নীচের পানে তাকিয়েই তার মাথা ঘুরে গেল। তিনজন দৈত্য উঠে আসছে পাহাড় বয়ে। ওদের সামনে পড়লে তো আর রক্ষা নেই, কিন্তু এখানে লুকাবার জায়গাও তো নেই। সব হীরে-জহরৎ ফেলে একখানি পাথরের আড়ালে গিয়ে শিকারী শুয়ে পড়ল। ঘুমাবার ভাণ করে চোখ বুঁজে পড়ে রইল। নাক ডাকতে লাগল।

দৈত্য তিনজনে উঠে এল পাহাড়ের উপরে।

প্রথম দৈত্য বলল—এটা কে ? এখানে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে ?

দ্বিতীয় দৈত্য বলল—দাও না সুট্ করে, একেবারে পাহাড়ের নীচে গিয়ে পড়বে।

তৃতীয় দৈত্য বলল—ছুঁচো মেরে লাভ কি ? খানিক পরেই যখন ঝড় বইবে, তখন ঝড়েই ওকে উড়িয়ে নিয়ে ফেলবে নীচে। চল—

তিন দৈত্য চলে গেল।

শিকারী সব শুনল, এবার উঠে পাহাড় থেকে নামতে সুরু করল।

কিন্তু সে কি এতটুকু পাহাড় যে নেমে আসবে? নামতে নামতে বেলা পড়ে এল, আকাশে মেঘ উঠল। দেখতে দেখতে শন্ শন্ করে ঝড় বইতে সুরু করল। একটা ঘূর্ণী ঝড় এসে শাঁ করে তাকে তুলে নিলে, কয়েকটা ঘুরপাক খাইয়ে তাকে পাহাড় পার করে এনে ফেলে দিলে এক বাগানে। আছড়ে পড়াই উচিত ছিল, কিন্তু পড়ল এক বাঁধাকপির খেতের উপর, কচি পাতার উপর, তার কোন আঘাত লাগল না। গা থেকে ধুলো ঝেড়ে শিকারী উঠে দাঁড়াল।

সামনেই একটা গাজরের খেত। সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি, কয়েকটা গাজর খেলে মন্দ হয় না। শিকারী খেত থেকে একটি গাজর তুলে খেলে। খেতেই তার কেমন যেন মনে হল তার শরীরটা বদলে যাচ্ছে। গাজর খাওয়া শেষ হতেই সে দেখে যে সে আর মানুষ নেই, একটা গাধা হয়ে গেছে।

শিকারী গাধা হয়ে থ' হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ভাবল—গাধাই যখন হলাম যখন পেট ভরেই খাই। সামনের খেতে বড় বড় মূলা গাছ হয়েছিল, গাধা গিয়ে ঢুকল সেখানে, একটার পর একটা মূলা খেতে সুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, যে সে আবার বদলে যাচ্ছে। খাওয়া শেষ হলে দেখে সে আবার মানুষ হয়ে গেছে।

এমন আজব ফসল হয় তা শিকারী কোন দিন শোনেনি। খানিকক্ষণ সে বসে রইল সেই খেতের ধারে, তারপর কয়েকটা গাজর আর মূলা খেত থেকে তুলে নিয়ে সে পথ চলতে সুরু করল।

সাতদিন সাঁত রাত হেঁটে সে আবার এল সেই বনের ধারে, সেই ডাইনীর বাড়ীর সামনে। সারা অঙ্গে ছাই মেখে সে সন্ন্যাসী সাজল। তারপর সন্ধ্যেবেলা ডাইনীর বাড়ীর দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিল, বলল—আজ রাতটা আশ্রয় দাও, কাল সকালে চলে যাব।

ডাইনী বলল—তুমি কে? কোথা থেকে আসছ?

সন্ন্যাসী বলল—আমি রাজবাড়ী যাচ্ছি, এক গাজরের নমুনা নিয়ে। এই গাজর খেলে সব রোগ সারে।

—সত্যি?

—খেয়ে দেখতে পারেন। তবে একটার বেশী দিতে পারব না। হালুয়া করে খান।

সন্ন্যাসী একটা গাজর বের করে দিলে।

ডাইনী সন্ন্যাসীর থাকবার জায়গা করে দিয়ে ছুটল রান্নাঘরে। বলল—খুকী, হালুয়া কর, এই গাজর খেলে নাকি আর কোন রোগ হয় না।

তখনই হালুয়া তৈরী হল, মা ও মেয়ে সেই হালুয়া ভাগ করে খেলে। চমৎকার হালুয়া। বাড়ীতে এক দাসী ছিল, সে বলল—কি তৈরী হল গো?

খুকী বলল—গাজরের হালুয়া, খাবি?

খুকী দাসীকেও খানিকটা বখ্‌রা দিলে।

হালুয়া খাওয়া শেষ হতেই দেখা গেল তিনটে গাধা রান্নাঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। চীৎকার করে গাধা তিনটে কাঁদতে সুরু করল। সেই ডাক শুনে সন্ন্যাসী রান্নাঘরে গেল, গাধা তিনটিকে দড়ি দিয়ে বাঁধল, বলল—আমার সঙ্গে যে শয়তানি করেছ এবার তার ফল ভোগ কর।

শিকারী গাধা তিনটিকে নিয়ে গেল গাঁয়ে। এক ধোপাকে বলল—গাধা তিনটে রাখবে? আমি দাম চাই না। বিদেশ যাচ্ছি, তোমার জিম্মায় গাধা তিনটে রেখে যেতে চাই।

ধোপা বলল—ভাল কথা, রেখে যাও।

শিকারী বলল—কিন্তু একটা কাজ তোমায় করতে হবে। এই বুড়ো গাধাটাকে আচ্ছা করে পেটাবে, আর দিনে একবার খেতে দেবে, এটা মহা পাজী। এই আধাবয়সী গাধাটাকে দিনে দু'বার খেতে দেবে, মারধর করার দরকার নেই। আর এই বাচ্চা গাধাটাকে দিনে তিনবার খেতে দেবে, মোটেই মারবে না।

ধোপা বলল—বেশ, যা বললেন তাই করব।

ধোপার জিম্মায় গাধা রেখে শিকারী চলে এল।

ডাইনীর বাড়ীতেই শিকারী থাকে। সুখেই থাকে। একখানি বাড়ীতে সে একা।

একমাস পরে শিকারী গেল ধোপার বাড়ীতে। বলল—গাধার খবর কি?

ধোপা বলল—বাবু, বুড়ো গাধাটা না খেয়ে মরে গেছে, বাকি দুটো ভাল আছে।

—বেশ, দুটোকে দাও, আমি নিয়ে যাই।

গাধা দুটো নিয়ে শিকারী বাড়ী ফিরল।

গাধা দুটো ডাকে আর কাঁদে, শিকারীর দয়া হল। এবার দু'জনকে দুটো মূলা দিল খেতে। খাওয়া শেষ হতেই দুই গাধা আবার মানুষ হয়ে গেল।

শিকারী বলল—আবার শয়তানি করলে আবার গাধা করে দেব।

খুকী বলল—আমি কোন সয়তানি করিনি, মা যা বলেছে আমি তাই করেছি। তোমার চাদর ও কাকের মুণ্ড আমি এখনি ফিরিয়ে দিচ্ছি।

শিকারী বলল—আমি আর ফিরিয়ে নিয়ে করব কি? আমি তো এখন এখানেই থাকব।

খুকী বলল—এখানেই থাকবে?

শিকারী বলল—হ্যাঁ, তোমাকে বিয়ে করে আমি এখন এই বাড়ীতেই থাকব। বনের ধারে নিরিবিলি এই বাড়ীখানি আমার খুব ভাল লেগেছে।

শিকারীর সঙ্গে খুকীর বিয়ে হয়ে গেল। দু'জনে সেই বাড়ীতেই রয়ে গেল সারা জীবন।—

দুষ্টলোক নষ্টামি করে ভাল মানুষের সাথে।
শেষে দুষ্ট কাত্‌ হয়ে যায় বড় দুষ্টের হাতে॥

ছাইকুড়ানী

মস্ত বড়লোক। বাবা মা আর একটি মেয়ে। মায়ের বড় অসুখ। কোন ডাক্তার-বদ্যি সে অসুখ সারাতে পারল না। মা বুঝলেন আর তিনি বাঁচবেন না। মেয়েকে ডেকে বললেন—তুমি ভাল হবে, কখনও কারও সঙ্গে খাবাপ ব্যবহার করবে না। আমি স্বর্গ থেকে সব দেখব।

ক'দিন পরে মা মারা গেলেন। মায়ের কবর দেওয়া হল। মেয়েটি রোজ বিকালে গিয়ে মায়ের কবরে ফুল দিয়ে আসে আর বসে বসে কাঁদে!

এদিকে বাবা আবার বিয়ে করলেন। নতুন সৎমা এল সঙ্গে তুটি মেয়ে নিয়ে। সৎমা আব তাব তুই মেয়ে খুকীকে তু'চোখে দেখতে পারে না, শুধু হুকুম করে—এটা কর্ ওটা কর। খুকী সারাদিন কাজ করে। জল তোলে, উনুনের ছাই কুড়ায়, বাসন মাজে, হাত থেকে ছায়ের ময়লা মোছে না, কাপড়ে লেগে থাকে ছায়ের দাগ। সারাদিন কাজ করে রাতে একটা ছেঁড়া মাতুরে শুয়ে থাকে। সৎ-বোনেরা তাকে ডাকে—ছাইকুড়ানী!

ছাইকুড়ানী সারাদিন খাটে আর মনের তুঃখে কাঁদে।

সহরে মেলা হচ্ছে, বাবা মেলায় যাবেন। সৎতাতো বড় বোন বলল—আমার জন্যে ভাল কাপড় এনো।

সৎতাতো ছোট বোন বলল—আমার জন্যে এনো মুক্তার মালা।

ছাইকুড়ানী বলল—আমার জন্যে এনো এক থোকা সাদা ফুল।

বাবা মেলায় গিয়ে ভাল কাপড় কিনলেন, মুক্তার মালা কিনলেন, তারপর আসবার পথে চোখে পড়ল এক গাছে এক থোকা সাদা ফুল, সেইটি তুলে আনলেন ছাইকুড়ানীর জন্য।

ফুল পেয়ে ছাইকুড়ানী বড় খুসি, সেগুলি নিয়ে সে মায়ের কবরে গেল। সেই ফুলের ডালগুলি পুঁতে দিল কবরের উপর।

ক'দিনের মধ্যে সেই ডাল থেকে ছোট ছোট গাছ গাজিয়ে উঠল।

ক'দিন পরে রাজবাড়ীতে এক উৎসব এল। মেয়ে দেখার উৎসব। রাজপুত্রের বিয়ে হবে, তিনদিন ধরে সে-রাজ্যের যত মেয়ে সে দেখবে, তার মধ্যে থেকে কনে পছন্দ করবে। যত মেয়েকে তাই নিমন্ত্রণ করা হয়েছে রাজবাড়ীতে। সারা দেশ জুড়ে মেয়ে-মহলে সাড়া পড়ে গেছে।

সৎতাতো দুই বোন ছাইকুড়ানীকে বলল—আমাদের জুতো মুছে পরিষ্কার চকচকে করে দে, আমরা আজ রাজবাড়ী যাব।

দুই বোন ভাল পোষাক পরে, জুতো পায়ে দিয়ে রাজবাড়ী চলল। ছাইকুড়ানী বলল—মা, আমি যাব রাজবাড়ীর উৎসব দেখতে।

সৎমা বলল—তোর ভাল সাজ-পোষাক নেই, তুই কোথায় যাবি?

ছাইকুড়ানী বলল—আমার সাজ-পোষাকের দরকার কি, আমি একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকব, সব দেখে শুনে পালিয়ে আসব।

—না, অমনভাবে গেলে তোর বাবার অপমান হবে।

ছাইকুড়ানী কাঁদতে থাকে। তখন সৎমা বলল—বেশ, এই মটরগুলি আমি ছাইগাদায় ফেলে দিচ্ছি, সবক'টি কুড়িয়ে আনতে পারলে তোকে নিয়ে যাব।

এক বাটি মটর সৎমা ছাইগাদায় ছড়িয়ে ফেলল।

ছাইকুড়ানী পুকুর পাড়ে ছাইগাদায় গিয়ে দাঁড়াল, তারপর সুর করে ডাকল—কাক চড়ুই শালিখ, তোদের দিয়েছি খেতে দানা,

যতন করে দিয়েছি খেতে ফল-পাকড় নানা,
আয় না সবাই, আমার তরে কর্ না একটু কাজ,
মটরগুলো কুড়িয়ে দে না, রাজবাড়ী যাই আজ।

ডাক শুনে শালিখ কাক চড়ুয়ের ঝাঁক এসে পড়ল, ছড়িয়ে পড়ল ছাইয়ের গাদায়, টুক্ টুক্ করে কুড়োতে সুরু করল যত মটরের দানা। কুড়োয় আর বাটির মধ্যে রাখে। দেখতে দেখতে বাটি ভরে

গেল। সব দানা কুড়ানো শেষ হল। ছাইকুড়ানী বাটিভরা মটর এনে দিল সৎমায়ের কাছে, বলল—মা, এবার আমাকে নিয়ে চল।

সৎমা বলল—না, তোর কিছুতেই যাওয়া হবে না, জামা নেই কাপড় নেই, রাজবাড়ীতে ঝিয়ের মত গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবি, আর আমি বলব—'আমার মেয়ে', তা হয় না।

দুই মেয়েকে নিয়ে সৎমা রাজবাড়ী চলে গেল।

ছাইকুড়ানী পুকুর-ঘাটে এসে কাঁদতে বসল। তারপর কোন এক সময় সামনের হিজেল গাছের পানে তাকিয়ে বলে উঠল—

হিজেল গাছ, হিজেল গাছ, বল না আমায় বল্
কেমন করে রাজবাড়ীতে যাই।
হাতে পায়ে ছায়ের দাগ, ছাই মাখা কাপড়,
সাজ-গোজ করার পোষাক কেমন করে পাই ?

পাখীর দল গাছের মাথায় সাড়া তুলল—পিক্ পিক্ পিক্।

তারপরেই শালিখের দল জরীর কাজ করা রেশমী পোষাক এনে সামনে রাখল।

কাক নিয়ে এল জরীর জুতা।

চড়ুই নিয়ে এল মাথার টুপি।

ছাইকুড়ানী তো অবাক। তখনই হাতমুখ ধুয়ে, সেই পোষাক পরে সে চলল রাজবাড়ীতে।

রাজবাড়ীতে অমন পোষাক কারও ছিল না, সবাই তো অবাক। সবাই ভাবল কোন রাজকন্যাই হবে হয়ত। রাজপুত্র এসে বললে—তোমার নাম কি ? কোথেকে আসছ ?

ছাইকুড়ানী বলল—সব পরে বলব।

সবাই তার খাতির করতে লাগল, রাজপুত্র নিজে সামনে বসিয়ে তাকে খাওয়াল, তারপর বলল—চল, তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।

ছাইকুড়ানী বলল—না না, আমি একাই যাব।

যেই একটু ফাঁক পেয়েছে সকলকে লুকিয়ে সে বাড়ী চলে গেল।

রাজকুমারের কিন্তু নজর ছিল, সে-ও ঠিক তার পিছনে এল। বাড়ী ঢুকতে গিয়ে ছাইকুড়ানী দেখে পিছনে রাজপুত্র, এক দৌড়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে সে লুকিয়ে পড়ল। রাজকুমার তার বাবাকে ডাকল, বলল —এখানে এক রাজকন্যা এসেছে।

বাবা রাজপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে সারা বাড়ী দেখলেন কিন্তু কোথায় রাজকন্যা? কেউ কোথাও নেই।

ছাইকুড়ানী তখন হিজেল গাছের নীচে গিয়ে জামা-কাপড় বদলে আবার রান্নাঘরে এসে বসেছে।

পরদিন আবার ভোজসভা। সৎমা মেয়ে দুটিকে নিয়ে চলে গেল। ছাইকুড়ানী হিজেল গাছের নীচে গিয়ে বলল—

হিজেল গাছ, হিজেল গাছ, রাজবাড়ী যদি যাই,
আজকে আবার সাজ-পোষাক দেবে কি তুমি ভাই?

পাখীরা তখনই উড়ে এল—পিক্ পিক্ পিক্। তারা নিয়ে এল নতুন পোষাক। ছাইকুড়ানী সেই পোষাক পরে রাজবাড়ী গেল। সেদিনও রাজপুত্র বলল—তোমার নাম কি? কোথা থেকে আসছ?

ছাইকুড়ানী চুপ করে রইল।

সেদিন রাত্রে বাড়ী ফেরার সময় রাজপুত্র তার পিছনে এল। তার বাবাকে সঙ্গে নিয়ে সারা বাড়ী ঘুরল, কিন্তু রান্নাঘরে ছাইকুড়ানী ছাড়া আর কাউকেই দেখতে পেলে না।



তিনদিন ভোজসভা। তিনদিন রাজবাড়ীতে সবাইকার নিমন্ত্রণ। তৃতীয় দিনেও সৎমা মেয়েদের নিয়ে চলে যাবার পর ছাইকুড়ানী রাজবাড়ীতে গেল। সে দিন রাজপুত্র ঠিক করল—আজ আর ওই মেয়েকে ছাড়ব না।

ভোজের শেষে কোন মতেই রাজপুত্রের দৃষ্টি এড়াতে না পেরে ছাইকুড়ানী দৌড় দিল। তাড়াতাড়ি

পালাতে গিয়ে একপাটি জুতা পড়ে রইল পথে। সেটা কুড়িয়ে নেবার অবকাশ ছাইকুড়ানী পেলে না। রাজপুত্র পিছনে আসছিল। জুতাটা সে কুড়িয়ে নিল।

পরদিন রাজসভায় রাজপুত্র বলল—এই জুতা যার সেই মেয়েকে আমি বিয়ে করব।

জুতা কার? জুতা নিয়ে রাজকর্মচারীরা বাড়ী বাড়ী ঘুরতে লাগল, —দেখ, কার জুতা এটা।

সৎমায়ের বড় মেয়ে জুতা পরল। পা ঢুকছে না। তবু জোর করে সে জুতাটা পরল, বুড়া আঙুলটা ছুরী দিয়ে কেটে বাদ দিলে। জুতা পরল বটে, কিন্তু দেখতে দেখতে রক্তে পা ভিজে গেল। রাজকর্মচারীরা বলল—একি!

হিজেল গাছ থেকে ঘুঘু পাখী বলে উঠল—ঘু ঘু ঘুক্ ঘু—

এ মেয়ে নয়, এ মেয়ে নয়,
দিচ্ছে নিজের মিথ্যে পরিচয়।
আঙুল কেটে জুতা পরেছে পায়,
খোঁড়া মেয়ে রাজরাণী হতে চায়॥

রাজকর্মচারীরা জুতা পা থেকে খুলে নিলে।

এবার ছোট বোন জুতা পরল। পা বড়, জুতা ছোট। মা মট্‌মট্ করে পায়ের আঙুলগুলি ভেঙে দিয়ে জুতা পরিয়ে দিলে। মেয়ে পা ফেলে চলতে পারে না। রাজকর্মচারীরা বলল—এ কী!

হিজেল গাছ থেকে ঘুঘু বলে উঠল—ঘু ঘু ঘুক্ ঘু—

এ মেয়ে নয়, এ মেয়ে নয়,
দিচ্ছে নিজের মিথ্যে পরিচয়।
আঙুল ভেঙে জুতা পরেছে পায়,
খোঁড়া মেয়ে রাজরাণী হতে চায়॥

রাজকর্মচারী জুতা খুলে নিলে।

রাজকর্মচারীরা জিজ্ঞাসা করল—আর কোন মেয়ে আছে এ বাড়ীতে?

বাবা বললেন—আছে আমার ছোট মেয়ে, বড় নোংরা, সে রান্নাঘরে ছাই কুড়াতে ভালবাসে, তাই তাকে আমরা বলি ছাইকুড়ানী, সদাই ছাই মেখে থাকে।

—তা থাক্, জুতাটা তাকে পরে দেখতে বল। আমাদের উপর হুকুম আছে,—কোন মেয়ে বাদ না যায়।

সৎমা বলল—সে সব সময়েই ছাই-পাঁশ মেখে থাকে, সে এ জুতা পরবে কি!

—তবু পরতে হবে, রাজার হুকুম মানতে হবে।

ছাইকুড়ানীর ডাক পড়ল। হাত পা ধুয়ে সে এল। জুতা পায়ে দিতেই চমৎকার মানিয়ে গেল। রাজকর্মচারীরা বলল—তোমায় যেতে হবে রাজবাড়ীতে।

ছাইকুড়ানীকে তারা রাজবাড়ী নিয়ে গেল। রাজপুত্র তার মুখের পানে তাকিয়েই বলল—হ্যাঁ, এই তো সেই মেয়ে।

ঘুঘুপাখী এতক্ষণ সঙ্গে আসছিল, এবার উড়ে এসে বসল ছাইকুড়ানীর কাঁধের উপর, ডেকে বলল—ঘু ঘু ঘুক্ ঘু—

এই কন্যেই আসল কন্যে জেনো, রাণী হবার যোগ্য মেয়ে এই।
রূপে গুণে এমন ভাল মেয়ে এ রাজ্যে কোনখানে আর নেই॥

ছাইকুড়ানীর সঙ্গেই রাজপুত্রের বিয়ে হয়ে গেল।—

অকারণে সকাল-সন্ধ্যেবেলা
যারে তুমি করছ অবহেলা,
কোন দিন হয়তো কোন ক্ষণে
সে-ই বসবে সবার উচ্চাসনে।

সাত কাকের গল্প

এক ছিল চাষী। চাষীর সাত ছেলে আর এক মেয়ে। মেয়েটি বড় রোগা, যে দেখে সে-ই বলে—এ মেয়ে বাঁচবে না।

এক সন্ন্যাসী বলল—মেয়েকে সাত কলসী জলে স্নান করালে মেয়ের শরীর ভাল হবে।

সাত ভাই সাতটি কলসী নিয়ে গেল জল আনতে।

কূয়াতলায় গিয়ে সাতভাই এমন তাড়াহুড়া করল যে সাতটা কলসীই পড়ে গেল কূয়ার মধ্যে। এখন বাড়ী গিয়ে কি বলবে? কত বকুনি খেতে হবে। সাত ভাই আর বাড়ী ফিরল না, বসে রইল কূয়াতলায়।

ত্বপুর হয়ে গেল, ছেলেরা ফিরল না। সাত কলসী জল আনতে আর কতক্ষণ যায়? বাপ রেগে বলে উঠল—ছেলেগুলো যেন এক একটা কাক, যেমন কালো কালো দেখতে তেমনি উড়ো স্বভাব। জল আনতে গেল তা বাড়ী ফেরার নাম নেই।

এই কথা বলতে না বলতেই সাত ছেলে সাতটি কাক হয়ে গেল, উড়ে এসে বসল ঘরের দাওয়ায়। সাত কাককে দেখেই চাষী বুঝতে পারল তার গাল ফলে গেছে। সে থ' হয়ে গেল।

কা কা করতে করতে সাতটি কাক উড়ে চলে গেল।

চাষীর মনে বড় কষ্ট, কাউকে আর কিছু বলে না। এদিকে চাষীর মেয়ের শরীর ভালো হতে থাকে। সে বড় হতে থাকে। কিন্তু তার যে সাত ভাই ছিল তা সে জানে না। পাড়া-পড়শীরা তাকে দেখে বলে—এই মেয়েটার জন্মেই সাতটা ভাই হারিয়ে গেল!

খুকী শুনে মাকে এসে বলে—মা, আমার সাত ভাই হারিয়ে গেছে?

মা সাত ভাইয়ের কাক হয়ে যাবার কথা বলেন।

খুকীর মনে কষ্ট হয়। সে কাঁদে আর বলে—ঠাকুর, বলে দাও, কি করলে আমার ভাইয়েরা মানুষ হয়ে ফিরে আসবে।

শেষে একদিন ভাইদের সন্ধানে সে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল, সঙ্গে নিল একখানি রুটি আর এক ঘটি জল। বরাবর পূব্‌মুখে সে হাঁটতে সুরু করে। সূর্যের কাছে সে যাবে, সূর্য সব কিছু দেখতে পান, তিনি বলে দেবেন ভাইয়েরা কোথায় আছে।



সূর্যের যত কাছে যায়, তত গরম। অতো গরম সে সইতে পারে না, ফিরে আসে।

এবার সে যায় পশ্চিম মুখো। চাঁদকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবে ভাইদের কথা।

চাঁদের যত কাছে যায় তত ঠাণ্ডা। শীতে কাঁপুনি হয়, হাত পা জমে যায়, সে আর চলতে পারে না, ফিরে আসে।

এবার সে যায় উত্তরে, তারার দেশে। সেখানে অতো ঠাণ্ডা নয়, অমন গরমও নয়। সকালবেলা শুকতারার সঙ্গে তার দেখা হয়। বলে—বলে দাও আমার ভাইয়েরা কোথায় আছে।

শুকতারা বলে—ফটিক পাহাড়ে মস্ত গুহা আছে, সেখানে সাতটি কাক থাকে।

শুকতারা একটি লাঠি দেয়, বলে—এই লাঠি তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

লাঠি ধরে খুকী আসে ফটিক পাহাড়ের গুহায়। সেখানে এক বামন বসে আছে। খুকী বলে—এসেছি আমার সাত ভাইয়ের খোঁজে।

বামন বলে—বসো, সন্ধ্যে হলেই তারা আসবে।

সাত থালায় বামন সাত কাকের খাবার রেখেছিল, সাত গ্লাস জল রেখেছিল। খুকীর খিদে পেয়েছিল, এক এক থালা থেকে এক এক টুকরো খাবার সে খেলে, এক এক গ্লাস থেকে এক এক চুমুক জল খাবার সময় তার আঙুলের আংটিটা পড়ে গেল একটি গ্লাসের মধ্যে।

এবার কাকেরা ফিরল। খাবার দেখেই কাকেরা বলল—কে খেয়েছে আমাদের থালা থেকে? জলের গ্লাসে ঠোঁটের দাগ রয়েছে লেগে।

তারপর গ্লাসের মধ্যে আংটি দেখেই তারা চিনল, বলল—

এসেছে আমাদের ছোট বোন এইখানে।
কেমন করে এলো হেথায় কে জানে॥

খুকী এবার সামনে এল। সাত কাকের গায় হাত বুলিয়ে দিল। তখনই সাত কাক সাতটি ছেলে হয়ে গেল।

সাত ভাইকে নিয়ে হাসতে হাসতে খুকী বাড়ী ফিরল।—

ভাই বোনের স্নেহ ভালবাসা চিরন্তনেব মাধুর্যে মহীয়ান।
সুখের দিনে গৌরব তার কত, দুঃখের দিনে অজেয় অম্লান॥

ছয় বন্ধুর দেশভ্রমণ

এক ছিল সৈনিক। রাজার কাছে তিনবছর চাকরি করে সে বিদায় নিল। রাজা তাকে তিন বছরের মাইনে দিলেন তিনটি টাকা। সৈনিক বলল,—তিন বছরের মাইনে মাত্র তিনটি টাকা! যদি কোনদিন সুবিধা পাই তো এই রাজার সব টাকা-পয়সা দখল করে নেবো।

মনের দুঃখে সৈনিক বনে চলে গেল।

বনে ঘুরতে ঘুরতে সে দেখলে একটি লোক বড় বড় গাছ উপড়ে ফেলছে। সৈনিক বললে—তুমি আমার সঙ্গী হবে?

লোকটি বললে—আগে মায়ের কাছে এই জ্বালানী কাঠগুলো দিয়ে আসি।

ছয়টি গাছ সে অতি সহজে কাঁধে তুলে নিয়ে চলে গেল।

একটু পরেই ফিরে এসে সে বললে—চল, কোথায় যাবে।

দু'জনে কিছুদূর গিয়ে দেখে এক শিকারী একটা বন্দুক নিয়ে কি যেন একটা তাগ্ করছে। সৈনিকটি বললে—সামনে তো কিছু দেখছি না, কাকে গুলি করছ?

শিকারী বললে—দু মাইল দূরে একটা গাছের ডালে একটা মাছি বসে আছে, সেইটাকে তাগ্ করছি।

সৈনিক বললে—তুমি আমার সঙ্গী হও।

তিনজনে কিছুদূর গিয়েই দেখে একটা লোক গাছের উপরে বসে, এক দিকের নাক টিপে ধরে আরেক দিক দিয়ে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে। সৈনিক বললে—তুমি কি করছ?

লোকটি বললে—ছ মাইল দূরে সাতটি হাওয়া-কল আছে আমি তার চাকা ঘোরানোর হাওয়া দিচ্ছি।

সৈনিক বললে—তুমি আমাদের সঙ্গী হও।

চারজনে কিছুদূব গিয়েই দেখে একটা লোক মাঠের উপব এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। সৈনিক বললে—তুমি কি কবছ?

লোকটি বললে—এইমাত্র একশো মাইল ঘুবে এলাম, এখন একটু জিরুচ্ছি।

—একশো মাইল ঘুবে এলে?

—আমি যে পাখীব মত তাড়াতাড়ি চলতে পাবি।

—বেশ, তুমি আমাদের সঙ্গী হও।

পাঁচজনে কিছুদূব গিয়েই দেখে একটি লোক মাথাব টুপিটা একপাশে হেলিয়ে দিয়ে চলেছে। সৈনিক বলল—তুমি টুপিটা ঠিক-ত মাথায় দাও, পড়ে যাবে যে?

লোকটি বললে—এই টুপি যদি সোজা করে মাথায় দিই তাহলে এমন হিম পড়বে যে আকাশে উড়ন্ত পাখীগুলো জমে ববফ হয়ে যাবে।

সৈনিক বলল—বেশ, তুমি আমাদের সঙ্গী হও।

ছয় সঙ্গী চলল এবার বন ছাড়িয়ে, তেপান্তরের মাঠ পেবিয়ে, গাঁয়ের ভিতর দিয়ে, সহরের দিকে।

এক নগরে পৌঁছে তাবা শুনলে, সেখানকার রাজা ঘোষণা করেছেন, যে তাঁর মেয়েকে দৌড়ে হারাতে পারবে তিনি তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন। কিন্তু সে হারলেই তার মুণ্ড কাটা যাবে।

সৈনিক বলল—বেশ, রাজকন্যার সঙ্গে আমি দৌড়াতে রাজী আছি। তবে আগে আমার সঙ্গীর সঙ্গে রাজকন্যাকে দৌড়াতে হবে।

রাজা বললেন—সে কে ?

সৈনিক বলল—সে আমার প্রতিনিধি।

রাজা বললেন—সে হেরে গেলে কার মুণ্ড কাটা যাবে ?

সৈনিক বলল—আমার মুণ্ড কাটা যাবে।

রাজা বললেন—বেশ, তাহলে ঠিক আছে।

দৌড়ের জোগাড় হল। রাজকন্যা মাঠে এসে দাঁড়াল, সৈনিক দৌড়-বিশারদ সঙ্গীকে দাঁড় করিয়ে দিলে তার পাশে। রাজা রাজকন্যার হাতে একটি ঘটি দিলেন, দৌড়-বিশারদের হাতে দিলেন আরেকটা, বললেন—ছুটে গিয়ে মাঠের ওধারের নদী থেকে ঘটিতে জল ভরে আনতে হবে, যে আগে জল নিয়ে আসবে, তারই জিত।

দু'জনে ছুটল।

রাজকন্যা কিছুটা যেতে না যেতেই দৌড়-বিশারদ ঝড়ের বেগে উধাও হয়ে গেল। নদীতে পৌঁছে ঘটি ভরে জল নিয়ে সে ফিরল। অর্ধেক এসে ভাবল, এখনি ফিরে কি হবে, একটু বসে জিরিয়ে নিই। দৌড়-বিশারদ এক গাছতলায় বসে পড়ল। হাতের পাশে একটা গাছের ডাল পড়েছিল সেইটাকে বালিস করে সে শুয়ে পড়ল।

নদী অনেকখানি পথ। রাজকন্যা ছুটে গিয়ে ঘটিতে জল ভরে যখন ফিরছে, দেখে গাছতলায় দৌড়-বিশারদ ঘুমুচ্ছে। রাজকন্যা দৌড়-বিশারদের ঘটির জলটা ফেলে দিলে। তারপর ছুটে চলল রাজার কাছে।

এক ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে ছিল সৈনিক আর তার সঙ্গীরা। শিকারী সঙ্গী ধারালো নজরে সব কিছু দেখল। তখনই বন্দুকটা হাতে নিয়ে সে তাগ্ করে গুলি ছুঁড়লে। সেই গুলি গিয়ে লাগল গাছের ডালে। ডাল সরে গেল, দৌড়-বিশারদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে লাফিয়ে উঠে দেখে ঘটি খালি। রাজকন্যা এগিয়ে গেছে। তখনই ঝড়ের মত বেগে সে নদীতে গিয়ে ঘটি ভরে নিয়ে, ঝড়ের মত ছুটে গেল রাজার কাছে। একটুর জন্য রাজকন্যা হেরে গেল।

সৈনিক জিতল।

কিন্তু একজন সামান্য সৈনিকের সঙ্গে রাজার মেয়ের বিয়ে হবে,

এটা রাজার পছন্দ হল না। সৈনিকের গলায় মালা দিতে রাজকন্যাও রাজী নয়। রাজা রাজকন্যাকে বললেন—আমি এর একটা ব্যবস্থা করছি। এ বিয়ে হবে না।

রাজা তখন ছয়সঙ্গীকে নিমন্ত্রণ করলেন। রাজবাড়ীতে একখানি ঘর ছিল আগাগোড়া লোহার তৈরী। মেঝে দেয়াল ছাদ সব লোহার। সেই ঘরে রাজা ছয়সঙ্গীকে দিলেন খেতে। তারা টেবিল চেয়ারে বসে খাচ্ছে। এমন সময় রাজা সেই ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর খানসামাকে ডেকে হুকুম দিলেন, এই ঘরের নীচে আগুন জ্বেলে দাও, যেন লোহাব ঘর আগুনের তাপে লাল হয়ে ওঠে।

খানসামা আগুন জ্বেলে দিল। ঘর আগুনের তাপে গরম হতে লাগল। ছয় সঙ্গী বসে খাচ্ছিল, হঠাৎ দেখে মেঝেটা গরম হয়ে উঠেছে, তাবপর খাবার টেবিল ও বসার চেয়ারও গরম হয়ে উঠল। গরম যেন ক্রমেই বাড়ছে। তারা খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়ল। ঘর ছেড়ে বেরুতে গিয়ে দেখে দরজা বন্ধ। তখন তারা বুঝল রাজা তাদেরকে ঝল্‌সে মারার মতলব করেছে। টুপীওলা সঙ্গী বললে—বাজার এই দুষ্টবুদ্ধি কাজে লাগবে না।

টুপীওলা টুপীটি সোজা করে মাথায় বসিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে হিম পড়তে সুরু করল। লোহার ঘব ঠাণ্ডা হয়ে গেল, গেলাস ভবা জল জমে বরফ হল।

দু'ঘণ্টা পরে রাজা ঘরের দরজা খুললেন। ছয় সঙ্গী গট গট করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। রাজা খানসামাকে ডেকে বললেন—আগুন দাও নি?

খানসামা বললে—সে কি! গণগণ করে উনুন জ্বলছে।

রাজা উনুন নিজে দেখলেন, অবাক হলেন। বুঝলেন এত সহজে এদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না। রাজা তখন সৈনিককে ডেকে বললেন—তোমার সঙ্গে আমি মেয়ের বিয়ে দেব না। রাজকন্যা তোমাকেপছন্দ করছে না। তুমি কিছু টাকা-পয়সা নিয়ে বিদায় হও। তুমি কত টাকা চাও বল?

সৈনিক বলল—বেশী টাকা-পয়সা আমাদের দরকার নেই। আমার এক সঙ্গী যতটা বইতে পারবে ততটাই আপনি দিন।

রাজা বললেন—বেশ, ভাল কথা, তাই দেব।

সৈনিক বললে—বেশ, সাতদিন পরে এসে আমরা টাকা-পয়সা নিয়ে যাব।

সৈনিক নগরের সব দরজীকে ডেকে একটা থলি সেলাই করতে বললে। সাতদিন ধরে তারা সেলাই করল এক প্রকাণ্ড থলি। সেই থলি নিয়ে সৈনিক এল রাজার কাছে, বলল—এই থলি ভরে দিন।

রাজা বলল—এতবড় থলি বইবে কে?

সৈনিক বললে—একজন বইবে, সে লোক আমাদের আছে।

প্রথম সঙ্গী, সেই গাছ ওপড়ানো পালোয়ান এগিয়ে এল থলি বোঝাই করতে।

রাজা টাকা আনালেন। কলসী কলসী টাকা ভরে গেল সেই থলিতে। তারপর রাজা মোহর আনালেন। কলসী কলসী মোহর ভরে গেল সেই থলিতে। রাজা এবার সোনারূপা আনালেন। তাতেও থলি ভর্তি হল না। সৈনিক বলল—আরো চাই, থলি ভর্তি করুন।

রাজা বললেন—আব নেই, আমার কোষাগার খালি হয়ে গেছে।

—তাহলে এই নিয়েই যাই—বলে সৈনিক সেই থলি তুলে দিল পালোয়ানের কাঁধে। বিরাট থলি নিয়ে পালোয়ান অতি সহজেই হাঁটতে সুরু করল।

রাজা দেখলেন এই ছয়টা লোক তাকে পথের ভিখারী করে দিয়ে যাচ্ছে, সেনাপতিকে ডেকে বললেন—লোকটিকে ধরে নিয়ে এসো—

সেনাপতি ছুটল ঘোড়ায় চড়ে। পালোয়ানকে বললে—তোমাকে বন্দী করলাম। তুমি চল রাজার কাছে—

নিঃশ্বাস ফেলা বাতাসী সঙ্গী বলল—তুমি ওকে ধরে নিয়ে যাবে রাজার কাছে? তোমাকে কে ধরে দেখ—

এক নিঃশ্বাসে সে সেনাপতি ও তার সঙ্গী রক্ষীদের উড়িয়ে দিল আকাশে। তারা গিয়ে পড়লো নগরের শেষে এক পাহাড়ের উপর।

ব্যাপার দেখে রাজার মুখে আর রা সরলো না,কোন মতে বললেন —যাক গে, ওদেরকে যেতে দায়—

ছয় সঙ্গী রাজার সম্পদ নিয়ে ঘরে ফিরে গেল। সব টাকা-পয়সা সোনা-রূপা ভাগ করে নিলে। তাদের আর কোন দুঃখ কষ্ট রইল না।

আজব দেশের আজব কথা শুনবে কত আর,
ঘুমপাড়ানী গল্প যত অতি চমৎকার।

বোতলের দৈত্য

এক কাঠুরে দিন রাত পরিশ্রম করত। দিনে বনে কাঠ কাঠত, রাতে সেই কাঠ চেরাই করত, সকালে হাটে গিয়ে কাঠ বেচত। এই ভাবে খেটে সে কিছু পয়সা জমিয়েছিল। সেই পয়সা সে খরচ করল তার ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে।

কাঠুরের একটি মাত্র ছেলে। ভাল ছেলে। ইস্কুলে পড়াশুনা করল। কিন্তু পড়া শেষ করার আগেই তার বাবার টাকা ফুরিয়ে গেল। সে বাড়ী ফিরে এল। কাঠুরে বললে—দিন-কাল খারাপ পড়েছে, আগের মত আর রোজগার হয় না, যা পাই খেতে কুলায় না।

ছেলে বললে—আমিও তোমার সঙ্গে কাঠ কাটব।

কাঠুরে বললে—কাঠ কাটবি যদি, তাহলে লেখাপড়া শিখলি কেন?

ছেলে বললে—আগে পয়সা জোগাড় করি তারপর বাকি পড়াটা শেষ করব, তখন আর কাঠ কাটতে হবে না।

কাঠুরে বললে—তুই কাঠ কাটবি কি দিয়ে? আমার তো একখানা মাত্র কুড়ুল। আর একখানা কুড়ুল কিনব সে টাকাও নেই।

ছেলে বললে—পাড়া-পড়শীর কাছ থেকে একখানা কুড়ুল চেয়ে ন্যাও না।

কাঠুরে এক পড়শীর কাছ থেকে একখানা কুড়ুল চেয়ে আনলে। তারপর দু'জনে গেল বনে কাঠ কাটতে।

গাছ কাটতে কাটতে দুপুর হয়ে গেল, বাপ ও ছেলে সঙ্গে খাবার নিয়ে গিয়েছিল, দু'জনে খেতে বসল। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বাপ বসল তামাক খেতে, ছেলে বললে—আমি দেখি যদি পাখীর বাসায় দু-চারটে হাঁস-মুরগীর ডিম পাই।

ছেলেটি আশেপাশে ঝোপে-ঝাড়ে ঘুরতে লাগল।

সহসা একটা গাছের কাছে এসে শুনতে পেল: আমাকে বের করে দাও—আমাকে বের করে দাও—

ছেলেটি চারিপাশে তাকাল, কেউ তো কোথাও নেই। বললে—কে কথা বলছ?

—এই যে আমি গাছের নীচে, শিকড়ের ফাঁকে রয়েছি।

ছেলেটি এবার দেখতে পেল, গাছের শিকড়ের ফাঁকে এক গর্তের মধ্যে একটা বোতল, বোতলের মধ্যে কি একটা লাফাচ্ছে; সেখানে থেকেই আওয়াজটা আসছে: আমাকে বের করে দাও—

ছেলেটি বোতলেব ছিপি খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বোতলের ভিতর থেকে লাফিয়ে বেরুল সেই ছোট্ট জানোয়ারটা। দেখতে দেখতে জানোয়াবটা মস্ত বড় হয়ে গেল,—এক বিশাল দৈত্য। দৈত্য বললে—আমি কে জানিস?

ছেলেটি বললে—না,. কি কবে জানব?

—আমার নাম মারকুড়ি দৈত্য, আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে আমাকে মুক্তি দেবে, তারই আমি মাথা ভাঙবো। তোর আমি মাথা ভাঙবো।

ছেলেটি বলল—বাঃ, বেশ তো কথা। লোকের ভাল করলে, লোকে বুঝি তার মাথা ভাঙে।

—লোকের কথা বাদ দাও, আমি যা প্রতিজ্ঞা করেছি, আমি তা করব।

—তুমি কি বলতে চাও, তুমি ওই বোতলের ভিতর ছিলে?

—হ্যাঁ, তাই ছিলাম।

—তুমি যা বোঝাবে, ভাবছ আমি তাই বুঝব? তোমার অত বড়

দেহ এইটুকু বোতলের মধ্যে ছিল? তোমার একথা আমি বিশ্বাস করি না। আমার মাথা ভাঙতে চাও, ভাঙো। কিন্তু মিছে কথা বলো না।

—আমি মিছে কথা বলি না।

—বেশ, দেখাও যে তুমি এই বোতলের মধ্যে ছিলে?

দৈত্য তখনই ছোট্ট মানুষ হয়ে সেই বোতলের মধ্যে ঢুকে গেল। ছেলেটিও তৎক্ষণাৎ বোতলের মুখে ছিপি লাগিয়ে দিল। বললে—যেমন ছিলে তেমনি থাক।



দৈত্য বললে—না না, তুই আমায় ছেড়ে দে।

—ছেড়ে দিই, আর তুমি আমার মাথা ভাঙো।

—না না, আর তোর মাথা ভাঙবো না, তোকে বড়লোক করে দেব।

—তোমার কথায় বিশ্বাস কি?

—আমি তিন সত্যি করছি,—তোর আমি ভাল করব—ভালো করব—ভালো করব।

—বেশ, তোমার কথায় বিশ্বাস করে তোমাকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি—ছেলেটি বোতলের ছিপি আবার খুলে দিলে। ভুস্‌ করে আবার দৈত্য বেরুল—বিশাল বিরাট।

দৈত্য বললে—এই একটুকরো ন্যাকড়া তোকে দিচ্ছি, এই ন্যাকড়াখানা তুই যে কোন কাটা ঘায়ের উপর বুলিয়ে দিলে সেই ঘা তখনই শুকিয়ে যাবে। আর এই ন্যাকড়া কোন লোহার উপর ঘষলে সেই লোহা রূপো হয়ে যাবে।

ছেলেটি বললে—বেশ পরখ্‌ করে দেখি—

ছেলেটি কুড়ুল দিয়ে গাছের গায় একটা কোপ মারল, তারপর ন্যাকড়ার টুকরোখানা বুলিয়ে দিল তার উপর, দেখতে দেখতে কাটা

গাছের ক্ষত শুকিয়ে জোড়া লেগে গেল। ছেলেটি কখন দৈত্যকে বললে—তোমার কথা সত্যি, তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ।

দৈত্য চলে গেল। ছেলেটি ফিরে এল বাপের কাছে।

কাঠুরে বললে—কোথায় ঘুরতে গিয়েছিলি, এখন যে অনেক কাঠ কাটতে বাকি।

—কিছু না, আমি এখনি সব কেটে দিচ্ছি—বলে ছেলেটি কুড়ুলের এক কোপ মারল একটা গুঁড়ির উপর। এতক্ষণ কুড়ুলের গায় সে ন্যাকড়াখানা ঘষছিল, কুড়ুলখানা তখন রূপা হয়ে গেছে। রূপার কুড়ুলে কাঠ কাটল না, কুড়ুল বেঁকে গেল। কাঠুরে বললে—সর্বনাশ, চেয়ে আনা কুড়ুলখানা তুই বেঁকিয়ে ফেললি? এর তো এখন দাম দিতে হবে?

—দাম আমি দিয়ে দেব? তুমি ভেবো না।

—তুই টাকা পাবি কোথায়? টাকা তো আমায় দিতে হবে।

বাপ ছেলে কাঠ নিয়ে বাড়ী ফিরল। বাপ বলল—এই বাঁকা কুড়ুলখানা বেচে আয়। তার উপর আর যা দিতে হয় দিয়ে নতুন কুড়ুল কিনতে হবে।

ছেলে কুড়ুল নিয়ে গেল স্যাকরার দোকানে। স্যাকরা বললে—এতো খাঁটি রূপো, এর দাম চারশো টাকা। কিন্তু অত টাকা তো আমার নেই। আমার কাছে তিনশো টাকা মাত্র আছে।

ছেলেটি বললে—যা আছে তাই দিন, বাকি একশো টাকা থাক্ পরে দেবেন।

তিনশো টাকা নিয়ে ছেলেটি বাড়ী ফিরল।

বাড়ী এসে ছেলেটি বললে—তোমার ওই কুড়ুলের দাম কত?

কাঠুরে বললে—এক টাকা ছ' আনা।

ছেলে বললে,—বেশ, তোমার পড়শীকে দ্বিগুণ দাম দিও, এই নাও দু'টাকা বারো আনা।

বাপ বললে—এতো টাকা তুই পেলি কোথায়?

—টাকা আমি পেয়েছি, টাকার জন্য তোমাকে আর খাটতে হবে

না, ভাবতে হবে না, এই নাও কুড়ুল বেচা তিনশো টাকা—বলে ছেলেটি বাপকে সব টাকা দিল।

কাঠুরে তো অবাক!

ছেলে তখন দৈত্যের কথা সব বলল।

তারপর ছেলেটি আবার ইস্কুলে ভর্তি হল। ইস্কুলেব পড়া শেষ করে গেল কলেজে। কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের যা-কিছু পড়াশুনা করার ছিল সে শেষ করলে। সে হল এক ডাক্তাব। দৈত্যেব ন্যাকড়াব জোরে সব রকম ঘা সে সাবাতো। বোগীর কাছ থেকে পয়সা পাবার তোয়াক্কা সে করত না। লোহা ঘষলেই তো সে রূপা পায়। দেখতে দেখতে সেবা ডাক্তার বলে তার জগৎজোড়া নাম হল।

দুঃখকে করতে হবে জয়—ভাগ্যকে ফেরাতে কর চেষ্টা,
ঠিক পথে চলতে যদি পার, জয়ী তুমি হবেই জেনো শেষটা।

তিন বোন

এক ছিল যাদুকর। সে ভিখারী সেজে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরত আর ছোট মেয়ে পেলেই চুরি করে আনত। তারপর সে মেয়েব যে কি হত কেউ জানত না।

একবাব সে ভিক্ষা করতে গেল এক বাড়ীতে। গৃহস্থের তিনটি ছোট ছোট মেয়ে ছিল। বড মেয়েটি এল ভিক্ষা দিতে। যাদুকব তার হাত চেপে ধরল। মেয়েটি কেমন যেন হয়ে গেল। মুখে আর কথা সরল না। যাদুকর তাকে ঝুলির ভিতর ভরে নিয়ে সেখান থেকে সরে পড়ল।



বনের মাঝে যাদুকরের বাড়ী। সেখানে এসে যাদুকর মেয়েটিকে

থলির ভিতর থেকে বের করল। বলল—আজ থেকে তুই আমার ঘরদোর সাফ করবি, রান্না-বান্না করবি। কিন্তু খবরদার দখিনের দিকে যে ঘরটা বন্ধ আছে, সে ঘর খুলিস্ নে, সে ঘরে ঢুকিস্ নে। আর এই ডিমটা রেখে দে তোর কাছে।

যাদুকর বেরিয়ে গেল। মেয়েটি ঘর ঝাট দিল, রান্না করল তারপর দেখতে গেল দখিনের ঘর। বন্ধ দরজা খুলে সে ঘরে ঢুকল। ঘরের মধ্যে এক প্রকাণ্ড গামলা-ভরা শুধু রক্ত। ভয়ে মেয়েটি কেঁপে উঠল। হাতে ছিল ডিমটা, পড়ে গেল সেই রক্তের মধ্যে। কোনমতে ডিমটাকে কুড়িয়ে নিয়ে সে ঘর থেকে পালিয়ে এল। তারপর ডিমটাকে ধুয়ে ফেলল, ঘষে ঘষে মুছল, কিন্তু সাদা ডিমের উপর থেকে রক্তের লাল দাগ গেল না।

বাড়ী ফিরেই যাদুকর ডিমটা দেখতে চাইল। ডিমের উপর রক্তের লাল দাগ দেখেই বললে—তুই আমার কথা শুনিসনি, তুই দখিনের ঘরে ঢুকেছিলি। তোর আমি ব্যবস্থা করছি।

মেয়েটিকে এক ঘরের মধ্যে আটকে দরজায় চাবি দিল।

পরদিন ভিখারী সেজে যাদুকর গেল আবার সেই গাঁয়ে। ভিক্ষা করতে গিয়ে মেজো বোনকে ধরে আনল। বড় বোনের মত মেজো বোনকেও বলল—খবরদার, দখিনের ঘরে যাবি নে। আর এই ডিমটা রাখ্ তোর কাছে।

মেজো বোনও এক সময় দখিনের ঘরে গিয়ে ঢুকল। লাল রক্ত দেখে ভয়ে তার হাত থেকেও ডিমটা পড়ে গেল। ধুয়ে মুছেও ডিমের লাল দাগ গেল না। যাদুকর বাড়ী ফিরে এসে ডিম দেখেই বললে—আমার কথা শুনিস নি, তোর ব্যবস্থা আমি করছি।

যাদুকর মেজো বোনকেও এক ঘরে আটকে রেখে দিলে।

আবার যাদুকর ভিখারী সেজে গেল সেই গাঁয়ে। ছোট বোনকে ধরে আনল। ছোট বোনকেও যাদুকর বলল—দখিনের ঘরে ঢুকিস নি, আর এই ডিমটা রেখে দে।

ছোট বোন ডিমটা সাবধানে এক জায়গায় রেখে দিল, তারপর

কাজকর্ম শেষ করে গেল দখিনের ঘরে। সেখানে সে রক্তের গামলা দেখে চমকে উঠল। ভয়ে ঘর থেকে পালিয়ে এল। দেখল এক ঘরে তার দুই বোনকে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। তাদেরকে কিছুই খেতে দেওয়া হয় নি। ছোট বোন তাদেরকে খাবার দিলে, জল দিলে। তারপর তারা যেমন ছিল তেমনি দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে এল।

যাদুকর এসে ডিম দেখতে চাইল। ডিমটি ছোট বোন ঘরে রেখে দিয়েছিল। ডিমে কোন দাগ না দেখে যাদুকর খুসি হয়ে বলল—তুই খুব ভাল মেয়ে, আমার কথা শুনেছিস। তোকে আমি বিয়ে করে এই বাড়ীর গিন্নী করব।

ছোট বোন বলল—আমার বিয়ে হবে, তাহলে আমার বাবা-মাকে নেমন্তন্ন করে এস।

যাদুকর বলল—বেশ, যাব নেমন্তন্ন করতে।

—শুধু হাতে গেলে হবে না, টাকা-পয়সা নিয়ে যাবে। বিয়ের অনেক জামা-কাপড় কিনতে হবে, আমার বাবা-মা গরীব, তাদের সেসব কেনার পয়সা নেই।

—বেশ, আমি এক থলি টাকা নিয়ে যাব। আমার ঘরে টাকা বোঝাই করা আছে, তুই একটা থলিতে ভরে দে।

মেয়েটি গেল থলি ভর্তি করতে। দুই বোনকে সে থলির মধ্যে ভরল, বলল—যাদুকর তোদেরকে পৌঁছে দেবে বাড়ীতে, সেখান থেকে লোকজন নিয়ে আসবি। থলির মধ্যে টুঁ শব্দটি করবি না।

থলির মুখে কিছু টাকা চাপা দিয়ে ছোট বোন যাদুকরকে ডাকল। যাদুকর সেই থলি পিঠে নিয়ে চলল গাঁয়ে। ছোট বোন বলল—তাড়াতাড়ি যাবে, পথে কোথাও দেরী করো না।

বোঝা বইতে বইতে যাদুকর ক্লান্ত হয়ে পড়ল। গায়ে ঘাম দেখা দিল। এক গাছতলায় সে বসল, বলল—এখানে একটু জিরিয়ে নিই।

সঙ্গে সঙ্গে থলির ভিতর থেকে এক বোন বলে উঠল—আমি জানালা দিয়ে দেখছি, তুমি বসেছ।

যাত্বকর ভাবল, ছোট বোন জানালা দিয়ে দেখছে, সে-ই কথা বলল। যাত্বকর আবার থলি পিঠে নিয়ে চলল।

খানিক দূর গিয়ে আবার ভাবল এবার একটু বসি। থলির ভিতর থেকে এক বোন বলল—আমি দেখছি, তুমি বসেছ।

বসা আর হল না, যাত্বকর চলল।

তিন কন্যার বাড়ী এসে যাত্বকর বাপ-মাকে টাকার থলি নামিয়ে দিলে, বিয়ের নেমন্তন্ন করে এল।

এদিকে ছোট বোন ঘরে বসে বসে একটা চালকুমড়োর গায় চোখ-মুখ আঁকল, তার মাথায় ফুলের মুকুট পরিয়ে বাড়ীর উপর তলার জানালায় বসিয়ে দিলে। তারপর গায়ে মাখল এক গা মধু। পালকের গদীটা ছিঁড়ে ফেলল। তার উপর গড়াগড়ি দিল। মাথা থেকে পা পর্যন্ত পালক জড়িয়ে গেল মধুতে। তাকে মনে হল যেন একটা মস্ত বড় পাখী। পাখী সেজে ছোট বোন সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ল।

বনের পথে যার সঙ্গে দেখা হল, সে-ই অবাক হল, বলল—তুমি কে গো?

—আমি পক্ষীরাজের লোক।

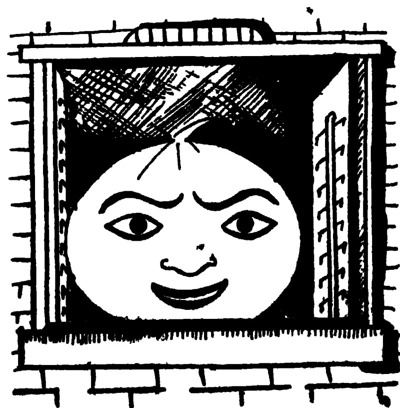
—কোথায় গিয়েছিলে?

—যাত্বকরের বাড়ী। তার যে আজ বিয়ে?

—কনে কে গো?

—গিয়ে দেখে এস না। ওই তো উপরের জানালায় দাঁড়িয়ে আছে।

তারা জানালার পানে তা কি য়ে চালকুমড়োটাকে দেখতে পেল।



যাত্বকর ধীরে সুস্থে ফিরছিল। বনের ধারে মেয়েটির সঙ্গে দেখা হল, যাত্বকর তাকে চিনতে পারল না, জিজ্ঞাসা করল—তুমি কে?

—আমি পক্ষীরাজের লোক।

যাদুকর ভাবল তাই হবে, গায়ে যখন এতো পালক।

মেয়েটি গাঁয়ে পৌঁছতেই অনেক লোকের সঙ্গে দেখা হল। তার বাপ দুই বোনের মুখ থেকে সব শুনে পাইক পেয়াদা লেঠেল নিয়ে চলেছিল যাদুকরের সন্ধানে।

যাদুকর সবে বাড়ী পৌঁছেছে এমন সময় গাঁয়ের লোকজন হৈ হৈ করে এসে পড়ল। যাদুকর ভয়ে বাড়ীর দরজা বন্ধ করে দিলে। গাঁয়ের লোকেরা বাড়ী ঘেরাও করে ফেলল। তারপর আগুন লাগিয়ে দিল বাড়ীতে। দুষ্ট যাদুকর পুড়ে মরে গেল।—

সঙ্কটে পড় যদি বিচলিত হবে না।
মনে জোর রাখ যদি, বিপদ তো রবে না॥

সাত ভাই হাঁদারাম

হাঁদারামেরা সাত ভাই। হাঁদারাম, জগারাম, বোকারাম, গোলারাম, ন্যাকারাম, হাঁকারাম ও ভেকারাম। সাত ভাই একসঙ্গে বেরুল দেশ বেড়াতে। পথে লড়াই কি মারামারি—একটা সাহসের কিছু কাজ তাদের করতে হবে। সেইজন্য মস্ত এক বল্লম তারা হাতে নিলে, এক বল্লম সাত ভাই ধরে পথে বেরুল। সবার আগে বড়ভাই হাঁদারাম আর সবার শেষে ছোট ভাই ভেকারাম।

গ্রীষ্মকাল। কিছুদূর গিয়েই তারা ঘেমে উঠল। এক গাঁয়ে পৌঁছে এক গাছতলায় তারা বসে পড়ল। সেই গাছে ছিল ভীমরুলের বাসা। কাছে মানুষ আসতেই ভীমরুলেরা গুন্-গুন্ করে উঠল। হাঁদারাম লাফিয়ে উঠল,—ওই শোন ঢাক বাজছে।

জগারাম বলল—ঠিক কথা, আমি গুলি-বারুদের গন্ধ পাচ্ছি।

বোকারাম এক লাফে এক পাশে সরে গেল, পা পড়লো গোবরের উপর, সঙ্গে সঙ্গে এক আছাড়, বোকারাম চীৎকার করে উঠল—আমি এবার গেছি। আমাকে মেরো না, আমাকে বন্দী কর।

বাকি ছ'ভাই তখন সাড়া তুলল—মেরো না, মেরো না, বন্দী কর।

তারপর যখন তারা দেখল কেউ কোথাও নেই, তখন তারা শান্ত হল, বলল—তাইতো, আমরা কি বোকা! এসব শুনলে তো লোকে হাসবে, কাউকে এসব কথা আমরা বলব না।

তারপর আবার সাতভাই চলতে শুরু করল।

দিন সাতেক চলার পর এক মাঠের মাঝে তারা গাছতলায় শুয়ে আছে। শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। চোখ মেলেই তারা দেখে সামনেই ঘাসের ফাঁকে দুটো চোখ। হাঁদারাম ফিসফিস করে বললে—ওই চোখ দুটো কার?

জগারাম বললে—নিশ্চয় কোন ভয়ানক জানোয়ার।

বোকারাম বললে—বাগে পেলেই আমাদেরকে ছিঁড়ে খাবে।

গোলারাম বললে—আমরা সাত ভাই লড়ে যাব।

হ্যাকারাম বললে—মারামারি করার সময় যে আগে এগোবে তারই জিত্।

হাঁদারাম বললে—চল, আমরা এগোই।

ভেকারাম বল্লম হাতে তুলে নিলে।

সাত ভাই একসঙ্গে লাফিয়ে উঠল, চীৎকার করে উঠল—সামনেওয়ালা হুঁশিয়ার!

চোখ দুটো খরগোসের। খরগোসটা এক লাফে তৎক্ষণাৎ দৌড় দিল। হাঁদারাম তাই দেখে বলে উঠল—

সামান্য এক খরগোস দিয়েছিল ধোঁকা,
আমরা সাতটি ভাই অতিশয় বোকা!

সাত ভাই আবার পথ চলতে শুরু করল।

ক'দিন পরে তারা এল এক নদীর ধারে। নদী পার হবার মতো কোন পুল তাদের নজরে পড়ল না। নদীতে কোন নৌকাও নেই। ওপারে একটা লোক স্নান করছিল, হাঁদারাম হাঁক দিল—ও মশাই, এই নদী পার হব কেমন করে?

ওপারের লোকটি আনমনা ছিল, বললে—হেঁকে বল—

হাঁদারাম শুনল—হেঁটে চল—

হাঁদারাম জলে নেমে পড়ল। দেখতে দেখতে এক বুক জল। হাঁদারাম সাঁতার জানে না। আর সামলাতে পারল না, জলের টানে ডুবে গেল। হাঁদারামের টুপিটা ভাসতে ভাসতে গেল ওপারে। ছ'ভাই ভাবল, তাহলে তো দাদা ওপারে পোঁছে গেল। তারাও পর পর জলে নেমে হাঁটতে সুরু করল। দেখতে দেখতে তারাও বুকজলে গিয়ে স্রোতের টানে ডুবে গেল।

হাঁদারামের দেশভ্রমণ এইখানেই শেষ হল।—

এই দুনিয়া বুদ্ধিহীন লোকের জন্য নয়।
বোকা মানুষ পদে পদে বিপদগ্রস্ত হয়॥

বুড়োআংলার চাকরি করা

বুড়োআংলা একদিন তার বাবাকে বলল—আমি তোমার সঙ্গে ক্ষেতে যাব।

চাষী বলল—তুই মাঠে গিয়ে কি করবি? কোথায় ঘাসের মধ্যে ঝোপেঝাড়ে হারিয়ে যাবি।

কিন্তু বুড়োআংলা কোন কথাই শুনল না। চাষী তখন তাকে জামার পকেটে ভরে নিলে। তারপর মাঠে গিয়ে ছেলেকে বসিয়ে দিলে এক আঁটি ঘাসের উপর।

সেই সময় সামনে পাহাড়ের উপর থেকে এক দৈত্যকে নেমে আসতে দেখা গেল। চাষী বললে—ওই দেখ্ দৈত্য আসছে, তোকে ধরবে।

কথাটা দৈত্য শুনতে পেয়েছিল। বরাবর এসে বুড়োআংলাকে তুলে নিয়ে চলে গেল। চাষী হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল, কোন কথা বলতে সাহস পেলে না।

দৈত্য বুড়োআংলাকে নিয়ে গেল নিজের বাড়ীতে। যত কিছু

ভাল ভাল খাবার তাকে খাওয়াল। বুড়ো আঙুলের মত বুড়োআংলা দেখতে দেখতে বড়ো হতে লাগল।

দু'বছরের মধ্যে বুড়োআংলা হল এক বিরাট জোয়ান পুরুষ। দৈত্য তখন তাকে জঙ্গলে নিয়ে গেল, বলল—দেখি কেমন জোর হল, একটা গাছ উপড়ে তোল।

জোয়ান বুড়োআংলা অনেক টানাটানি করেও গাছ ওপড়াতে পারল না। দৈত্য আবার তাকে ঘরে নিয়ে এল।

দু'বছর পরে বুড়োআংলা আরও জোয়ান হল। দৈত্য তাকে নিয়ে গেল জঙ্গলে। বুড়োআংলা এবার অতি সহজেই একটা গাছ উপড়ে ফেলল। দৈত্য বলল—আমাকে একটা লাঠি বানিয়ে দে।

জোয়ান বুড়োআংলা একটা তালগাছ উপড়ে ফেলে দৈত্যের হাতে দিলে।

দৈত্য এবার বুড়োআংলাকে সঙ্গে নিয়ে এল সেই মাঠে। বলল—এবার তোর বাপ-মায়ের কাছে ফিরে যা।

চাষী ক্ষেতে লাঙল ঠেলছিল। জোয়ান বুড়োআংলা তার কাছে গিয়ে বলল—বাবা আমি ফিরে এসেছি।

চাষী চমকে উঠল, বলল—তুমি কে?

—আমি বুড়োআংলা—আপনার ছেলে।

—না, না, তুমি আমার ছেলে নও, তোমাকে আমি চিনি না।

—আমি সত্যি আপনার ছেলে বুড়োআংলা। আপনি আমাকে লাঙল দিন, আমি এখনি সারা মাঠ চষে দিই।

বুড়োআংলা বাপের হাত থেকে লাঙল টেনে নিয়ে মাঠ চষতে লেগে গেল। বলল—বাবা, তুমি যাও, মাকে গিয়ে বলগে, বড় হাঁড়িতে এক হাঁড়ি ভাত আমার জন্য রেঁধে রাখতে।

চাষী বাড়ী চলে গেল।

যে মাঠ চষতে চাষীর দু'দিন লাগে, এক বেলাতেই বুড়োআংলার সেই মাঠ চষা হয়ে গেল। তারপর জঙ্গল থেকে দুটো গাছ উপড়ে নিয়ে সে বাড়ী ফিরল। বলল—মা, তোমার জ্বালানি কাঠ এনে দিলাম।

মা তো ছেলেকে চিনতে পারল না, বলল—এত বড় জোয়ান মর্দ তো আমার ছেলে নয়। সে তো এতটুকু বুড়োআংলা।

চাষী বলল—এই সে-ই।

চাষী-বৌ বলল—না, না, এ সে নয়।

বুড়োআংলা কোন কথা বলল না, রান্নাঘরের সামনে আসন পেতে বসল, বলল—মা, আমার ভাত দাও, খিদে পেয়েছে।

চাষী-বৌ কলাপাতায় এক হাঁড়ি ভাত ঢেলে দিলে। সে ভাত দু'জন মানুষের আট দিনের খোরাক। বুড়োআংলা দেখতে দেখতে সেই ভাত শেষ করল, তারপর বলল—আর ভাত আছে?

চাষী-বৌ বলল—না।

বুড়োআংলা বলল—আমি বসছি, আরেক হাঁড়ি ফুটিয়ে দাও।

মা আরেক হাঁড়ি ভাত ফুটিয়ে দিলে।

বুড়োআংলা সেই ভাত শেষ করে বলল—যাক্, তবু আধ-পেটা খাওয়া হল।

হাত মুখ ধুয়ে বুড়োআংলা বাপ-মায়ের মুখের পানে তাকিয়ে বলল—আমি বুঝতে পারছি তোমরা আমার খাওয়া দেখে ঘাবড়ে গেছ। এভাবে তোমরা আমাকে খাওয়াতে পারবে না। আমার নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। আমাকে খাওয়াতে গেলে শেষে তোমাদেরই একদিন অভাব দেখা দেবে।

বুড়োআংলা বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল কাজের সন্ধানে।

ঘুরতে ঘুরতে সে এল এক গাঁয়ে। যার সঙ্গে দেখা হয় তাকেই বলে—চাকর রাখবে গো?

কিন্তু অমন জোয়ান চেহারা দেখে কেউ আর তাকে কাজ দিতে সাহস পায় না। শেষে এক কামার ভাবল এই জোয়ান লোককে দিয়ে বেশী কাজ পাওয়া যাবে, শুধু হাতুড়ি পিটবে কামারশালায়, বলল—কাজ তো দোব, তা মাইনে কত?

—টাকা পয়সা চাই না। শুধু দু'সপ্তাহ কাজ করার পর আমি তোমার দুই কাঁধে একটা ঝাঁকানি দেব।

কামার দেখল এ ত ভাল কথা। এক পয়সা খরচা নেই। বলল—বেশ, কাজে লেগে যাও।

একটা জ্বলন্ত লোহা কামার ধরল নেহাইয়ের উপর, বলল—হাতুড়ি মারো।

বুড়োআংলা এক ঘা হাতুড়ি বসাল। সঙ্গে সঙ্গে লোহাশুদ্ধ নেহাই বসে গেল মাটির মধ্যে। সে নেহাই কামার আর তুলতে পারে না। বলল—তোমাকে দিয়ে আমার কাজ চলবে না, তুমি যাও।

বুড়োআংলা বলল—আমার মজুরী দাও।

—কিসের মজুরী?

—এই যে হাতুড়ি মারলাম।

—তুমি তো আমার ক্ষতি করলে, এর জন্য আবার মজুরী কিসের?

—মজুরী নেই?

—না। যাও।

বুড়োআংলা কামারকে মারল এক লাথি, কামার গিয়ে পড়ল উঠানে খড়ের গাদার উপর। বুড়োআংলা কামারশালা থেকে একটা ছ'ফুট লোহার ডাণ্ডা তুলে নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ল।

বুড়োআংলা এল এক মহাজনের বাড়ীতে, বলল—কাজ দেবে?

মহাজনের লোকের দরকার ছিল, বলল—লেগে যাও। ক্ষেতে ফসল কাটা হচ্ছে, গাড়ী নিয়ে যাও, ফসল তুলে আনো।

বুড়োআংলা গাড়ী নিয়ে বেরুল।

রাতে ঝড় হয়ে গেছে। একটা প্রকাণ্ড গাছ ঝড়ে পড়ে গিয়ে ছিল। পথ জুড়ে গাছ, যাবার পথ নেই। বুড়োআংলা অতি সহজে গাছটাকে ধরে সরিয়ে দিলে। তারপর গাড়ীতে ফসল তুলে ঘরে ফিরল। এক হাতে গাছটাকে ধরে নিয়ে এল বাড়ীতে, বলল—এই নাও, তোমাদের জ্বালানী কাঠ হবে।

মহাজন তো ভারী খুসি। বলল—তুমি খুব কাজের ছেলে, থাকো আমার কাছে।

বুড়োআংলা সেইখানে রয়ে গেল এক বছর বছর শেষে বলল—এবার বাড়ী যাব, মাইনে দাও।

মহাজন বলল—মাইনের কোন কথা ত তখন বলনি। এখন কত দিতে হবে বল?

—আমি টাকাপয়সা চাই না, আমি চাই আর কিছু।

—কি বল?

—আমি তোমার দুই গালে দুই থাপ্পড মারতে চাই।

—এটা কি কাজের কথা হল?

—এই রকমই আমাব মাইনে। তোমাব দুই গালে দুই থাপ্পড় মেবে আমি চলে যাব।

—তোমার মত জোয়ানের থাপ্পড খেলে আমি কি আর বাঁচব? তুমি অন্য কিছু বল?

—না। তুমি মহাজন, গবীবেব উপর বেজায় জুলুম কব। তোমার কাছে আমার এই মাইনে। আর কিছু আমি চাই না।

মহাজন থ' হয়ে গেল। ভয় হল। এত বড় জোয়ানকে তো কায়দা করা যাবে না। একটু ভাববার সময় চাই। বলল—আচ্ছা, কাল তোমার মাইনে নিও।

আপনাব জনের সঙ্গে পরামর্শ করে মহাজন ফন্দি বেব কবল। পরদিন বুড়োআংলা আসতেই বলল—তুমি আগে স্নান সেরে এসো—

বুড়োআংলা পুকুরে গিয়ে যেই ডুব দিয়েছে। মহাজনেব লোক তৈরী ছিল, যাঁতার প্রকাণ্ড একখানি পাথর তার মাথার উপর ফেলে দিলে—ব্যাটা জলে ডুবে পাথর চাপা মরুক।

কিন্তু জল থেকে বুড়োআংলা মাথা তুলল। যাঁতার পাথরখানা তার গলায় আটকেছে, বলল—দেখেছ, আমার গলায় নতুন হাঁসুলী!

পাথরখানা নামিয়ে রেখে স্নান সেরে বুড়োআংলা ফিরল। মহাজন বলল—এখন একটা শেষ কাজ করে দাও। আট বস্তা গম আছে, বেছে দাও।

বুড়োআংলা আট বস্তা গমের বালি কাঁকর ময়লা বাছতে বসল।

বাছতে বাছতে সন্ধ্যা হয়ে এল। কাজ শেষ করে বলল—আর কিছু করতে হবে ?

—আরেক কাজ আছে, বড় কঠিন কাজ।

—কি শুনি ?

—আমার বাগানের যাঁতা-ঘরে ভূতের বাসা হয়েছে। সন্ধ্যার পর কোন লোক সে-ঘরে থাকতে পারে না। তুমি আজ রাতটা সেই ঘরে বসে এই গম যাঁতায় ভেঙে ময়দা করে দাও।

বুড়োআংলা আট বস্তা গম নিয়ে যাঁতা-ঘরে চলে গেল। লণ্ঠন জ্বেলে বসে গেল গম পিষতে।

রাত দুপুর হবার আগেই গম পেষাই শেষ। বুড়োআংলার তখন খুব খিদে পেয়েছে। বস্তা বোঝাই মুড়ি এনেছিল খাবে বলে, এবার সে মুড়ি খেতে বসল।

খাওয়া শেষ করতে রাত দুপুর হল। ঠিক সেই সময় আলোটা নিভে গেল। অন্ধকারে কে যেন বুড়োআংলার দুই কান মলে দিল। বুড়োআংলা বলল—ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

তখনই আবার কানমলা।

—বটে! বুড়োআংলা চারিপাশে চড়-চাপড় চালাতে সুরু করল। ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, পিছনে।

এক মিনিটও হাত পা ছোঁড়ার কামাই নেই।

রাত দুপুর থেকে ভোর অবধি চলল হাত পা ছোঁড়া।

ভোরবেলা মহাজন খবর নিতে এল। যাঁতা-ঘর থেকে ময়দার বস্তা নিয়ে বেরিয়ে এল বুড়োআংলা। বলল—ভূত আমার কান মলে দিয়েছিল বটে কিন্তু সারারাত আমার হাতে মার খেয়েছে। আর বোধ হয় তারা এ মুখো হবে না।

মহাজন বলল—আশ্চর্য তোমার সাহস, আশ্চর্য তোমার শক্তি!

বুড়োআংলা বলল—ও কথা থাক্, আর আমার কাজ নেই। মাইনে চুকিয়ে দাও, বাড়ী যাই।

—কত টাকা চাও ?

—টাকা নয়, তুই থাপ্পড়।

—আমি তোমার থাপ্পড় খেলে মরে যাব।

—যাবে। তুমি মরলে গরীব চাষীরা বাঁচবে।

—বুড়ো মানুষকে দয়া কর। টাকা পয়সা নাও।

—তুমি গরীবকে দয়া কর না। আমি তোমাকে দয়া করব কেন?

বুড়োআংলা তখনই মহাজনের গালে মারল এক থাপ্পড়। মহাজন ছিটকে পড়ল বাগানের পাঁচিলের বাইরে। মহাজনের গিন্নী তেড়ে এল, বলল—হতভাগা, তুই কি শেষে কর্তাকে খুন করবি?



—তুমিও তো কর্তাকে পরামর্শ দাও জুলুম করতে, তুমিও যাও কর্তার সঙ্গে—বলে বুড়োআংলা গিন্নীর গালে এক চড় মারল। গিন্নী গিয়ে পড়ল পাঁচিলের মাথায়।

কর্তা বলল—আমার কাছে নেমে এস।

গিন্নী বলল—আমার হাড়গোড় ভেঙে গেছে, নামতে পারছি না। তুমি উঠে এস।

কর্তা বলল—আমার হাড়গোড় ভেঙে গেছে, উঠতে পারছি না।

একজন পাঁচিলের নীচে, একজন পাঁচিলের উপরে পড়ে রইল। আজ অবধি তারা সেইভাবেই পড়ে আছে।

বুড়োআংলা হাসতে হাসতে বেরিয়ে পড়ল পথে।—

বুড়োআংলা জোয়ান হল, ছোট্টটি আর নেই,
জুলুমবাজে ঠাণ্ডা করল একটি থাপ্পড়েই।

এক ছিল চাষী। একখানা কুঁড়েঘর ছাড়া তার আর কিছুই ছিল না। পরের জমিতে মজুর খেটে তার দিন চলত।

চাষীর এক মেয়ে ছিল। সে বলত—বাবা, তুমি রাজার কাছে গিয়ে একটু জমি চেয়ে নাও গে।

চাষী রাজার কাছে গেল। রাজা তার কথা শুনে তাকে এক টুকরো জমি দিলেন।

চাষী জমিতে লাঙল দিচ্ছে, এমন সময় লাঙলের ফলায় ঠং করে কি বাধল। চাষী দেখলে একটা সোনার খল। খলটা নিয়ে চাষী বলল—রাজার জমি, রাজা চাষ করতে দিয়েছেন, এর মধ্যে সোনা-দানা যা পাওয়া যাবে, তা রাজার পাওনা। খলটা রাজাকে দিয়ে আসি।

মেয়েটি বললে—আগে খলের ডাঁটিটা খুঁজে বের কর, তারপর খল ও ডাঁটি এক সঙ্গে দিয়ে এসো।

চাষী সে কথা শুনল না, খলটি নিয়ে রাজার সভায় গেল। রাজা বললেন—খল পেয়েছ, এর ডাঁটি কোথায়?

—ডাঁটি পাইনি হুজুর।

রাজা বললেন—এর ডাঁটি আমার চাই। ডাঁটি খুঁজে বের কর গে, নাহলে তোমাকে জেলে দোব।

চাষী কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরল—হায় হায়, যদি আমি মেয়ের কথাটা শুনতাম!

রাজার লোক সেই কথা শুনে রাজাকে খবর দিলে। রাজা চাষীকে ডেকে পাঠালেন, বললেন—তোমার মেয়ে কি বলেছিল?

চাষী বললে—মেয়ে বলেছিল 'ডাঁটিটা আগে খুঁজে বের কর, তারপর রাজার কাছে যেও।'

রাজা বললেন—তোমার মেয়ে তো খুব বুদ্ধিমতী, তাকে নিয়ে এসো।

চাষী মেয়েকে নিয়ে গেল রাজার সভায়। রাজা বললেন—তোমাকে একটা ধাঁধা বলব, তার যদি সঠিক জবাব দিতে পার, তোমাকে আমি রাণী করব।

মেয়েটি বললে—বলুন।

রাজা বললেন—গায়ে বস্ত্র নেই তবু সে ল্যাংটা নয়, পথ দিয়ে যায় কিন্তু হেঁটেও না, কিছুতে চড়েও না, পথে পা ফেলে না,—সে কি?

মেয়েটি বললে—আমাকে একদিন সময় দিন, রাজামশাই।

সময় নিয়ে মেয়েটি বাড়ী চলে এল।

পরদিন মেয়েটি একটা মাছধরা জাল জোগাড় করল। কোন জামা-কাপড় না পরে মাছধরা জালটি জড়াল সারা গায়। জামা-কাপড় নেই, তবু সে ল্যাংটা নয়। তারপর একটা গাধা এনে তার লেজের সঙ্গে নিজেকে বাঁধল, গাধা চলল পথ দিয়ে। সে যাচ্ছে, হাঁটছে না, চড়ছে না, পথে পা পড়ছে না। এইভাবে সে এল রাজার সভায়, বলল—রাজামশাই, এই আপনার ধাঁধার জবাব।

রাজা মেয়ের বুদ্ধি দেখে খুসি হলেন, তাকে বিয়ে করে রাণী করলেন।

দিন যায়।

হাটে যাচ্ছিল হাটুরের দল, ঘোড়া গরু বেচতে। একদলের সঙ্গে ছিল ঘোড়া, আরেক দলের সঙ্গে ছিল গরু। ঘোড়ার দলের এক বাচ্চা ঘোড়া গরুর পালের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। গরুর মালিকেরা বললে—এটা আমাদের।

তারা বাচ্চা ঘোড়াটা ফেরত দিলে না। ঘোড়ার মালিকেরা নালিশ করলে রাজার কাছে। রাজা বললেন—গরুর পালের মধ্যে যখন ঘোড়ার বাচ্চাটা আছে তখন সেটা গরুর মালিকদেরই।

ঘোড়ার মালিকেরা তখন গেল রাণীর কাছে, বলল—রাণীমা, এ কেমন বিচার হল?

রাণী বললেন—রাজার বিচার, আমি কি বলব?

তারা বললে—আপনি তো খুব বুদ্ধিমতী বলে শুনেছি, আপনি একটা কিছু ব্যবস্থা করুন, নাহলে আমাদের লোকসান হবে।

রাণী বললেন—ব্যবস্থা করবে তোমরা, আমি শুধু বুদ্ধি বলে দেব।

রাণী বুদ্ধি বাত্‌লে দিলেন।

পরদিন সকালে বেড়াতে বেরিয়ে রাজা দেখলেন একটা লোক পথের থারে মাঠের উপর মাছধরা জাল ফেলছে আর গুটাচ্ছে। রাজা বললেন—তুমি কি করছ?

—আমি মাছ ধরছি।

—শুকনো ডাঙায় মাছ ধরছ?

—গরুর বাচ্চা যদি ঘোড়া হয়, তাহলে শুকনো ডাঙ্গায় মাছ হবে না কেন হুজুর?

রাজা চমকে উঠলেন। তারপর লোকটিকে ডেকে বললেন—তোমায় এই বুদ্ধি কে দিয়েছে?

লোকটি বললে—তা আমি বলতে পারব না।

রাজা বললেন—বলতেই হবে।

শেষ অবধি চাবুক খাবার ভয়ে লোকটি মুখ খুলল। বললে—রাণীমা বুদ্ধি দিয়েছেন।

রাজা বাড়ী ফিরলেন। রাণীকে ডেকে বললেন—তুমি আমার বিচারের গলদ ধরছ, প্রজাদের কাছে আমার মান যাচ্ছে। তোমাকে আর রাণী করে রাখব না। তুমি তোমার বাপের বাড়ী চলে যাও!

রাণী বললে—বেশ, তাই আমি যাব।

রাজা বললেন—টাকা-পয়সা গহনা কিছুই নিয়ে যেতে পাবে না।

রাণী বললে—একটা জিনিষও না?

রাজা বললেন—বেশ, তোমার পছন্দ মত একটা মাত্র জিনিষ সঙ্গে নিতে পারবে।

রাণী বললে—বেশ, কাল সকালেই আমি চলে যাব।

সেই রাতে খাবার সময় রাণী রাজার সরবতে সিদ্ধি মিশিয়ে দিলেন। রাজা খুব ঘুমুলেন। সকালেও ঘুম ভাঙল না। ঘুমন্ত রাজাকে পাল্‌কিতে তুলে নিয়ে রাণী রওনা হলেন বাপের বাড়ীর পথে।

রাজার ঘুম ভাঙল দুপুর বেলা। রাজা চোখ মেলেই তো অবাক, বললেন—আমি কোথায়?

রাণী বললে—আমার বাপেব বাড়ীতে।

—এখানে কেন?

—আপনার হুকুমে আমি চলে এসেছি। আমাব পছন্দ মত জিনিষ সঙ্গে নিয়ে এসেছি। আপনাকেই আমাব সবচেয়ে বেশী পছন্দ, তাই আপনাকে এনেছি।

বাজা হাসলেন, বললেন—তোমাব কাঁছে আমি আবাব হেরে গেলাম। এখন বাজবাড়ী চল।—

চাষীর মেয়ে বাণী হল এমন বুদ্ধি তাব,
বাজা মশাই হারল তাব কাছে বাব বাব॥

শিয়ালের গল্প

এক ছিল খেঁকশিয়াল। তার ছিল ন'টা লেজ। একদিন সে ভাবল, দেখি না আমি মারা গেলে কি হয়। যেমন ভাবা তেমন কাজ। ঘরের মধ্যে সে মড়ার মতো পড়ে রইল।

এক সময় শিয়াল-বৌ ঘরে এসে দেখে শিয়াল মরে গেছে। তখনই নিজের ঘরে গিয়ে সে দরজায় খিল দিলে।

তাদের ঘরের কাজ করত এক বিড়াল, সে রান্নাঘরে রাঁধতে বসল।

এদিকে খবর ছড়িয়ে পড়ল যে বুড়ো শিয়াল মরে গেছে। আবেক শিয়াল তখনই ছুটে এল, দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল—

পুসি বিড়াল পুসি বিড়াল, কি খবর তোমার আজ—
ঘুমের ঘোরে ঢুলছ বুঝি, নাকি করছ ঘরের কাজ?

বিড়াল গিয়ে দরজা খুলে দিলে, বললে—

না-না ওগো শিয়াল মশাই, ঘুমাই নাকো দিন-দুপুরে
সরেস ঘোলের তাড়ি বানাই বসে বসে অন্তঃপুরে
চেখে যদি দেখতে চান আসুন ভিতরে—

শিয়াল বললে—শিয়াল গিন্নী কেমন আছে, খাবার কথা পরে।

বিড়াল বললে—গিন্নী-ঠাকরুণ বসে আছেন দোতলার ঘরে,
কর্তামশাই মারা গেছেন, চোখের জল ঝরে—
কেঁদে কেঁদে গিন্নী-মায়ের দু'চোখ হ'ল লাল
কর্তাবাবু মারা গেলেন, পড়ল দুঃখের কাল।

শিয়াল বললে—তুমি তার কাছে যাও, গিয়ে বলগে—আমি এসেছি তাকে বিয়ে করতে।

বিড়াল গেল উপরতলায়—টুক টুক টুক—
দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিল—ঠুক ঠুক ঠুক—
—ঠাকরুণ ঘরে আছেন কি?—পুসি ডেকে বলে।
—আছি, কি চাই তোর? যা তুই চলে।
—শিয়াল বর এসেছে আপনাকে করতে বিয়ে।

শিয়াল-বৌ বললে—তাকে দেখতে কেমন, দেখে আয় গিয়ে।
লম্বা-চওড়া কেমন? নয়টা লেজ আছে?
লেজ কম হলে আসবে না আমার কাছে।

বিড়াল বললে—লেজ তার একটা।

শিয়াল-বৌ বললে—সে এখান থেকে বিদায় হোক।

বিড়াল নীচে এল, শিয়ালকে বিদায় দিলে।

আবার একজন এসে দরজায় ধাক্কা দিলে। সে আর এক শিয়াল। তার লেজ দুটো। বিড়াল তাকেও বিদায় করল।

তারপর এল তিন লেজের শিয়াল। তারপর একে একে চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট লেজের শিয়াল। সবাই বিদায় হল।

শেষে এল নয় লেজওলা শিয়াল।

এবার শিয়াল-বৌ বললে—
পুসি পুসি দরজা খোল, খুলে দে জানালা।
বুড়ো কর্তা মরে গেছে, সে ছিল এক জ্বালা।
জানালা দিয়ে মড়া ফেলে দে, পথে পড়ে রবে।
খবর দে সব পাড়াপড়শীকে বিয়ের ভোজ হবে।

বাড়ীতে ভোজের জোগাড় হল। সবাই এল। ঠিক সেই সময় বুড়ো শিয়াল লাফিয়ে উঠে, এক লাঠি নিয়ে সবাইকে পিটিয়ে বাড়ী থেকে দূর করে দিলে। শিয়াল-বৌকেও মেরে তাড়াল।

কিছুদিন পরে বুড়ো শিয়াল সত্যি মারা গেল। সেই খবর পেয়েই এল এক নেকড়ে বাঘ, দরজায় ধাক্কা দিয়ে বললে—

নমস্কার মেনি বিড়াল, তোমার গোঁপ জোড়াটি বেশ।
রান্না ঘরে একেলা বসে রাঁধছ তুমি কি?
ভুর ভুর ভুর গন্ধ পাচ্ছি, খাবার সরেশ—
অনেক কাল ভাল খাবার চেখে দেখিনি।

বিড়াল জবাব দিলে—দুধ ফোটাই খাবো রুটি দিয়ে
গন্ধ তার নেইক কোন কিছু,
খেতে চাও তো বসো টেবিল নিয়ে,
একটি গেলাস সরবৎ খেও পিছু।

নেকড়ে বললে—শিয়াল-গিন্নী বাড়ী আছে?

বিড়াল বললে—গিন্নী ঠাকরুণ বসে আছেন একা
মনের দুঃখে কেঁদে কেঁদেই সারা
এবার সত্যি দুঃখের সংবাদ
কর্তাবাবু সত্যি গেছেন মারা।

নেকড়ে বললে—আহা মেনি, দুঃখের কথা সত্যি
সন্দেহ নেই তাতে একরত্তি।
বল দেখি একটু ভেবে নিয়ে
শিয়াল-গিন্নী করবে কি ফের বিয়ে?
আমি তবে আসবো কি বর সেজে
সারা গা আসবো কি ঘষে-মেজে?

বিড়াল বললে—সে কথা আমি বলি কেমন করে?
জিজ্ঞেস করে বলতে পারি পরে।
তুমি খানিক বস এই ঘরে।

বিড়াল তখন বসতে দিল চেয়ার, ছুটে গেল উপরের ঘরে।

গিন্নী বললে—নীচে এল কে, শুনছি গলা খানিকক্ষণ ধরে?

—এসেছে সেই নেকড়ে বাঘ দেখতে চমৎকার
কর্তাবাবু মারা গেছে, শুনেছে খবর তার
জানতে চায় আপনি কি বিয়ে করবেন আবার?

শিয়াল-গিন্নী বললে—নেকড়ের পায়ের থাবা কি লাল? নাক কি ছুঁচালো?

বিড়াল বললে—না।

শিয়ালগিন্নী বললে—তাকে আমি বিয়ে করব না।

বিড়াল এসে নেকড়কে বিদায় দিলে।

তারপর এল এক কুকুর। সে বিদায় হল।

এল এক ছাগল, সে বিদায় হল।

এল এক ভালুক, সে বিদায় হল।

এল এক সিংহ, সে বিদায় হল।

একে একে এল অনেক বনের পশু, শিয়াল-গিন্নীর পছন্দ হল না কাউকে।

শেষে এল এক শিয়াল। শিয়ালগিন্নী জিজ্ঞেস করল—তার চার পায়ের থাবা কি লাল? নাক কি ছুঁচালো?

বিড়াল বললে—হ্যাঁ।

শিয়ালগিন্নী তখন বললে—

তবে পুসি ঘর সাজা, ফরাস মেলে দে—
জানালা দিয়ে মড়াটাকে পথে ফেলে দে—
মহাপাজী বুড়ো কর্তা মরেছে, গেছে জ্বালা,
মনের মত বরের গলায় দেব ফুলের মালা।

শিয়ালের বাড়ীতে এবার বিয়ের ধুম লেগে গেল।

শিয়াল-বাড়ী সানাই উঠল বেজে,
পাড়াপড়শী এল কত সেজে,
নাচ হল, গান হল, হল খাওয়া-দাওয়া,
সোরগোলে ভুলল সবাই বাড়ী ফিরে যাওয়া,
সেই বনের যেথায় ছিল যতেক জানোয়ার
শিয়াল-বাড়ী করে তুলল ফুর্তিতে তোলপাড়!

অতি আস্ফালন

এক বনে এক শিয়াল ছিল। এক নেকড়ে বাঘের সঙ্গে ছিল তার বন্ধুত্ব। শিয়াল গাঁয়ে ঢুকে গেরস্তের বাড়ী থেকে মুরগী চুরি করত আর নেকড়ের কাছে এসে সেই গল্প বলত। শিয়াল বলত—মানুষ ভারী বুদ্ধিমান, কোন জানোয়ার তার সঙ্গে পেরে উঠবে না। তার সামনে পড়লে আর রক্ষে নেই, পালিয়ে বাঁচতে হবে।

নেকড়ে বললে—তোমরা বড্ড ভীরু তাই পালাও, আমি পালাব না, মুখোমুখি লড়ে যাব।

পরদিন নেকড়েকে সঙ্গে নিয়ে শিয়াল বেরুল গ্রামের পথে। কিছুদূর গিয়েই তারা দেখল এক বুড়োকে। নেকড়ে বললে—এই কি মানুষ?

শিয়াল বললে—না, এ আগে মানুষ ছিল।

আরো কিছুটা গিয়ে তারা দেখল একটি ছেলেকে। ছেলেটি ইস্কুলে যাচ্ছিল, নেকড়ে বললে—এই কি মানুষ?

শিয়াল বললে—না, এ পরে মানুষ হবে।

আরো কিছুটা গিয়ে তারা দেখল একটি লোক যাচ্ছে, পিঠে তার বন্দুক ঝুলছে। শিয়াল বলল—এই পুরো মানুষ। তুমি এর সঙ্গে মুখোমুখি লড়ে যাও। তার আগে আমি একটু তফাতে সরে যাই।

শিয়াল দূরে পালিয়ে গেল। নেকড়ে লাফিয়ে পড়ল মানুষটির সামনে। লোকটি বন্দুক বাগিয়ে ধরে তখনই গুলী চালাল। গুলী লাগল নেকড়ের মাথায়। নেকড়ে গ্রাহ্য করল না, তেড়ে গেল মানুষটির দিকে। মানুষটি আরেক গুলী করল নেকড়েকে। নেকড়ে এবার লাফিয়ে পড়ল মানুষটির ঘাড়ের উপর। লোকটির কোমরে ছিল ছুরি, টেনে নিয়ে বসিয়ে দিল নেকড়ের গলায়। নেকড়ে এবার ঘুরে পড়ল পথের উপর।

লোকটি চলে গেল। শিয়াল এসে বলল—বন্ধু, দেখলে তো মানুষ কেমন!

নেকড়ে বলল—হাতাহাতি লড়াই তো হল না। মানুষ একটা লাঠি বের করে দু'বার কি যেন ছুঁড়ে মারলে, তারপর কোমর থেকে একখানা চকচকে হাড় বের করে সেইটা দিয়ে মারলে। হাতাহাতি লড়াই হলে বুঝিয়ে দিতাম।

শিয়াল বলল—মানুষকে কেউ হাতের কাছে পায় নি বন্ধু, ওইটাই মানুষের বুদ্ধির জোর, বৃথাই তোমার আস্ফালন। তোমার বুদ্ধি কম বলেই মরতে এলে।—

জানে না ক' কোন কিছু শুধুই বাক্‌চাতুরি,
কাজের সময় থাকে না আর কোন জারিজুরি।

শিয়াল ও বিড়াল

এক ছিল বিড়াল। একদা বনের মাঝে শিয়ালের সঙ্গে তার দেখা হল। শিয়াল সবার চেয়ে চতুর, তাই বিড়াল শিয়ালকে খাতির করে বললে—নমস্কার শিয়াল মশাই, আপনার সব খবর ভাল ত? আজকের এই অভাবের দিনে আপনি ভাল খাবার-দাবার পাচ্ছেন তো?

শিয়াল বিড়ালের মুখের পানে একবার ভাল করে তাকাল। তারপর ভারিক্কী চালে বললে—তুমি বাড়ীর পোষা বিড়াল ত, তুমি বনজঙ্গলের কথা কি বুঝবে? আমাদের খাবার কষ্ট নেই, শত রকমের ফন্দী-ফিকির আমরা জানি। তোমাদের অত ফন্দী-ফিকির জানা নেই।

বিড়াল বললে—সে কথা সত্যি। আমি শুধু একটা ফন্দীই জানি।

—কি?

—কুকুরে তাড়া করলেই গাছে উঠে পড়ি।

—ওই আত্মরক্ষার একটা ফন্দীই তোমরা জানো, আমরা জানি শত ফিকির। তোমাদের বুদ্ধি কম বলেই তোমরা এত কষ্ট পাও।

তারপর দু'জনে বনের পথে চলল।

সেদিকে এক শিকারী এসেছিল শিকার করতে। চারটি শিকারী কুকুর ছিল সঙ্গে। শিয়ালকে দেখেই কুকুর চারটি লাফিয়ে উঠল, তেড়ে এল।

বিড়াল তো এক লাফে উঠে পড়ল এক গাছে। একেবারে মগ ডালে গিয়ে বসল।

কুকুরগুলো এসে তখন শিয়ালটাকে ধরেছে।

বিড়াল বললে—কি গো শিয়ালমশাই, এবার তোমার ফন্দী-ফিকির দেখাও। তোমার তো একশো ফন্দী আছে।

কিন্তু কুকুর তখন শিয়ালের টুঁটি কামড়ে ধরেছে।

বিড়াল বললে—একশো কায়দার চেয়ে একটা কায়দা ভাল করে জানা থাকলে তোমাকে আর মরতে হতো না শিয়ালমশাই, আমার মত বাঁচতে পারতে।—

বোকা লোকে নিজেদের ভাবে বুদ্ধিমান।
অহংকারে ডুবে যায় ধন প্রাণ মান॥

মায়াজাল

এক ছিল গরীব গৃহস্থ। গৃহস্থের পয়সা নেই, দিন চলে না। গৃহস্থের একটিমাত্র ছেলে, গৃহস্থ ভাবল ছেলেটিকে এমন বিদ্যা শেখাতে হবে যাতে সে রীতিমত পয়সা রোজগার করতে পারে।

গৃহস্থ গেল এক পণ্ডিতের কাছে, বললে—কি বিদ্যা শিখালে আমার ছেলে বড়লোক হতে পারবে?

পণ্ডিত বলল—তাকে মায়াজাল শেখাও।

গৃহস্থ তখন ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বেরুল গুরু খুঁজতে। পথে ঘাটে বুড়ো-বুড়ী দেখলেই জিজ্ঞাসা করে—এখানে কেউ মায়াজাল শেখায় বলে জানেন?

অনেক ঘুরতে ঘুরতে, অনেক জিজ্ঞাসা করতে করতে শেষে এক বুড়ী বললে—আমার ছেলে মায়াজাল জানে।

গৃহস্থ বুড়ীর ছেলেকে ধরল—আমার ছেলেকে মানুষ করে দাও।

মায়াজালী বলল—বেশ, তোমার ছেলেকে আমি সবকিছু শিখিয়ে-পড়িয়ে তৈরী করে দেব। বারো বছর পরে তুমি এসো। তবে এজন্য তখন তোমাকে দু'শো টাকা প্রণামী দিতে হবে।

ছেলেটিকে মায়াজালীর কাছে রেখে গৃহস্থ ফিরল।

দেখতে দেখতে বারো বছর কেটে গেল। গৃহস্থ চলল মায়াজালীর বাড়ী থেকে ছেলেকে আনতে। কিন্তু টাকার যোগাড় তো হয়নি। দু'শো টাকা প্রণামী দেবার কথা আছে, তার কি করবে?

গৃহস্থ চলেছে। পথে এক বামনের সঙ্গে দেখা। বামন বলল—কি গো কর্তা, মুখখানা এতো শুকনো কেন?

গৃহস্থ বলল তার দুঃখের কথা, শেষে বললে—টাকার তো জোগাড় নেই, কি হবে তাই ভাবছি।

বামন বলল—টাকা না পেলে মায়াজালী তো তোমার ছেলেকে ছাড়বে না, মায়াজালে ছেলেকে লুকিয়ে রাখবে, তুমি খুঁজে পাবে না।

—তাহলে কি করব?

—তুমি একটা কাজ কর। একখানা রুটি নিয়ে যাও। রুটিখানা মায়াজালীর বাড়ীর সামনে বটগাছের নীচে রেখে দিও, যে পাখীটা বসে বসে রুটি খাবে, জানবে সেইটিই তোমার ছেলে। মায়াজালে পাখী হয়েছে।

বামন রুটি দিলে। গৃহস্থ রুটি নিয়ে চলল। রুটিখানা ফেলে রাখল মায়াজালীর বাড়ীর সামনে বটগাছ-তলায়। তারপর মায়াজালীকে ডেকে বলল—আমার ছেলেটার জন্য এসেছি।

মায়াজালী বলল—টাকা এনেছ? দু'শো টাকা?

—না। টাকার জোগাড় করতে পারিনি। ছেলে রোজগার করলে পরে আপনাকে টাকা দিয়ে যাব।

—টাকা নেই তো ছেলেও নেই।

—এ কি একটা কথা হল ?

—বেশ তো, ছেলেকে যদি এখানে খুঁজে পাও তো নিয়ে যাও। আমার ঘর-দোর দেখ, চারিপাশে খোঁজ।

গৃহস্থ তো বামনের কাছে সব শুনে গেছে। সে পিছু ফিরে দেখল বটগাছের তলে একটা শালিক বসে রুটিখানা খাচ্ছে। সে এগিয়ে গিয়ে শালিকটাকে ধরল, বলল—এই আমার ছেলে।

মায়াজালী বলল—বুঝেছি, সেই বামন ব্যাটা আমার চিরকালের শত্রু, সে-ই বলে দিয়েছে। তা ছেলেকে যখন পেয়েছ নিয়ে যাও।

শালিক তখনই ছেলের রূপ ধরল। ছেলের হাত ধরে বাপ চলল বাড়ীমুখো। পথে যেতে যেতে ছেলে বলল—পথেই কিছু রোজগার করে নিই বাবা। ওই যে লোকটা আসছে ও জমিদাব, ওব ভারী কুকুরের সখ। আমি একটা কুকুর হই, তুমি ওব কাছে আমাকে বিক্রী করে দাও।

ছেলেটি তখনই মায়াজালে একটা কুকুব হল। ভাল বিলিতি গ্রে-হাউণ্ড। জমিদার কাছে আসতেই গৃহস্থ বলল—বাবুমশাই, একটা ভাল কুকুর কিনবেন ?

—এই কুকুরটা ? তা এর জন্য কত দাম চাও ?

—তিরিশ টাকা।

—বড্ড বেশী চাইছ বাপু, তবে কুকুরটার এই সোনালী রংটা আমার খুব ভাল লাগছে, আমি তোমার কুকুরটা নেবো।

জমিদার তখনই ত্রিশ টাকা দিয়ে কুকুরটা কিনে নিলে।

তারপর জমিদারবাবু যখন বাড়ী গিয়ে পৌঁছাল, কুকুর গলার দড়ি ছিঁড়ে দৌড় দিল। জমিদার আর তাকে ধরতে পারল না।

ছেলে এসে ধরল বাপকে। গৃহস্থ তখন হাটের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। ছেলে বললে—আমি একটা ঘোড়া হই, তুমি আমাকে হাটে বেচে দাও।

ছেলেটি এক তেজী ঘোড়ার রূপ ধরল। গৃহস্থ তখন তাকে নিয়ে গেল হাটের মাঝে। দেখতে দেখতে ঘোড়াটি একশো টাকায় বিক্রী

হয়ে গেল। বাপ টাকা নিয়ে চলে গেল। এই পথটুকুর মধ্যেই তার একশো ত্রিশ টাকা রোজগার হল।

এবার কিন্তু ঘোড়াটি কিনেছিল সেই মায়াজালী গুরু। গৃহস্থ গুরু প্রণামী দেয়নি, তাকে জব্দ করার জন্যই সে ঘোড়াটি কিনেছিল। নিজের চেহারা মায়াজালে বদলে ফেলেছিল, গৃহস্থও চেনেনি, তার ছেলেও চিনতে পারেনি।

মায়াজালী ঘোড়াটিকে এনে আস্তাবলে বেঁধে রাখল।

সন্ধ্যাবেলা ঘোড়া দড়ি ছিঁড়ে দৌড় দিল।

মায়াজালীও তখনই ঘোড়া হয়ে ছুটল তার পিছনে।

বনের ধারে এসে ছেলেটি ঘোড়ার রূপ ছেড়ে এক চড়ুই পাখী হয়ে গেল। মায়াজালী গুরুও এক কাক হয়ে তাব পিছনে তাড়া করল।

বনেব শেষে তারা এসে পড়ল। কাক তখনও চড়ুইটাকে ধরতে পারেনি। এবার পালানোর বাধা হবার জন্য মায়াজালী কাকের রূপ ছেড়ে এক নদী হয়ে গেল, চড়ুই নদী পার হতে পারবে না। কিন্তু ছেলেটি তখনই চড়ুইয়েব রূপ ছেড়ে এক মাছ হয়ে নদী পার হয়ে গেল।

মাছটাকে ধরে খাবার জন্য মায়াজালী গুরু তখনই এক সারস হল, নদীও সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে গেল। মাছও তখনই শিয়াল হয়ে সারসের ঘাড় মটকাল।

আর ভয় রইল না।

এবার শিয়ালের রূপ ছেড়ে ছেলেটি চলল নিজের বাড়ীতে বাপের কাছে।—

হোক্ না গুরু শ্রদ্ধাভাজন, অনাচারী হলে
শ্রদ্ধা তাকে করবে না আর গুরুজন বলে।

রাজপুত্র ফিরে এল

এক ছিল রাণী। রাণীর ছেলেমেয়ে ছিল না। রাণী ব্রত করলেন ছেলের জন্য। দেবতা প্রসন্ন হয়ে স্বপ্নে বললেন—তোর এক ছেলে হবে, তার আশ্চর্য ক্ষমতা থাকবে, সে যা চাইবে তাই হবে।

রাণী বাজাকে সেই কথা বললেন, রাজা বললেন পাত্র-মিত্র সভাসদকে।

কিছুদিন পরেই রাণীব এক ছেলে হল।

একদিন ছেলেকে নিয়ে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে রাণী এক জায়গায় বসে ঘুমিয়ে পড়লেন। রাজবাড়ীর বাবুর্চির নজর ছিল ছেলেটির উপর। সে একটা মুরগী মেরে রক্ত ছিটিয়ে দিলে রাণীর গায় আর রাজপুত্রকে রেখে এল এক জায়গায়। তারপর বাজাকে গিয়ে খবর দিলে, রাণীর কোল থেকে কোনো বুনো জানোয়ার রাজপুত্রকে টেনে নিয়ে গেছে।

রাজা রাণীর পোষাকে রক্ত দেখে সেই কথা বিশ্বাস করলেন। বড় রাগ হল। রাণীকে তিনি পাঠিয়ে দিলেন জেলখানায়। জেলখানার ঘরে দিনে রাতে আলো যায় না, হাওয়া ঢোকে না।

দিন যায়। রাজপুত্র একটু বড় হল। এখন সে কথা বলতে পারে। বাবুর্চি এবার সেখানে গিয়ে বলল—খোকা, তুমি বলত 'আমি একটা বাড়ী চাই, একটা বাগান চাই, লোকজন দাসদাসী চাই।'

ছেলেটি যেই সে কথা বলল—অমনি সেখানে বাড়ী ও বাগান হয়ে গেল। বাবুর্চি বলল—এবার বল, 'আমার একজন খেলার সাথী চাই।'

ছেলেটি যেই সে কথা বলল, অমনি একটি ছোট্ট মেয়ে এসে দাঁড়াল তার পাশে।

দু'জনে খেলাধুলা করে, দিন যায়।

রাজপুত্র বড় হল। বাবুর্চি ভাবল এবার যদি রাজপুত্র তার

বাপ-মাকে দেখতে চায়, তাহলেই তো মুস্কিল বেধে যাবে—সে ধরা পড়ে যাবে। সে একদিন রাজপুত্রের সঙ্গিনীকে ডেকে বলল—রাজপুত্রকে খুন করতে হবে, তোমাকে আমি ছোরা এনে দোব, সেই ছোরা রাজপুত্রের বুকে বসিয়ে দেবে যখন সে ঘুমুবে।

সঙ্গিনী বলল—কেন? সে তো কারও কোন অনিষ্ট করেনি?

বাবুর্চি বলল—না হলে তুমি নিজে মারা পড়বে।

—আমি মরব কেন?

—আমার হুকুম না শুনলে আমি তোমাকে খুন করব।

সঙ্গিনী রাজপুত্রকে সব কথা বলল। তারপর বাবুর্চি ছোরা এনে দিলে সঙ্গিনীর হাতে। রাজপুত্র তখন খাটের উপর শুয়ে ছিল। বাবুর্চি বলল—বসিয়ে দাও বুকে।

রাজপুত্র জেগে ছিল। ধড়মড় করে উঠে বসল, বললে—তুই আমাকে খুন করতে চাস? তুই একটা কুকুর হ'।

বাবুর্চি তখনই কুকুর হয়ে গেল।

রাজপুত্র বলল—এবার আমি রাজার কাছে যাব, তুমি চল আমার সঙ্গে।

সঙ্গিনী বলল—অচেনা অজানা জায়গায় গিয়ে আমি থাকতে পারব না।

—কিন্তু তোমাকে তো আমি এখানে একা রেখে যাব না। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব—বলে রাজপুত্র তাকে একটা গোলাপ ফুল করে ফেলল। জামায় সেই ফুল গুঁজে রাজপুত্র রওনা হল রাজবাড়ীর দিকে।

রাজা তো ছেলেকে চেনে না। রাজপুত্র রাজসভায় এসে বলল—আমি শিকারী, চাকরি দিন।

রাজা বললেন—আমি হরিণের মাংস খেতে ভালবাসি, তুমি আমাকে প্রতিদিন হরিণের মাংস জোগাবে।

রাজপুত্র তো যা চাইবে তাই পাবে। দু'শো হরিণ সে ধরে আনল রাজবাড়ীতে। রাজা তো ভারী খুসি। পাত্রমিত্র সভাসদকে মাংস খাবার নিমন্ত্রণ করে বসলেন। রাজপুত্রকে বললেন—শিকারী, তুমিও এসো—

সন্ধ্যাবেলায় ভোজসভা বসল। রাজা বললেন—তুমি খুব ভালো শিকারী, তুমি আমার পাশে বসো।

শিকারী রাজার পাশে বসল। খেতে খেতে সে ইচ্ছা করল রাণীর কথাটা কেউ রাজার কাছে তুলুক। যেই ভাবা অমনি সেনাপতি বলে উঠল—মহারাজ, আমরা তো দিব্যি খাওয়া-দাওয়া করছি কিন্তু রাণীমা কেমন আছেন?

রাজা বললেন—জান তো রাজপুত্রকে জানোয়ারে ধরে নিয়ে যাবার পরে আমি তাকে কারাগারে রেখেছি।

রাজপুত্র সেই সময় বলল—মহারাজ, আমি সেই রাজপুত্র। আমাকে চুরি করেছিল আপনার বাবুর্চি।

রাজপুত্র তখনই কুকুরটাকে সেখানে আনিয়ে তাকে আবার মানুষ করে দিলে। রাজা সব শুনে বেজায় রেগে গেলেন, বললেন—এই লোকটা এমন শয়তান, একে অন্ধকার কারাগারে নিয়ে যাও।

রাজপুত্র বলল—আমি খুন হয়ে যেতাম কিন্তু একটি মেয়ে আমাকে রক্ষা করেছে। তাকে দেখবেন?

রাজপুত্র জামা থেকে গোলাপ ফুলটি হাতে নিয়ে তাকে আবার মানুষ করে দিলে। রাজা তো কন্যাকে দেখে অবাক হলেন।

এবার রাজার লোক গেল জেলখানা থেকে রাণীকে আনতে। রাণী এলেন। এতদিন কারাগারে থেকে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। রাণী বললেন—ভগবানের অশেষ দয়া যে আবার আমি ছেলেকে ফিরে পেলাম।

তিনদিন পরে রাণী মারা গেলেন।

রাজাও তারপর বেশীদিন বাঁচলেন না।

রাজপুত্র রাজা হলেন, সঙ্গিনীকে রাণী করলেন। এখনও তারা সেই রাজ্য শাসন করছে।—

লোভের বশে মানুষ করে যতেক অন্যায়।
পরিণামে ধরা পড়লেই করে—হায়, হায়॥

এক ছিল তাঁতী

এক ছিল তাঁতী। সারাদিন সে তাঁত বুনত। কিন্তু তাতেও তার দিন চলত না। দু'বেলা ছেলে-মেয়েদের পেট ভ'রে খাওয়া চলত না। বড় কষ্টেই তাদের দিন কাটত।

তাঁতীর তিনটি ছেলে, তিনটি মেয়ে। মেয়েরা বাড়ীতে সুতো কাটত, সুতোয় মাড় দিত, সুতো রং করত, তাঁতী সেই সুতোয় তাঁত বুনত। আর ছেলেরা বনে গিয়ে কাঠকুটো, শাক-পাতা, লাউ-কুমড়ো আনত। কিন্তু নিজেদের মধ্যে কেউ কখনো ঝগড়া করত না। সবাই মিলেমিশে থাকত। তাঁতীর বাড়ীতে কখনো ঝগডা মারামারি হত না।

পূজা এসে গেল। গাঁয়ের সব ছেলেমেয়ে নতুন জামা-কাপড় পরছে, কিন্তু তাঁতীর এমন পয়সা নেই যে নিজের ছেলেমেয়েদের কিছু কিনে দেয়। পূজার সময় লোকে কত কি খায়। কিন্তু তাঁতীর এমন পয়সা নেই যে দুটো আলু-বেগুন কেনে। তাঁতী নিজের অভাবের মধ্যে মাথা নীচু করে ভাবে। ছেলেমেয়েরা জানে বাপের অবস্থা, তাই বাবার কাছ থেকে তারা কোন-কিছুই চায় না।

পূজার আর দশদিন বাকি। এক সদাগর এল, বলল,—দশদিনে দশখানা কাপড় বুনে দাও। পঞ্চাশ টাকা মজুরী দেব।

পূজার মুখে পঞ্চাশ টাকা মজুরী যেন ভগবানের আশীর্বাদ! তাঁতী দিনরাত তাঁত বুনতে লেগে যায়। দশ দিনে দশখানা কাপড় বুনে সে পোঁটলা বাঁধে, তারপর পোঁটলা নিয়ে চলে সদাগরের বাড়ী।

সদাগর সহরে থাকে। গাঁ পার হয়ে ধানক্ষেত। ক্ষেত পার হয়ে বন। বন পার হয়ে সহর। সহরে সদাগরের কাপড়ের দোকান। সেই দোকানে পৌঁছাতে তাঁতীর বেলা দুপুর হয়ে যায়। দোকানে সদাগর নেই, আছে সরকার। সরকার বলল—সদাগর আজ সকালেই সহরের বাইরে গেছেন, দু'দিন পরে ফিরবেন।

তাঁতী বলল—আমায় যে কাপড় বুনতে দিয়ে গিয়েছিলেন, তার কি হবে?

সরকার বলল—সে কথা বলে গেছেন। 'তুমি কাপড় রেখে যাও, তিনদিন পরে এসে দাম নিয়ে যেঁও।

তাঁতী বলল—আজ কিছু টাকা পেলে ভাল হতো। পূজোর দিন বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের দু-একটা জিনিষ কিনে দিতাম।

সরকার বলল—কর্তামশাই কোন টাকা দিয়ে যান নি। আমি কোথা থেকে দেব। যা পাবার দু'দিন পরে পাবে।

তাঁতী আর কি বলবে, দোকানে কাপড় জমা দেওয়ার রসিদখানা হাতে নিয়ে সে ফিরল। দশদিন দিনরাত কাজ করেও সে পূজার সময় ছেলেমেয়েদের মুখে একটু হাসি ফোটাতে পারল না। এমনি তার অদৃষ্ট!

সারাদিন খাওয়া-দাওয়া নেই, ক্লান্ত পদে তাঁতী পথ চলছে। পথেই দুপুর কাটল, বিকাল কাটল, দিনের আলো ফুরিয়ে গেল, ঘনিয়ে এল সন্ধ্যার অন্ধকার। তাঁতী বন পার হয়ে ক্ষেতের ধারে এসে পৌঁছাল। ক্ষেত পার হয়ে তার গ্রাম। গ্রামের শেষে তার ঘর।

ক্ষেতের ধারে একটা মস্ত নিমগাছ। সেই নিমগাছের নীচে ঝাঁক ঝাঁক জোনাকি জ্বলছে। একসঙ্গে এত জোনাকি জ্বলতে তাঁতী কখনও দেখেনি। ঠাহর করে দেখে সেই জোনাকির মাঝে দাঁড়িয়ে আছে ছোট একটি মানুষ, মাত্র হাতখানেক উঁচু। তাঁতীকে দেখেই সে বললে—নমস্কার, তোমার জন্যই দাঁড়িয়ে আছি।

তাঁতী তো অবাক। বলল—আমার জন্য?

—হ্যাঁ, তোমার জন্য। তুমি সারাদিন কিছু খাও নি, তোমার খাবার নিয়ে বসে আছি। এই নাও—

এক ধামা মুড়ি, গুড়পাটালি, নাড়ু সে এগিয়ে দিল, তাঁতীর সামনে। এক ঘটি জল দিল, বলল—খাও।

তাঁতী বলল—এসব বরং বাড়ী নিয়ে যাই, আমার ছেলে-মেয়েরা কি খাবে ঠিক নেই, এই মুড়ি সবাই মিলে খাব।

—এগুলো তুমি খাও, তাদের জন্য আমি খাবার দেব।

—আরো দেবে ?

—হ্যাঁ। তুমি ও তোমার ছেলেমেয়েরা বড় ভালমানুষ, কখনো ঝগড়া মারামারি করে না, খেতে না পেলেও রাগ করে না! পুজোর দিনে তোমাদের খাইয়ে খুসি করব, এই আমার ইচ্ছে।

—তুমি কে ?

—আমি ? আমার নাম সুবন্ধু। আর কথা নয়, রাত হয়ে যাচ্ছে তুমি খেয়ে নাও।

তাঁতী মুড়ি, পাটালী, নাড়ু খেল। জল পান করল।

সুবন্ধু বলল—এবার তোমার কাপড়-বাঁধা চাদরখানা দাও, ছেলেমেয়েদের খাবার বেঁধে দিই।

সুবন্ধু গাছের আড়াল থেকে পোঁটলায় খাবার বেঁধে নিয়ে এল, বলল—যা তোমরা খাবে খেও, আর বাকিটা যারা খেতে পায় না তাদের দিও। নমস্কার!

সুবন্ধু গাছের পিছনে চলে গেল। জোনাকির আলোও নিভে গেল। তাঁতী পোঁটলা নিয়ে তার বাড়ী চলল।

ক্ষেত পার হয়ে গাঁয়ে ঢোকার মুখে পোঁটলাটা বড্ড বেশী ভারী বলে মন হল। তাঁতী পোঁটলা কাঁধে তুললে। গাঁয়ের মাঝামাঝি এসে পোঁটলাটা আরো ভারী মনে হল। সামনেই ধোপার ঘর, তাঁতী তার একটা গাধা চেয়ে নিয়ে পোঁটলাটা গাধার পিঠে চাপাল। তারপর তাঁতী চলল ঘরে।

ছেলেমেয়েরা ছুটে এল—বাবা কি এনেছ ?

তাঁতী পোঁটলা খুলল। পোঁটলার মধ্যে মুড়ি, পাটালী, নাড়ু নেই। মুড়ি হয়ে গেছে টাকা, পাটালী আর নাড়ু হয়েছে মুক্তা। তাঁতী তো অবাক!

এবার তাঁতী সুবন্ধুর কথা বলল সবাইকে।

তাঁতী তখনই বেরুল টাকা ভাঙ্গিয়ে খাবার কিনতে। আর গাঁয়ের যত গরীব ছেলেমেয়েকে ডেকে আনলে খাওয়াবে বলে।

সেদিন রাতে তাঁতীর বাড়ীতে ভোজ লেগে গেল।

সেই ভোজ চলল পূজার চারদিন।

তারপরেও চলল খাওয়ানোর ব্যাপার। সুবন্ধু বলে দিয়েছিল—'তোমরা যা পার খেও, আর বাকি দিও গরীব ছেলেমেয়েদেরকে।' তাঁতী সে কথা ভোলে নি। গাঁয়ের গরীবদের অভাব হলেই তাঁতী তাদেরকে টাকা দিত। সবাই তাঁতীর সুনাম করতে লাগল।

এদিকে তাঁতী নিজের তাঁতও চালাতে লাগল। একখানার জায়গায় বিশখানা তাঁত হল। তার বোনা কাপড় সারা সহরে চলতে লাগল। সামান্য তাঁতী হল বড় কারবারী।

তারপর অনেক দিন অনেকবার সন্ধ্যাবেলা নিমগাছের তলে তাঁতী সুবন্ধুর খোঁজ করেছে, কিন্তু আর তার দেখা পায় নি।

একদিকে দান আর একদিকে ব্যবসা। দু-এতেই সুনাম। যারা ভাল হয়, এইভাবেই তাদের ভাল হয়।—

ভাল লোকের ভাল হবেই হবে।
দুঃখ কারও চিরদিন না রবে॥

যে কথা শোনে না

একটি ছোট মেয়ে ছিল। সে কারও কথা শুনত না। মা-বাবা যা বলত কিছুই কানে তুলত না।

একদিন সে বাপ-মাকে বলল—তোমরা সবাই ডাইনী-ডাইনী বল, আমি একদিন ডাইনীকে দেখতে যাব। লোকে বলে সে বুড়ী থুরথুরী, তার ঘরে অনেক আশ্চর্য জিনিস আছে, আমি গিয়ে সব দেখব।

মা বললেন—কখনও সেখানে যাস নি, ডাইনী বুড়ী বড় দুষ্ট, সে লোকের অনিষ্ট করে। তুই গেলে আর ফিরতে পারবি না।

মেয়েটি মায়ের কথা শুনলে না, একদিন চলে গেল ডাইনীর বাড়ী।

পাহাড়ের মাথায় জঙ্গলের মধ্যে ডাইনী বুড়ী থাকত। মেয়েটিকে দেখে সে জিজ্ঞাসা করল—তোর মুখখানা অমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে কেন?

মেয়েটি বললে,—এই সব দেখে আমার ভয় করছে।

ডাইনী বললে,—কি দেখেছিস্?

—সিঁড়ির মুখে মিশকালো একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে।

—সে কয়লাখনি থেকে এসেছে।

—মাঝ সিঁড়িতে একজন পাট্‌কিলে রঙের মানুষ দেখলাম।

—সে একজন শিকারী।

—সিঁড়ির শেষে দেখলাম একজন লাল রঙের মানুষকে।

—সে একজন কসাই।

—সবচেয়ে ভয়ানক জিনিস দেখলাম তোমার জানালায় উঁকি মেরে। দেখলাম, তুমি নেই, একটা ভয়ানক জানোয়ার বসে আছে।

—তুই ডাইনী বুড়ীকে ঠিক দেখেছিস। যাক গে, তোর জন্যে আমি বসে আছি, তুই এবার আমায় আলো দে।

এই বলে ডাইনী বুড়ী মেয়েটির গায় হাত দিতেই সে একখানা কাঠ হয়ে গেল। কাঠখানা বুড়ী আগুনে ফেলে দিলে, আগুনটা জোরালো হয়ে জ্বলে উঠল। সেই আগুনে হাত-পা গরম করতে করতে বুড়ী বললে,—এতক্ষণে একটু জোরালো আগুন হল।—

বাপমায়ের কথা যেবা অবহেলা করে,
যেথা সেথা নানাভাবে বিপদে সে পড়ে।

এক চাষীর গল্প

এক ছিল চাষী। সকালে দুটি বলদ নিয়ে সে মাঠে গিয়েছিল লাঙল দিতে। লাঙল দিতে দিতে যত বেলা বাড়ে, তার বলদ দুটোর শিং ততো বাড়ে। সন্ধ্যা বেলা বলদ জোড়ার শিং এতো বড় হল যে, সে বলদ নিয়ে আর গোয়াল-ঘরে ঢোকার উপায় নেই। তখন শিং নিয়ে যারা ব্যবসা করে তাদের কাছে চাষী বলদ দু'টি বেচে দিল। ব্যবসায়ী অনেক টাকা দিল, সেই টাকা দিয়ে চাষী কিনে আনল এক থলি গম। গম মাথায় করে আনার সময় চাষীর উঠানে একটা গম পড়ে গেল।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে চাষী দেখে উঠানে এক প্রকাণ্ড গম-গাছ গজিয়েছে। সেই গাছের মাথা গিয়ে উঠেছে একেবারে মেঘের দেশে। চাষী ভাবল—একবার মেঘের রাজ্যটা দেখে আসি। সে গাছে উঠল। উপরে উঠে দেখে মস্ত ক্ষেত। সেই ক্ষেতের ফসল কেটে অনেক চাষী ঝাড়াই করছে।

ঠিক সেই সময় গাছটা নড়ে উঠল। নীচে তাকিয়ে চাষী দেখে এক কাঠুরে গাছের গোড়ায় কুড়ুল দিয়ে কোপাচ্ছে। গোড়া কাটলেই তো গাছ এখনি পড়ে যাবে। পড়ে গেলেই হাড়গোর ভাঙবে। হাতের কাছে একখানা কাস্তে পড়েছিল, সেইটা তুলে নিয়ে চাষী গাছ থেকে নামতে শুরু করল।

চাষী নীচে নামার আগেই গাছ কাটা হয়ে গেল। গাছ পড়ে গেল। চাষী ছিট্‌কে পড়ল এক গর্তের মধ্যে। ভিজে নরম মাটিতে চাষীর কিছুই লাগল না। হাতে কাস্তেখানা ছিল, তাই দিয়ে মাটি কেটে কেটে চাষী সিঁড়ি বানাল। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল উপরে।

মেঘের দেশের সেই কাস্তেখানা চাষী পাড়া-পড়শীকে দেখাল। সেই চাষীর বাড়ী গেলে আজও তুমি সেই কাস্তেখানা দেখতে পাবে।—

মজার কথা আজব কথা গাঁয়ের মানুষ বলে,
সে সব কথা কোনোদিন সত্যি ভাবলে চলে?

তিন সঙ্গী

তিনজনে একসঙ্গে বেরিয়েছিল কাজকর্মের খোঁজে। যেখানে যে কাজ পায়, তিনজনে ভাগ করে করে। কিন্তু দিনে দিনে তিনজনের একসঙ্গে কাজ পাওয়া মুস্কিল হয়ে ওঠে। তখন তারা ঠিক করল, এবার আর তিনজনে একসঙ্গে থাকা চলবে না। একা একা কাজ খুঁজতে হবে। একটা সরাইখানা তারা ঠিক করল। কাজের ফাঁক পেলেই, এখানে তারা আসবে ও পরস্পরের খবর রাখবে।

এক পথের তেমাথায় এসে তিনজন তিন পথ ধরবে এমন সময় একটি লোকের সঙ্গে দেখা, লোকটি বলল—তোমরা কে? কোথা থেকে আসছ?

—আমরা তিনজন বেকার ছেলে, কাজকর্মের চেষ্টায় ঘুরছি।

—কি কাজ করবে? কি কাজ জান?

—যা জানি, যে কাজ পাই তাই করি।

—আমি যা বলি তাই যদি কর, তাহলে পয়সার অভাব থাকবে না। দিব্যি আরামে থাকবে।

—চুরি-ডাকাতি করতে পারব না।

—চুরি-ডাকাতি করতে আমি বলছি না।

—বেশ, ভাল কাজ হয় তো করব, বলুন কি কাজ?

—তোমাদের তিনজনকে শুধু তিনটে কথা বলতে হবে। কেউ কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে একজন বলবে—'আমরা তিনজন,' দ্বিতীয় জন বলবে—'শুধু টাকার জন্য,' আর তৃতীয় জন বলবে,—'ঠিক কথা!' যে যে-কথাই বলুক, এই তিনটি কথা ছাড়া তোমরা আর কোন জবাব দিতে পারবে না। এই কাজ যদি করতে পার তাহলে যখনই পকেটে হাত দেবে, দেখবে টাকা আছে।

—এ ত ভারী মজার ব্যাপার। কিন্তু কোন বিপদ হবে না ত?

—কোন বিপদ হবে না। যদি কোন বিপদ হয়, সে যত বড়

বিপদই হোক, আমি তোমাদের রক্ষা করব। তোমরা জানবে আমি সব সময় তোমাদের সঙ্গে আছি।

লোকটি মিলিয়ে গেল। ভূত নাকি?

তিন সঙ্গী পকেটে হাত ভরেই দেখে পকেট ভরতি টাকা। বলল —কোন অন্যায় তো করছি না, চলুক না এইভাবে।

তারা এল নগরে এক সরাইখানায়। মালিক জিজ্ঞাসা করল—কি খাবেন?

প্রথম সঙ্গী বলল—আমরা তিনজন।

মালিক বলল—তিনজনেরই ব্যবস্থা হবে।

দ্বিতীয় সঙ্গী বলল—টাকার জন্য।

মালিক বলল—খাবারের দাম তো দিতেই হবে।

তৃতীয় সঙ্গী বলল—ঠিক কথা।

মালিক বলল—তাহলে তিনজনেই খেতে বসুন।

তিনজনে ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করল। তারপর মালিক হিসাব করে বলল—টাকা দিন।

প্রথম সঙ্গী বলল—আমরা তিনজন।

দ্বিতীয় সঙ্গী বলল—টাকার জন্য।

তৃতীয় সঙ্গী বলল—ঠিক কথা।

তিনজনে মালিকের হিসাব কড়ায়-গণ্ডায় চুকিয়ে দিল।

সরাইখানায় আর যারা ছিল, তারা সব শুনে বলাবলি করল—এই তিনজন পাগল নাকি? এক কথা ছাড়া আর তো কিছু বলে না।

সরাইখানার মালিক বলল—পাগল হতে পারে, তবে কোন গোলমালে নেই, টাকা-পয়সার ব্যাপারেও ভাল। আমার এখানে যে ক'দিন থাকে, থাক।

তিন সঙ্গী সব শোনে, মুখে কিছু বলে না। সেই সরাইখানাতেই তারা দিন কয়েক রয়ে গেল।

একদিন সেখানে এল এক সদাগর। মালিককে সে বলল—আমি এখানে দু-চারদিন থাকব, কেউ হয়তো ঘুমন্ত অবস্থায় আমার

টাকা-পয়সা সব চুরি করে নেবে, এগুলো তোমার সিন্দুকে রাখ, যাবার সময় নেব।

সদাগর সব টাকা সরাইখানার মালিকের কাছে রেখে দিলে।

রাত দুপুরে সবাই ঘুমুলে সরাইখানার মালিক চুপি চুপি সদাগরের ঘরে ঢুকে তাকে খুন করল, কেউ জানল না।

সকালবেলা সরাইখানায় হৈ-চৈ বেধে গেল,—সদাগর খুন হয়েছে। মালিক বলল—এ নিশ্চয়ই ওই তিন পাগলের কাজ!

সবাই তাদের কতোয়ালিতে ধরে নিয়ে গেল। জমাদার জিজ্ঞাসা করল—তোরা সদাগরকে খুন করেছিস?

প্রথম সঙ্গী বলল—আমরা তিনজন।

দ্বিতীয় সঙ্গী বলল—টাকার জন্য।

তৃতীয় সঙ্গী বলল—ঠিক কথা।

জমাদার বলল—কাল তোদের বিচার হবে।

রাতে সেই ভূত এল তিন সঙ্গীর সামনে। বলল—তোমাদের ভয় নেই, আমি সঙ্গে আছি। শুধু কালকের দিনটা তোমরা এই কথা বলে যাও তারপরেই ছুটি দেব। আমি থাকতে কেউ তোমাদের কিছুই করতে পারবে না।

সকালে রাজসভায় বিচার হল। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—তোমরা খুন করেছ?

প্রথম সঙ্গী বলল—আমরা তিনজন।

রাজা বললেন—কেন খুন করেছ?

দ্বিতীয় সঙ্গী বলল—টাকার জন্য।

রাজা বললেন—তোমরা জান খুন করলে ফাঁসি হয়?

তৃতীয় সঙ্গী বলল—ঠিক কথা।

রাজা তিনজনের ফাঁসির হুকুম দিলেন। সিপাইরা তিনসঙ্গীকে মশানে নিয়ে গেল। তাদেরকে দাঁড় করিয়ে দিল ফাঁসির মঞ্চে। সরাইখানার মালিকও সেখানে ফাঁসি দেখতে গিয়েছিল। এবার তিনজনকে গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিতে যা দেরী।

ঠিক সেই সময় জমকালো পোষাক পরা রাজার লোক ঘোড়ায় চড়ে ছুটে এল, চীৎকার করে বলল—ফাঁসি হবে না, রাজার হুকুম।

তিনসঙ্গী দেখে—এ সে-ই তাদের দেখা ভূত। ভূত বলল—সঙ্গী তিনজন কি জান বল?

প্রথম সঙ্গী বলল—আমরা খুন করিনি, সদাগরকে খুন করেছে এই মালিক। সে আগেও অনেককে খুন করেছে। তাদের পুঁতেছে পিছনে মাঠের গাছতলায়, আর লুটের টাকা-পয়সা আছে সিন্দুকে।

রাজার সিপাইরা গাছতলা খুঁড়ল, অনেক মৃতদেহ পেল। মালিকের সিন্দুকে পেল টাকা-পয়সা। মালিকের ফাঁসি হয়ে গেল।

ভূত এবার তিন সঙ্গীকে বলল—মালিক আমায় খুন করেছিল, আমি তার শোধ নিলাম। তোমরা মুক্ত। সারা জীবনে তোমাদের যত টাকা দরকার হবে আমি জুগিয়ে যাব।—

কথা তোমায় রাখতে হবেই কথা যখন দেবে।
বিপদ যাই হোক্ না তোমার চলবে সত্য ভেবে॥

দুই পথিক

এক দরজী আর এক মুচি। পথে চলছিল দু'জনে। পথেই তাদের আলাপ হল। দরজী বড় আমুদে লোক। মুচিকে দেখে সে ছড়া কাটল : সেলাই কর সূচ দিয়ে, কষে টানো সুতো।
মোম দিয়ে মাজো সুতো, সারিয়ে ফেল জুতো।

মুচি বদমেজাজী লোক, বলল—আমায় ঠাট্টা করছ?

দরজী বলল—রাগ করছ কেন, এস একটু তাড়ি খাও!

দরজী বোতল থেকে তাড়ি ঢেলে দিলে। মুচি তাড়ি খেয়ে ঠাণ্ডা হল। দু'জনে বন্ধু হল।

দু'জনে বেরিয়েছিল তীর্থ করতে। এক এক গাঁয়ে তারা আসে, মুচি জুতা সারায়, দরজী জামা করে, দু'জনেরই খাবার পয়সা হয়ে যায়। আবার তারা পথ চলে।

দরজীর রোজগার হয় বেশী। মুচির রোজগার হয় কম। মুচি মনে মনে দরজীর হিংসা করে। দরজী কিন্তু মন-খোলা মানুষ। সে পয়সা খরচ করে, নিজে যা খায় মুচিকে ডেকে খাওয়ায়। তবু মুচি মনে মনে খুসি নয়।

তারা এসে পড়ল এক বনের ধারে। বন পেরুলেই নগর। বনের ভিতর দিয়ে দুটি পথ, একটা সাতদিনের একটা দু'দিনের। কিন্তু কোন্‌টি কোন্ পথ কেউ তা জানে না। মুচি হিসাবী লোক, সাত-দিনের খাবার সঙ্গে নিলে। দরজী আয়েসী লোক, ভাবল—দু'দিনে বন পার হব, বেশী বইব কেন? সে দু'দিনের খাবার সঙ্গে নিলে।

দু'জনে বনের পথ ধরল। কিন্তু পথ তো তারা চেনে না। তারা সাতদিনের পথই ধরল। দু'দিন দরজী দিব্যি খোস মেজাজে খেয়ে-দেয়ে কাটাল। কিন্তু তৃতীয় দিনেই তার খাবার নেই। মুচি বলল—আমার খাবার আমি দেব না। তুমি বেশী খাবার আনলে না কেন?

সেদিন দরজীর উপোসে কাটল।

চতুর্থ দিনও উপোস।

পঞ্চম দিনে সে আর উঠে দাঁড়াতে পারে না, পথ চলবে কি। বলল—আজ কিছু খেতে না পেলে আমি মারা যাব।

মুচি বলল—আমি তোমাকে খেতে দেব, কিন্তু তোমার একটি চোখ কানা করে দেব।

দরজী বলল—চোখ যাক, জীবন বাঁচুক।

মুচি দরজীকে খাবার দিলে, কিন্তু একটা চোখ কানা করে দিলে।

ষষ্ঠ দিনে দরজী আর খেতে চাইল না।

সপ্তম দিনে দরজীর আর চলার শক্তি নেই, বলল—আজ আমায় কিছু খেতে দাও।

মুচি বলল—খেতে দেব, তবে তোমার আরেকটা চোখও কানা করে দেব।

দরজী বলল—তাই দাও, এখন তো বাঁচি।

মুচি খেতে দিলে, কিন্তু দরজীর অন্য চোখও কানা করে দিলে। দরজী অন্ধ হল।

সেইদিনই বনের পথ শেষ। বনের বাইরে এসে মুচি দরজীর হাতে একটি লাঠি দিয়ে বললে—এবার নগরে এসে গেছি। ভিখ্ মেগে খাও গে—

মুচি চলে গেল। মন তার খুসি। দরজীর চোখ নেই, সেলাই করে সে আর বেশী পয়সা রোজগার করে স্ফূর্তি দেখাতে পারবে না। এখন সে অন্ধ ভিখারী।

অন্ধ দরজী কিছুই তো দেখে না। চলতে চলতে সে এসে পড়ল নগরের মশানে। সারাদিন পেটে কিছুই পড়েনি, মনেও কষ্ট। এক গাছতলায় অন্ধ শুয়ে পড়ল।

অন্ধ যেটাকে গাছ মনে করেছিল, সেটা ফাঁসী-কাঠ। ফাঁসী-কাঠে সেদিন দুটো লোকের ফাঁসী হয়েছিল। মানুষ দুটি ঝুলছিল মাথার উপর। রাতের বেলা দুটো কাক বসেছিল সেই লোক দুটোর মাথায়। ভোরের বেলা একটা কাক আরেক কাককে বলল—গাছের নীচে এক অন্ধ শুয়ে আছে, দেখেছ?

অন্য কাক বলল—হ্যাঁ, ওকে ওর হিংসুক সঙ্গী অন্ধ করে দিয়েছে।

—আজ এখনি ওর দু'চোখ আবার ঠিক হয়ে যেতে পারে। ভোরের বেলা এই ফাঁসির দড়ি বেয়ে ঘাসের উপর যে শিশির ঝরে পড়েছে তা যদি ও চোখে লাগায়, এখনি ওর নজর ফিরে আসবে।

—কিন্তু ও ত তা জানে না। ও ত ঘুমুচ্ছে।

দরজীর কিন্তু তখন ঘুম ভেঙে গেছে। সে কাকের কথা শুনতে পেয়েছে। তখনই পকেট থেকে রুমাল বের করে সে ঘাসের শিশিরে ভিজিয়ে নিলে। তারপর সেই ভিজে রুমাল বুলাল দুই চোখে। সঙ্গে সঙ্গে সে চোখের দৃষ্টি ফিরে পেলে, দেখে সামনে নগর, নগরের পিছনে সূর্য উঠছে। দরজী তখনই হাত জোড় করে বলল—ভগবান, আমার উপর তোমার অশেষ করুণা।

দরজী চলল। মাঠে একটা বাচ্চা ঘোড়া ছুটে যাচ্ছিল, সে তাকে

ধরল। ঘোড়াটি বলল—আমার ছেড়ে দাও, সময় মত আমি তোমার একদিন উপকার করব।

দরজী ঘোড়াটিকে ছেড়ে দিলে।

তারপর সামনে পড়ল এক সারস, দরজী তাকে ধরল, বলল—কাল থেকে কিছুই খাইনি, আজ তোকে মেরে খাব।

সারস বলল—আমায় ছেড়ে দাও, আমি সময় মত তোমার উপকার করব।

দরজী সারসকে ছেড়ে দিলে।

তারপর সামনে পড়ল এক পাতিহাঁস। দরজী তাকে ধরল, বলল—তোকে মেরে খাব।

হাঁস বললে—আমাকে মারলে আমার মা কাঁদবে। আমায় ছেড়ে দাও, তোমার মায়ের কথা মনে কর।

দরজী হাঁসটিকে ছেড়ে দিলে।

তারপর চোখে পড়ল গাছের গায় এক মস্ত মৌচাক। দরজী বলল—এই চাক ভেঙে মধু খাব।

রাণী মৌমাছি বেরিয়ে এসে বলল—চাকে হাত দিলেই হাজার হুল বিঁধিয়ে তোমাকে অস্থির করে তুলব।

—তবে থাক,—বলে দরজী চলল।

এবার দরজী এসে পড়ল এক সরাইখানায়। পকেটে পয়সা ছিল, পেট ভরে খাওয়া-দাওয়া করল। তারপর চলল নগরের পথে।

দরজী হাতের কাজ জানত। নগরে এক দরজীর দোকানে সে চাকরি নিলে। দেখতে দেখতে ছাঁট-কাটের জন্য তার খুব নাম-ডাক হল। কাজ করে সে তখন কুলিয়ে উঠতে পারে না। যত কাজ তত পয়সা।

এদিকে মুচিও আছে সেই নগরে। দরজীর পসার দেখে সে হিংসায় জ্বলে মরে। লোকটাকে অন্ধ করে দিলাম, সে চোখ ফিরে পেলে, তারপর আবার এই!

মুচি আবার দরজীকে জব্দ করার ফন্দী আঁটল।

রাজার সোনার মুকুট চুরি গিয়েছিল ক'দিন আগে। মুচি রাজার

কাছে গিয়ে বললে,—হুজুর, দরজী বলে 'রাজার মুকুট আমি তিনদিনে বের করে দিতে পারি।'

রাজা তখনই দরজীকে ডেকে পাঠালেন, বললেন—তিনদিনের মধ্যে আমার মুকুট বের করে দাও।

দরজী দেখল মহা ফ্যাসাদ। মুকুটের কিছুই সে জানে না, এখান থেকে পালিয়ে যাওয়াই ভাল। কাপড় জামা ঝোলায় ভরে নিয়ে তখনই সে নগর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

কিছুদূর যেতেই পুকুরের পারে এক পাতিহাঁসের ঝাঁক। ঝাঁক থেকে একটি হাঁস এসে বললে—তোমাকে ধন্যবাদ, আমাকে তুমি মারনি। এখন কোথায় চললে?

দরজী বলল—রাজ্য ছেড়ে ভয়ে পালাচ্ছি।

—কেন, কি হল?

দরজী বললে রাজার মুকুটের কথা। হাঁস বলল—মুকুট চোরেরা লুকিয়ে রেখেছে পুকুরের মধ্যে। আমরা তুলে দিচ্ছি।

হাঁস জলে ডুবে ঠোঁটে করে মুকুট তুলে আনল।

দরজী সেই মুকুট এনে দিল রাজকে। রাজা খুসি হয়ে দরজীকে অনেক বখশিষ দিলেন।

মুচি দেখলে তার দুষ্ট ফন্দীতে কাজ হল না, পরদিন রাজার কাছে এসে বললে,—মহারাজ দরজীর এখন খুব অহঙ্কার হয়েছে, বলে 'আমি জামাকাপড়ের কাজ ছাড়াও আরো অনেক হাতের কাজ জানি, মোম দিয়ে রাজবাড়ীর এমন নকল করে দেব যে রাজা দেখলে চম্‌কে যাবেন।'

রাজা তখনই দরজীকে ডেকে পাঠালেন, বললেন,—তিনদিনের মধ্যে রাজবাড়ীর একটা নকল বানিয়ে দাও মোম দিয়ে।

দরজী দেখলে আরেক ফ্যাসাদ। আবার ঝুলিঝোলা কাঁধে নিয়ে নগর থেকে সে বেরিয়ে পড়ল। আগের সেই গাছের গায় মৌচাকটার পাশ দিয়ে যাচ্ছে, রাণী মৌমাছি বলল,—কি গো, কোথায় চললে?

দরজী বললে—নগর ছেড়ে পালাচ্ছি।

—কেন, কি হল?

দরজী বললে রাজার কথা। মৌমাছি বললে—ও আর এমন শক্ত কাজ কি? তুমি আমাদের চাক ভাঙো নি, আমরা তোমাকে একদিনে রাজবাড়ীর নকল তৈরী করে দেব, কোন ভয় নেই।

পরদিন সকালে মৌমাছির ঝাঁক উড়ে এল রাজবাড়ীতে, সব দেখে-শুনে গেল। সন্ধ্যাবেলায় তারা শেষ করে দিলে মোমের রাজবাড়ী। দরজী সেই মোমের বাড়ী নিয়ে গেল রাজার কাছে, রাজা তো ভারী খুসি। অনেক বখ্‌শিশ দিলেন।

মুচি আবার নতুন ফন্দী করল, রাজাকে গিয়ে বললে,—মহারাজ, দরজী আবার নতুন কথা বলে, 'রাজা তো শখের বাগান করেছেন, বাগানে একটাও ফোয়ারা নেই, আমি তিনদিনে এমন ফোয়ারা করে দিতে পারি যে তিরিশ হাত উঁচুতে জল উঠবে।'

রাজা তখনই ডাকলেন দরজীকে, বললেন,—তিনদিনে আমার বাগানে একটা ফোয়ারা বানাও।

দরজী দেখলে আবার ফ্যাসাদ। আবার ঝুলিঝোলা নিয়ে নগর থেকে বেরিয়ে পড়ল। পথে সেই বাচ্চা ঘোড়াটি তাকে দেখতে পেয়েই ছুটে এল, বললে—কোথায় যাচ্ছ?

—নগর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছি।

—কেন?

দরজী বললে রাজার কথা। ঘোড়া বললে—আমাকে নিয়ে চল, রাজার বাগানে। আমি তিনদিনে ফোয়ারা বানিয়ে দেব।

দরজী ঘোড়াকে নিয়ে এল রাজার বাগানে।

বাচ্চা ঘোড়া বাগানের এক জায়গায় তিনদিন ধরে শুধু জোড়া পায়ের লাথি মারল। সেখানের পাথর ফেটে জল বেরুল ফোয়ারার মতো—একেবারে তিরিশ হাত উঁচু। রাজা ফোয়ারা দেখে খুসি হলেন, দরজীকে অনেক বখ্‌শিষ দিলেন।

মুচি এবার আরেক ফন্দী করল। রাজার অনেকগুলি মেয়ে ছিল, ছেলে ছিল না। মুচি রাজাকে গিয়ে বললে,—মহারাজ, দরজী বলেছে,

আপনি বললেই সে মেঘের দেশ থেকে এক রাজপুত্তুর এনে দিতে পারে। আপনি তাকে ছেলের মতো মানুষ করবেন।

রাজা তখনই দরজীকে ডাকলেন, বললেন—তিনদিনের মধ্যে মেঘের দেশ থেকে রাজপুত্তুর এনে দাও, সে আমার পোষ্যপুত্র হবে।

দরজী দেখলে আবার নতুন ফ্যাসাদ। ঝুলিঝোলা নিয়ে সে নগর ত্যাগ করল। পথে সেই সারসের সঙ্গে দেখা, বলল,—কোথায় চললে?

—নগর ছেড়ে পালাচ্ছি।

—কেন?

দরজী বললে রাজার কথা। সারস বললে,—এর জন্য ভাবনা কি? আমি উড়ে গিয়ে মেঘের দেশ থেকে রাজপুত্তুর এনে দেব।

পরদিন সারস উড়ে গিয়ে মেঘের দেশ থেকে রাজপুত্তুর নিয়ে এল। রাজপুত্তুর পেয়ে রাণীমা কোলে তুলে নিলেন। রাজা মশাই খুসি হয়ে দরজীকে বললেন—তোমার সঙ্গে আমি মেয়ের বিয়ে দেব।

দরজীর সঙ্গে রাজার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। অনেক ধুমধাম হল। দরজী রাজার জামাই হল। মুচি এবার ভয়ে নগর ছেড়ে পালাল।

পথে যেতে যেতে মুচি এল সেই মশানের ধারে। কাক দুটো বসে ছিল ফাঁসী-কাঠের উপর। বললে—এই লোকটাই সঙ্গীকে অন্ধ করে দিয়েছিল, এর অন্ধ হওয়া উচিত।

দুটি কাক মুচির দুটি চোখ ঠুকরে অন্ধ করে দিলে। অন্ধ মুচি পথে পথে ঘুরে ভিক্ষে করতে লাগল।—

পথে একা বরং ভাল, অসৎ সঙ্গী কখনো নয়।
অসৎ মানুষ সঙ্গী হলে, পথে নানা বিপদ-ভয়॥